ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা উত্তরণের উপায়

অষ্টম খণ্ড

বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা
উত্তরণের উপায়

অষ্টম খণ্ড

বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা : উত্তরণের উপায়
(টিআইবির গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ সংকলন)

অষ্টম খণ্ড

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৮

© ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্তনির্ভর এই প্রকাশনায় উপস্থাপিত বিশ্লেষণ ও সুপারিশ টিআইবির মতামতের প্রতিফলন, যার দায়দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট গবেষক ও টিআইবির।

উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি
অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, টিআইবি
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), ২৭ (পুরাতন)
ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন : ৮৮০-২-৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯১২৪৯১৫
ই-মেইল : info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট : www.ti-bangladesh.org
ফেসবুক : www.facebook.com/TIBangladesh

ISBN: 978-984-34-3878-2

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

পার্লামেন্টওয়াচ : দশম জাতীয় সংসদের সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশন ৯
জুলিয়েট রোজেটি, ফাতেমা আফরোজ, মোরশেদা আক্তার ও অমিত সরকার

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬ : দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসনসংশ্লিষ্ট লক্ষ্যের ওপর বাংলাদেশের প্রস্তুতি, বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ ২২
শাহজাদা এম আকরাম, মো. ওয়াহিদ আলম, আবু সাঈদ মো. জুয়েল মিয়া মো. রেযাউল করিম, আতিয়া আফরিন, খালেদা আক্তার, নাহিদ শারমীন মো. মোস্তফা কামাল ও মো. শহিদুল ইসলাম

দুর্নীতি প্রতিরোধে দুর্নীতি দমন কমিশন পরিচালিত গণশুনানি : কার্যকারিতা চ্যালেঞ্জ ও করণীয় ৩৯
মো. ওয়াহিদ আলম, মো. রেযাউল করিম ও মো. শহিদুল ইসলাম

শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসন : সমস্যা ও উত্তরণের উপায় ৪৮
মনজুর-ই-খোদা ও শাহজাদা এম আকরাম

পাসপোর্ট সেবায় সুশাসন : চ্যালেঞ্জ ও করণীয় ৬৮
মো. শাহনূর রহমান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) : পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় ৮১
মোরশেদা আক্তার

বাংলাদেশে শিক্ষা খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধিতে উন্মুক্ত স্কুল তথ্যের ব্যবহার ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ও সরকারি স্কুলের অভিজ্ঞতা ৯২
দিপু রায় ও আবু সাঈদ মো. জুয়েল মিয়া

গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ ও নগর উন্নয়নে জবাবদিহি : খুলনা সিটি করপোরেশন খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং যশোর পৌরসভার ওপর একটি কেস স্টাডি ১০৩
ড. মো. আশিক উর রহমান

তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন : অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ (এপ্রিল ২০১৬–মার্চ ২০১৭) ১১০
নাজমুল হুদা মিনা

জলবায়ু অর্থায়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ১২০
গোলাম মহিউদ্দিন, মহুয়া রউফ ও মো. রাজু আহম্মেদ মাসুম

জলবায়ু অর্থায়ন ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান : প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসন ১২৯
নাহিদ শারমীন, ফারহানা রহমান, গোলাম মহিউদ্দিন ও আবু সাঈদ মো. জুয়েল মিয়া

ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু : দুর্যোগ মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় ১৪০
মু. জাকির হোসেন খান, নিহার রঞ্জন রায়, মো. নেওয়াজুল মওলা ও নাহিদ শারমীন

বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) বাংলাদেশে অবস্থানজনিত সমস্যা : সুশাসনের চ্যালেঞ্জবিষয়ক সমীক্ষা ১৫৩
গোলাম মহিউদ্দিন, জাফর সাদেক চৌধুরী, মো. রাজু আহম্মেদ মাসুম ও মো. জসিম উদ্দিন

গবেষক পরিচিতি ১৬৬

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নাগরিকদের সচেতন ও সোচ্চার করার জন্য কাজ করছে। এর অংশ হিসেবে সুশাসনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সরকারি-বেসরকারি সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি, মাত্রা ও ব্যাপকতা নিরূপণের জন্য গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। টিআইবির অধিপরামর্শ কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনের অংশগ্রহণ ও সহায়তায় দেশে আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক, নীতি ও কৌশলকাঠামোতে প্রয়োজনীয় ও যুগোপযোগী সংস্কারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসন-সহায়ক অবকাঠামো সুদৃঢ়তর করা।

টিআইবি পরিচালিত ও প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ নিয়ে 'বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা : উত্তরণের উপায়' শীর্ষক সাতটি সংকলন ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় এই সিরিজের অষ্টম সংকলন ২০১৮ সালের অমর একুশে গ্রন্থমেলা উপলক্ষে প্রকাশিত হলো।

এই সংকলনের প্রথম প্রবন্ধে দশম জাতীয় সংসদের সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশনের বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন : জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা ও আইন প্রণয়নে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা, সংসদীয় কমিটির ভূমিকা, সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের অবদান, সংসদের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে স্পিকার ও সদস্যদের ভূমিকা এবং সংসদীয় উন্মুক্ততা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এ সময়ে জাতীয় সংসদের কোনো কোনো নির্দেশকে ইতিবাচক অগ্রগতি লক্ষ করা গেলেও আইন প্রণয়নে ব্যয়িত সময়, অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার ও অধিবেশন চলাকালে সদস্যদের আচরণ, বিরোধী সদস্যদের মতামত উত্থাপন ও তাদের প্রস্তাব বিবেচনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত পরিবর্তন আসেনি।

দ্বিতীয় প্রবন্ধে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০-এর দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসনসংশ্লিষ্ট লক্ষ্যের ওপর বাংলাদেশের প্রস্তুতি, বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এখানে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬-এর ১২টি লক্ষ্যের মধ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রত্যক্ষভাবে সহায়ক চারটি লক্ষ্যের ওপর পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং তার ওপর টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে, বিশেষ করে এ লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য বেশ কিছু সুপারিশ প্রস্তাব করা হয়েছে।

পরবর্তী প্রবন্ধে দুর্নীতি প্রতিরোধে দুর্নীতি দমন কমিশন পরিচালিত গণশুনানির কার্যকারিতা, চ্যালেঞ্জ ও করণীয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং এসব গণশুনানি পরিচালনায় চ্যালেঞ্জগুলোর বাস্তব সমাধানের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। দেখা গেছে, দুদক পরিচালিত এসব গণশুনানি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জবাবদিহি উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও এটি এখনো প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর হতে পারেনি।

সংকলনের চতুর্থ প্রবন্ধে বাংলাদেশ থেকে অন্যান্য দেশে শ্রম অভিবাসন-প্রক্রিয়ায় সুশাসনের সমস্যা নিয়ে টিআইবির গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে দেখানো হয়েছে এই প্রক্রিয়ায় কীভাবে অভিবাসী কর্মীরা বিদেশে কাজ নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় প্রতারিত ও তাদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং এখানে বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকা কী। পরবর্তী প্রবন্ধে বাংলাদেশের পাসপোর্ট সেবায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও করণীয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে পাসপোর্ট পাওয়ার বিভিন্ন ধাপে আবেদনকারীদের কী কী সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়, তা বিস্তারিত দেখানো হয়েছে।

পরবর্তী প্রবন্ধে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ কী কী তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দেখা গেছে, একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও আইনি ঘাটতি ও কাঠামোগত দুর্বলতার কারণে এই প্রতিষ্ঠানের ওপর সরকারের আধিপত্য বিদ্যমান, যার প্রতিফলন ঘটেছে পাঠ্যবই রচনার প্রক্রিয়ায়। ইউনেসকোর উদ্যোগে যৌথভাবে পরিচালিত শিক্ষাসংক্রান্ত আরেকটি গবেষণায় দেখা যায়, উন্মুক্ত স্কুল তথ্য স্বচ্ছতা, জবাবদিহি বৃদ্ধি ও দুর্নীতির ঝুঁকি কমাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

খুলনা সিটি করপোরেশন, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং যশোর পৌরসভার ওপর কেস স্টাডির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ ও নগর উন্নয়নে জবাবদিহির সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ধরনের কী সম্পর্ক রয়েছে, তা দেখানো হয়েছে পরবর্তী প্রবন্ধে। এখানে দেখা যাচ্ছে বিকেন্দ্রীকৃত প্রতিষ্ঠানগুলো দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেশি জবাবদিহিমূলক, যেখানে কমিউনিটি পর্যায়ে অংশগ্রহণ বেশি থাকে। তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের ওপর প্রবন্ধে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন সরকারি অংশীজনের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণে গৃহীত অধিকাংশ কার্যক্রম সম্পন্ন হলেও এবং কারখানার নিরাপত্তায় বা টেকনিক্যাল কমপ্লায়েন্সের ক্ষেত্রে অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স পরিদর্শিত কারখানাগুলোর কিছুটা অগ্রগতি হলেও একদিকে জাতীয় উদ্যোগে পরিদর্শিত কারখানগুলোতে এবং অন্যদিকে বিজিএমইএ বা বিকেএমইএর সদস্য নয় এমন কারখানার টেকনিক্যাল কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

এর পরের দুটি প্রবন্ধে জলবায়ু অর্থায়নের ব্যবহারে সুশাসনের দুটি পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। একটি প্রবন্ধে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) কীভাবে জলবায়ু তহবিল থেকে তার প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে এবং সেখানে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ কী কী তা আলোচনা করা হয়েছে। অন্য একটি প্রবন্ধে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো কীভাবে জলবায়ু তহবিল থেকে বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থায়ন করছে এবং সেখানে সুশাসনের চিত্র কেমন তা তুলে ধরা হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে জলবায়ু তহবিলকে স্থানীয় প্রকল্পের অর্থায়নের নতুন একটি উৎস হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে এবং অন্যান্য খাতের প্রকল্পের মতোই এসব প্রকল্পেও সুশাসনের ঘাটতি বিদ্যমান।

শেষ দুটি প্রবন্ধে দুর্যোগকালীন সুশাসনের কী ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয় তার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। একটি প্রবন্ধে ২০১৬ সালে উপকূলীয় অঞ্চলে আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর পরবর্তী সময়ে দুর্যোগ মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পরের প্রবন্ধে ২০১৭ আগস্ট মাস থেকে বাংলাদেশে আসা বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ তুলে ধরা হয়েছে।

এ সংকলনের গ্রন্থনা ও সম্পাদনা টিআইবির রিসার্চ ও পলিসি বিভাগের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার শাহজাদা এম আকরামের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। প্রকাশনা-সংক্রান্ত কাজে বিশেষ সহায়তা দিয়েছেন আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম। তাদেরসহ অন্যান্য সব বিভাগের সংশ্লিষ্ট সহকর্মী যারা নিজস্ব অবস্থানে থেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। এ ছাড়া গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সব পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট খাতের বিশেষজ্ঞ যারা তথ্য প্রদানসহ বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন, তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

সংকলনটি বাংলাদেশে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণে আগ্রহী পাঠকের ভালো লাগবে– এই প্রত্যাশা করছি। এই সংকলনের উৎকর্ষের জন্য পাঠকের মন্তব্য ও পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

পার্লামেন্টওয়াচ

দশম জাতীয় সংসদ : সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশন*

জুলিয়েট রোজেটি, ফাতেমা আফরোজ, মোরশেদা আক্তার ও অমিত সরকার

১. প্রেক্ষাপট

সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হলো সংসদে আলোচনা করে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দেশের স্বার্থে আইন প্রণয়ন, জাতীয় স্বার্থ-সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে ঐকমত্যে পৌঁছানো এবং সেই সাথে দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্বপরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে দেশের নেতৃত্ব দেওয়া। সংসদের কাজকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয় : প্রতিনিধিত্ব, আইন প্রণয়ন ও তদারকি। জনপ্রতিনিধিরা প্রশ্নোত্তর পর্ব, জনগুরুত্বসম্পন্ন নোটিশ, বিধি অনুযায়ী বিভিন্ন বক্তব্য, আইন প্রণয়ন ও কমিটি কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে পারেন।

বাংলাদেশে সংসদ মুখ্য সিদ্ধান্ত প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান এবং নীতিনির্ধারণী ফোরাম হিসেবে স্বীকৃত। সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে সংসদকে কার্যকর করা একটি উল্লেখযোগ্য অঙ্গীকার হিসেবে লক্ষণীয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ১৯৭২ সাল থেকে আইপিইউ (ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন) এবং ১৯৭৩ সাল থেকে সিপিএর (কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন) সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এদের উদ্দেশ্য হলো, দেশের উন্নয়নের জন্য সংসদ সদস্যদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট দেশের শাসনব্যবস্থায় সন্নিবেশিত করা।

বিশ্বব্যাপী প্রায় ২০০টি পার্লামেন্টারি মনিটরিং অর্গানাইজেশন ৮০টিরও বেশি দেশের সংসদীয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে সংসদীয় গণতন্ত্রে সুশাসন, জনগণের কাছে সংসদের জবাবদিহি, আইন প্রণয়নে জনগণের অংশগ্রহণ, সংসদীয় কার্যক্রমের তথ্যের অভিগম্যতা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে। প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে সংসদীয় কার্যক্রমকে আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যকর পন্থা সুপারিশ করে থাকে।

সরকারের জবাবদিহি, স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সংসদীয় কার্যক্রমের ভূমিকার কথা বিবেচনায় রেখে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে সংসদ কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। এ প্রতিবেদনটি এই সিরিজের ১৩তম এবং দশম জাতীয় সংসদের ওপর তৃতীয় প্রতিবেদন।

* ২০১৭ সালের ৯ এপ্রিল টিআইবির সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে সংসদীয় গণতন্ত্রচর্চায় জাতীয় সংসদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও সদস্যদের ভূমিকা পর্যালোচনা এবং সংসদের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে সুপারিশ প্রণয়ন করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো :

- দশম সংসদের সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশনের বিভিন্ন পর্বের কার্যক্রম পর্যালোচনা;
- জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায় সংসদ সদস্যদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ;
- সংসদীয় কমিটির ভূমিকা পর্যালোচনা;
- আইন প্রণয়নে সংসদীয় কার্যক্রমে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ;
- সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের পর্যবেক্ষণ;
- সংসদের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে স্পিকার ও সদস্যদের ভূমিকা পর্যালোচনা এবং
- সংসদীয় উন্মুক্ততা পর্যবেক্ষণ।

৩. তথ্যের উৎস ও গবেষণাপদ্ধতি

এই গবেষণায় পরিমাণবাচক এবং গুণবাচক উভয় ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে দশম সংসদের সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশনের সরাসরি সম্প্রচারিত কার্যক্রম এবং অধিবেশনে উপস্থিত হয়ে সংসদের অধিবেশনে কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ। পরোক্ষ তথ্যের মধ্যে রয়েছে সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত অধিবেশনের কার্যবিবরণী ও কমিটির প্রতিবেদন, সরকারি গেজেট, সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য এবং প্রকাশিত বই ও প্রবন্ধ।

সংসদ টেলিভিশনে সরাসরি প্রচারিত কার্যক্রমের রেকর্ড শুনে নির্দিষ্ট নির্দেশকের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগৃহীত হয়। সন্নিবেশিত বিষয়গুলোর মধ্যে আছে কার্যদিবস-সংক্রান্ত সাধারণ তথ্য, কোরাম-সংকট এবং সদস্যদের উপস্থিতি, অধিবেশন বর্জন, ওয়াকআউট, স্পিকারের ভূমিকা, রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা, প্রশ্নোত্তর পর্ব, জনগুরুত্বসম্পন্ন নোটিশ-সংক্রান্ত বিষয়, আইন প্রণয়ন, বাজেট আলোচনা, সাধারণ আলোচনা, পয়েন্ট অব অর্ডার, সংসদীয় কমিটি-সংক্রান্ত তথ্য, সংসদীয় বিধি অনুযায়ী সদস্যদের আচরণ ও বক্তব্যে ভাষার ব্যবহারসংশ্লিষ্ট তথ্য ইত্যাদি। সময় নিরূপণের জন্য স্টপওয়াচ ব্যবহার করা হয়। প্রশ্নপত্রে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। অধিবেশন ও কমিটি সভায় সদস্যদের উপস্থিতি, প্রশ্নোত্তর পর্বের প্রশ্নের বিস্তারিত বিষয়বস্তু, কমিটির প্রকাশিত প্রতিবেদন, সংবাদপত্র এবং সংসদ সচিবালয়ের প্রাপ্ত তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা হয়। সংসদ টিভিতে প্রত্যক্ষযোগ্য নয় এমন বিষয় পর্যবেক্ষণের জন্য অধিবেশনে সরাসরি উপস্থিত থেকে সংসদ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হয়।

এই গবেষণায় সংসদীয় উন্মুক্ততা পর্যবেক্ষণ করার ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে সংসদীয় চর্চা ও মানদণ্ড, 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা'য় উল্লিখিত জনগণের তথ্যে অভিগম্যতা, ইন্টারপার্লামেন্টারি ইউনিয়নের (আইপিইউ) লক্ষ্য এবং সংসদীয় পর্যবেক্ষক প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্মেলনে প্রকাশিত সংসদীয় উন্মুক্ততার ঘোষণাপত্রের আলোকে বিভিন্ন দেশের সংসদ-সম্পর্কিত তথ্য প্রচার ও বিভিন্ন সংসদের ইতিবাচক চর্চার বিষয়কে বিবেচনা করা হয়েছে।

৪. গবেষণার সময়

সেপ্টেম্বর ২০১৫-ডিসেম্বর ২০১৬ সময়কালে অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদের সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশন পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৫. গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল

৫.১ অধিবেশনের কার্যকাল

দশম জাতীয় সংসদের সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশনে মোট কার্যদিবস ছিল ১০৩ দিন। একাদশ অধিবেশন ছিল বাজেট অধিবেশন। নবম অধিবেশনটিতে মূলত রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

৫.২ কার্যসময় ও বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সময়

দশম জাতীয় সংসদের সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশন পর্যন্ত ১০৩ কার্যদিবসে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যয়িত মোট সময় ৩৪৫ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট। প্রতি কার্যদিবসে গড় বৈঠককাল প্রায় ৩ ঘণ্টা ২২ মিনিট।

চিত্র ১ : বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যয়িত মোট সময়ের শতকরা হার (সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশন)

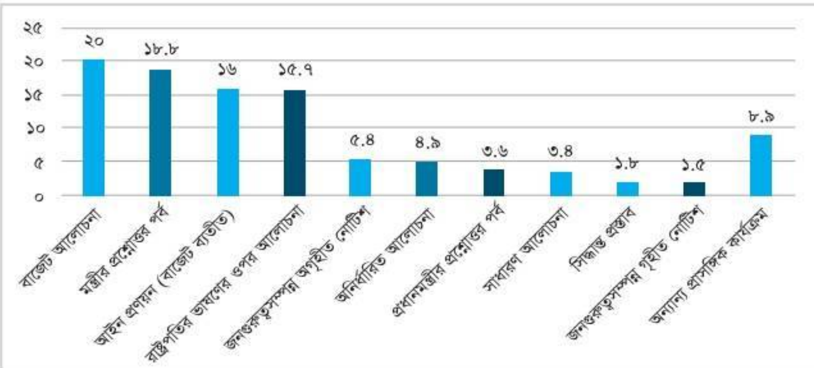

৬. সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতি

দশম সংসদের সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশনে সদস্যদের ১০৩ কার্যদিবসের উপস্থিতির তথ্য বিশ্লেষণ করে সার্বিকভাবে সংসদ সদস্যদের গড় উপস্থিতি প্রতি কার্যদিবসে ২৩৩ জন, যা মোট সদস্যের ৬৭ শতাংশ। ৩৯ শতাংশ সদস্য মোট কার্যদিবসের ৭৫ শতাংশের বেশি কার্যদিবসে, ৫ শতাংশ সদস্য ২৫ শতাংশ বা তার কম কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত ছিলেন। সরকারি দলের সংসদ সদস্যের মধ্যে শতকরা ৩৯ ভাগ সদস্য অধিবেশনের তিন-চতুর্থাংশের বেশি অর্থাৎ মোট কার্যদিবসের ৭৫ শতাংশের বেশি কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত ছিলেন। তবে নবম সংসদের[১]

[১] তথ্যসূত্র : জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

সাথে তুলনা করলে দেখা যায় নবম সংসদের শতকরা ৫০ ভাগ সদস্য ৭৫ শতাংশের অধিক কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত ছিলেন। এ ক্ষেত্রে উপস্থিতির হার আগের তুলনায় কমেছে।[২] সর্বনিম্ন এক দিন (একাদশ অধিবেশনে) উপস্থিত ছিলেন একজন সরকারি দলের সদস্য,[৩] যার উপস্থিতি নিয়ে পূর্ববর্তী বছরেও একই তথ্য পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, জাতীয় সংসদে সদস্য হিসেবে পদ রক্ষায় তাকে অধিবেশনে হাজিরা দিতে দেখা যায়। তিনি হত্যা মামলায় অভিযুক্ত এবং প্রায় এক বছর পলাতক ছিলেন।[৪] উল্লেখ্য, ২২ মাস পলাতক থেকে আত্মসমর্পণের পর জামিনের জন্য হাইকোর্টে আপিল করেছেন।[৫] ওই সংসদ সদস্য অধিবেশনে হাজিরা দিলেও কোনো আলোচনা পর্বে অংশগ্রহণ করেননি।

প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের ৪০ শতাংশ এবং অন্যান্য বিরোধী সদস্যদের ৪২ শতাংশ সদস্য এবং ২১ শতাংশ মন্ত্রী মোট কার্যদিবসের তিন-চতুর্থাংশের বেশি অর্থাৎ ৭৫ শতাংশের বেশি কার্যদিবস উপস্থিত ছিলেন। নবম সংসদে প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্যে সর্বোচ্চ উপস্থিতি ছিল ২৫ শতাংশের কম কার্যদিবসে। অর্থাৎ প্রধান বিরোধী দলের উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে বেড়েছে। সংসদনেতা মোট কার্যদিবসের ৮৬ দিন (প্রায় ৮৪ শতাংশ) উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে প্রধান বিরোধীদলীয় নেতা মোট কার্যদিবসের মধ্যে ৮৫ দিন (প্রায় ৮৩ শতাংশ) উপস্থিত ছিলেন।

৬.১ ওয়াকআউট

সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশনের কার্যদিবসগুলোতে প্রধান বিরোধী দলের সদস্য কর্তৃক চারবার ওয়াকআউট হয়। ওয়াকআউটের কারণগুলোর মধ্যে গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম কমানোর দাবি, বিলে ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও সংসদে তা পাস করার প্রতিবাদ, সাধারণ আলোচনায় বিরোধী দল কর্তৃক প্রেরিত নামের তালিকা অনুযায়ী সুযোগ প্রদানে বিলম্ব হওয়ায় তার প্রতিবাদ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৬.২ কোরাম-সংকট

সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশনে মোট ৪৮ ঘণ্টা ২৬ মিনিট কোরাম-সংকটের কারণে অপচয় হয়, যা সাতটি অধিবেশনের প্রকৃত মোট ব্যয়িত সময়ের (৩৯৪ ঘণ্টা ২১ মিনিট) ১২ শতাংশ। সাতটি অধিবেশনে প্রতি কার্যদিবসে গড়ে ২৮ মিনিট কোরাম-সংকটের কারণে অপচয় হয়। সংসদের বাজেটের ভিত্তিতে সংসদ পরিচালনার ব্যয়ের প্রাক্কলিত হিসাব অনুযায়ী সংসদ পরিচালনা

---

[২] বাংলাদেশ আসন : ১৯০ (ঢাকা-১৭), ৩২৭ (সংরক্ষিত আসন-২৭)

[৩] বাংলাদেশ আসন : ১৩২ (টাঙ্গাইল-৩)

[৪] দৌনক প্রথম আলো, দৈনিক যুগান্তর, ৮ জুলাই ২০১৫

[৫] দৈনিক যুগান্তর, ৬ অক্টোবর ২০১৬

করতে প্রতি মিনিটে গড়ে ১ লাখ ৬২ হাজার ৪৩৪ টাকা খরচ হয়।[৬] এ হিসাবে সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশনে কোরাম-সংকটে ব্যয়িত মোট সময়ের অর্থমূল্য ৪৭ কোটি ২০ লাখ ৩৩ হাজার ২০৪ টাকা এবং প্রতি কার্যদিবসের গড় কোরাম-সংকটের সময়ের অর্থমূল্য ৪৫ লাখ ৪৮ হাজার ১৫২ টাকা। অষ্টম, নবম ও দশম সংসদের মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায় অধিবেশন প্রতি গড় কোরাম-সংকট ক্রমান্বয়ে কমেছে। অষ্টম সংসদের প্রতি কার্যদিবসের গড় কোরাম-সংকট ছিল ৩৯ মিনিট এবং নবম সংসদে ৩৩ মিনিট দশম সংসদে কমে ২৮ মিনিটে দাঁড়ায়। প্রতি কার্যদিবসের গড় কোরাম-সংকটের মতো অধিবেশনপ্রতি গড় কোরাম-সংকটও ক্রমান্বয়ে কিছুটা কমেছে। অষ্টম সংসদের প্রতি অধিবেশনের গড় কোরাম-সংকট ছিল ৩৩ মিনিট এবং নবম সংসদে ৩০ মিনিট দশম সংসদে কমে ২৯ মিনিটে দাঁড়ায়।

৭. আইন প্রণয়ন

এ সাতটি অধিবেশনে ৬৬টি বিল পাস হয়। এ ক্ষেত্রে মোট প্রায় ৫৫ ঘণ্টা ১৫ মিনিট সময় ব্যয় করা হয়, যা অধিবেশনগুলোর ব্যয়িত মোট সময়ের ১৬ শতাংশ। এ সাতটি অধিবেশনে বিল উত্থাপনে আপত্তি এবং জনমত যাচাই-বাছাই ও দফাওয়ারি সংশোধনী সম্পর্কে মোট ৩৮ জন সদস্য বক্তব্য উপস্থাপন করেন। সময়ের পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিলের ওপর আপত্তি, বিলের ওপর জনমত যাচাই-বাছাইয়ের প্রস্তাব এবং দফাওয়ারি সংশোধনী প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় ৪৬ শতাংশ সময় ব্যয়িত হয়। এই আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের মধ্যে প্রধান বিরোধী দল ৭২ শতাংশ সময় অংশগ্রহণ করে। সংসদে আইন পাসের প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, বিলের খসড়ায় জনমত যাচাই-বাছাইয়ের জন্য উল্লিখিত ব্যবহারিক পদ্ধতিগুলোর কার্যকারিতার ঘাটতি, অধিবেশনে বিরোধী সদস্যদের প্রস্তাবগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হওয়ার চর্চার অপ্রতুলতার কারণে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়নি। বিলের ওপর আপত্তি, সংশোধনী, জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাবের ক্ষেত্রে সরকারদলীয় সদস্যসহ প্রধান বিরোধী দল এবং অন্যান্য বিরোধী সদস্যদের অংশগ্রহণ থাকলেও তা কয়েকজন সদস্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আইনের ওপর আলোচনায় মোট সদস্যদের মাত্র ১১ শতাংশ সদস্য অংশগ্রহণ করেছেন। বিল উত্থাপন ও বিলের ওপর সংসদ সদস্যদের আলোচনা এবং মন্ত্রীর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিল পাস করতে গড়ে সময় লেগেছে প্রায় ৩১ মিনিট।

---

[৬] সংসদ পরিচালনার ব্যয় হিসাবের ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদের ২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের মধ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ও বিভিন্ন ভাতা, সম্পদ ও অবকাঠামো মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয়, বিভিন্ন সরবরাহ ও সেবা সম্পর্কিত ব্যয়, সংসদ টিভির জন্য অনুন্নয়ন রাজস্ব ও মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট অর্থের সাথে বার্ষিক বিদ্যুৎ বিলের ব্যয়িত অর্থ যুক্ত করে প্রাক্কলন করা হয়েছে। তবে এ ব্যয় থেকে সংসদীয় কমিটির বার্ষিক ব্যয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর চাঁদা বাদ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জাতীয় সংসদের সংশোধিত অনুন্নয়ন ব্যয় ছিল প্রায় ২৩৮ দশমিক ৩৩ কোটি টাকা, সংসদীয় কমিটির বার্ষিক ব্যয় ৭ দশমিক ৫ কোটি টাকা, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা ১ দশমিক ১২ কোটি টাকা এবং বিদ্যুৎ বিল ৬ দশমিক ৮১ কোটি টাকা (২০১৫-১৬)। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সংসদের অধিবেশনের মোট প্রকৃত সময় ২৪৩ ঘন্টা ৯ মিনিট (কোরাম-সংকটসহ)। এই হিসাবে সংসদ পরিচালনায় প্রতি মিনিটে গড় অর্থমূল্য দাঁড়ায় ১ লাখ ৬২ হাজার ৪৩৪ টাকা। এ প্রাক্কলনটি সংসদ পরিচালনার প্রতি মিনিটের গড় ব্যয়ের একটি ধারণা দিতে প্রস্তুত করা হয়েছে ।

৭.১ আর্থিক বিষয়-সম্পর্কিত কার্যক্রম : বাজেট আলোচনা

বাজেট অধিবেশনে মোট ৬৯ ঘণ্টা ৮ মিনিট সময় ব্যয়িত হয়, যা মোট সময়ের ২০ শতাংশ। মূল বাজেটের ওপর আলোচনায় ২৩৩ জন সদস্য প্রায় ৫১ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট (৭৫ শতাংশ), ৯ জন সদস্য সম্পূরক বাজেটের ওপর আলোচনায় প্রায় ১ ঘণ্টা ২৯ মিনিট (২ শতাংশ) এবং ৪৩ জন সদস্য মঞ্জুরি দাবি উত্থাপন ও এ-সম্পর্কিত আলোচনায় প্রায় ২ ঘণ্টা ৫২ মিনিট (৪ শতাংশ) অংশগ্রহণ করেন। সময় পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সদস্যরা তাদের বরাদ্দ সময়ের ১১ শতাংশ সময় অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার করেন, যেখানে সংসদের ভেতরের প্রতিপক্ষের (৩১ বার) তুলনায় সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে (১৭৪ বার) নিয়ে এ ধরনের ভাষা প্রয়োগের প্রাধান্য দেখা যায়। বিরোধী দলের বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি, গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আহ্বান প্রাসঙ্গিক বিষয় সংশ্লিষ্টতার প্রতিফলন হিসেবে লক্ষণীয় হলেও বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদানের আরও সুযোগ রয়েছে।

৮. জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহি কার্যক্রম

৮.১ প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব মোট ১৭টি কার্যদিবসে অনুষ্ঠিত হয়। এই পর্বে ৪৯ জন সংসদ সদস্য অংশগ্রহণ করেন, যাদের মধ্যে ৩৪ জন সরকারি দলের, ১০ জন প্রধান বিরোধী দলের এবং ৫ জন অন্যান্য বিরোধী সদস্য। প্রধানমন্ত্রীকে যে বিষয়গুলো নিয়ে সদস্যরা প্রশ্ন করেন তা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল বিভিন্ন প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কিত (৩৩ শতাংশ)। এই পর্বের উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ হলো প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করার পরিবর্তে সংসদনেতার বিভিন্ন কার্যক্রম ও তার অর্জন নিয়ে সদস্যদের আলোচনা। মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে ৬০টি কার্যদিবসে মোট ২০২ জন সদস্য অধিবেশনের প্রায় ১৮ দশমিক ৮ শতাংশ সময় অংশ নেন। উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সড়ক পরিবহন ও সেতু (৩৩টি) মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত। প্রশ্নের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, উন্নয়ন প্রকল্প (সেবা/স্থাপনা) পরিকল্পনা প্রস্তাব নিয়ে উত্থাপিত প্রশ্ন ছিল সবচেয়ে বেশি (৪২ শতাংশ)। এ ছাড়া সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করার অংশ হিসেবে বিদ্যমান সম্পদ, আয়-ব্যয় ও বরাদ্দ অর্থের হিসাব, বিদ্যমান নিয়মনীতি ও পদক্ষেপ, বিভিন্ন প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ প্রস্তাব করে সদস্যরা প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

৮.২ সিদ্ধান্ত প্রস্তাব (বিধি ১৩১ ও ১৪৪ অনুযায়ী আলোচনা)

এই পর্বে ৩৪টি নোটিশ উত্থাপিত হয়, আলোচিত হয় ১৮টি, স্থগিত করা হয় ১৫টি এবং ১টি প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। আলোচিত ১৮টি প্রস্তাবের মধ্যে ১৭টিই উত্থাপনকারীদের সম্মতিক্রমে অন্যান্য সংসদ সদস্যের কণ্ঠভোটে প্রত্যাহৃত হয়। দ্বাদশ অধিবেশনে 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকারীদের সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা'র প্রস্তাবটি সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সদস্যরা তাদের সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার চাহিদা এবং জাতীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্তের জন্য যেসব প্রস্তাব উত্থাপন করেন,

তার মধ্যে নতুন স্থাপনা/সেবা প্রবর্তনের প্রস্তাব সবচেয়ে বেশি (৬৭ শতাংশ)। এ ছাড়া নতুন নীতিমালা প্রণয়ন, বিভিন্ন কার্যক্রমে বরাদ্দ প্রদান, সংস্কার কর্মসূচি ও বিদ্যমান সেবার মান উন্নয়নে প্রস্তাব উল্লেখযোগ্য।

৮.৩ জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে নোটিশ

বিধি ৭১ অনুযায়ী জমাকৃত ১৫৭০টি নোটিশের মধ্যে ৯০টি আলোচনার জন্য গৃহীত হয়। এই গৃহীত নোটিশের মধ্যে ৩২টি নোটিশ সংসদে আলোচিত হয় এবং মন্ত্রীরা সরাসরি সেগুলোর উত্তর দেন। সর্বোচ্চসংখ্যক নোটিশ (৪টি করে) রেলপথ ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত। যেসব নোটিশ গ্রহণ করা হয়নি তার মধ্যে মোট ৪৭৮টি নোটিশের ওপর মোট ১২২ জন সদস্য বক্তব্য উপস্থাপন করেন। স্থানীয় সরকার, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন-সম্পর্কিত মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট নোটিশের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি (৮৫টি)। উল্লেখ্য, এই বিধিতে নোটিশ সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত লিখিতভাবেও সংশ্লিষ্ট সদস্যদের অবগত করা হয়।

৮.৪ অনির্ধারিত আলোচনা

এই পর্বে মোট সময়ের প্রায় শতকরা ৪ দশমিক ৯ ভাগ সময় ব্যয়িত হয়, মোট ৭০ জন সদস্য বক্তব্য দেন। অনির্ধারিত আলোচনার বিষয়গুলোর মধ্যে সদস্যদের উত্থাপিত বিষয়ের ধরন পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, সমসাময়িক ঘটনা ও সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি (২৭ শতাংশ) আলোচনা হয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য ধরনের মধ্যে বিভিন্ন প্রকল্প ও সেবা কার্যক্রম; আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও জননিরাপত্তা; সরকার ও সরকারপ্রধানের জনপ্রিয়তা ও প্রশংসা; বিভিন্ন ঘটনা, সংবাদ ও প্রতিবেদনের নিন্দা/প্রতিবাদ উল্লেখযোগ্য।

৮.৫ সাধারণ আলোচনা

সাধারণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় মোট সময়ের প্রায় ৩ দশমিক ৪ শতাংশ। আলোচনার বিষয় পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, চারটির মধ্যে তিনটি প্রস্তাব (৭৫ শতাংশ) ছিল সরকারপ্রধানকে তার বিভিন্ন অর্জনের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন প্রসঙ্গে। সাধারণ আলোচনায় সদস্যরা এ পর্বের মোট সময়ের ২৪ শতাংশ বিভিন্ন অসংসদীয় ভাষা ব্যবহারে ব্যয় করেন।

মোট ৩১২ জন সংসদ সদস্য এই পর্বগুলোর কোনো না কোনো পর্বে অংশগ্রহণ করেন। স্পিকার ব্যতীত মোট ৩৭ জন সদস্য (প্রায় ১১ শতাংশ) কোনো পর্বের আলোচনায় অংশ নেননি। উল্লেখ্য, তাদের মধ্যে ৩২ শতাংশ সদস্য শতকরা ৫০ ভাগ কার্যদিবসের বেশি সময় উপস্থিত থাকলেও আলোচনা পর্বে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ দেখা যায়নি। জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো চুক্তি ছাড়া সম্পাদিত সব আন্তর্জাতিক চুক্তি রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সংসদে উপস্থাপন করার ব্যবস্থা গ্রহণের সাংবিধানিক বিধান থাকলেও পূর্ববর্তী অধিবেশনগুলোর মতোই এ ধরনের কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তিবিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়নি।

উল্লেখ্য, পরোক্ষ উৎস থেকে প্রাপ্য তথ্য অনুযায়ী, ২০১৫-১৬ সালে বিভিন্ন দেশের সাথে ৬০টি চুক্তি সম্পাদিত হয়।[৭]

৮.৬ সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম

এ সাতটি অধিবেশন চলাকালে ৪৭টি কমিটি মোট ৩৩৭টি সভা করে। এর মধ্যে সরকারি হিসাব-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সর্বোচ্চ ২২টি সভা করে। উল্লেখ্য, কেবল দুটি কমিটি বিধি অনুযায়ী মাসে একটি বা তার বেশিসংখ্যক সভা করে। তিনটি কমিটি কোনো সভা করেনি।

চিত্র ২ : কমিটির সভা অনুষ্ঠান (সংখ্যা)

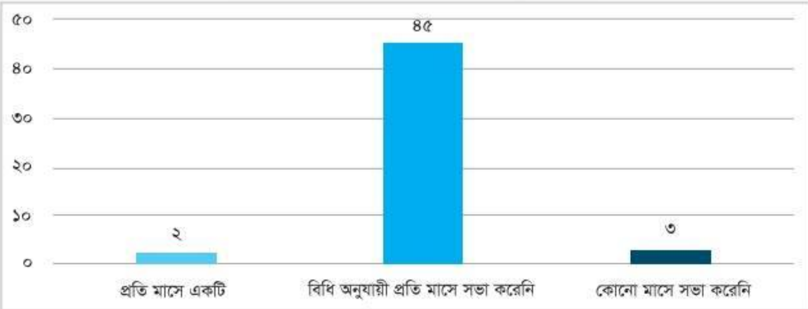

কমিটির সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে সংসদে বিরোধী দলের প্রতিনিধিত্বের অনুপাতে কমিটির সদস্য মনোনয়ন করা হয়েছে। কমিটির সদস্য নির্বাচনের সময় তাদের দক্ষতা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, ব্যবসায়িক সংশ্লিষ্টতা দেখা হয়নি। কমিটির সভাপতি ও সদস্য নির্বাচনে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ-প্রক্রিয়ায় সরকারি দলের এবং দলীয়প্রধানের প্রাধান্য লক্ষণীয়।[৮] হলফনামা এবং অন্যান্য উৎসের[৯] তথ্য অনুযায়ী নয়টি কমিটিতে[১০] সদস্যদের কমিটি সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক সম্পৃক্ততা দেখা যায়, যা কার্যপ্রণালি বিধির লঙ্ঘন।

এ সাতটি অধিবেশন চলাকালে মোট ১০টি কমিটির ১০টি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়, যার মধ্যে সাতটি কমিটির ক্ষেত্রেই এগুলো তাদের প্রথম প্রতিবেদন। প্রকাশিত ১০টি প্রতিবেদন অনুযায়ী কমিটি সভায় সদস্যদের সার্বিক গড় উপস্থিতি প্রায় ৬৫ শতাংশ। যে ১০টি কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় তার তথ্য অনুযায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশের মধ্যে ৩৯ শতাংশ বাস্তবায়িত হয়েছে।

[৭] http://bdnews24.com/bangladesh ; http://www.reuters.com ;http://www.mof.gov.bh ; http://bangladesh.mid.ru ; https://www.jica.go.jp ; https://www.government.nl ; http://www.government.se ; www.thedailystar.net(last viewed on January ২০১৭)

[৮] আফরোজ, ফ, রোজেটি, জ, বাংলাদেশে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যকারিতা : সমস্যা ও উত্তরণের উপায়, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০১৫।

[৯] প্রাগুক্ত।

[১০] বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ধর্ম মন্ত্রণালয়, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কামিটি।

বাস্তবায়িত সিদ্ধান্তগুলোর বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সর্বোচ্চ ৩৩ শতাংশ সুপারিশ ছিল পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা-সম্পর্কিত। বিভিন্ন কমিটির সুপারিশ পর্যবেক্ষণ করে কিছু অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধ-সম্পর্কিত সুপারিশ পাওয়া যায়–

- চিড়িয়াখানা ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সব দুর্নীতি ও অনিয়ম তদন্ত করে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য কমিটি গঠন।[১১]
- সরকারি ৮টি দুগ্ধ খামারে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও অনিয়ম এবং খামারগুলো লাভজনক করার ক্ষেত্রে সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক রিপোর্ট প্রদানের জন্য কমিটি গঠন।[১২]
- নকল ওষুধ উৎপাদনকারী, অনুমোদনকারী ও বিক্রয়কারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ।[১৩]
- সুনির্দিষ্ট কিছু ওষুধ কোম্পানি নির্দিষ্ট কয়েকটি গ্রুপের ওষুধ উৎপাদন করতে পারবে না।[১৪]
- কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নয় এমন কাউকে প্রকল্পের টাকায় বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ না দেওয়ার সুপারিশ।[১৫]
- পচা গম আমদানি করায় দায়ী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে শত কোটি টাকা আদায় এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানকে কালো তালিকাভুক্ত করার সুপারিশ।[১৬]
- গাজীপুরের কালিয়াকৈর এলাকায় বন ধ্বংসকারী চেক স্টেশন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ।[১৭]
- যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান খেলাপি হওয়ার আশঙ্কা আছে তাদের ঋণ প্রদান না করার সুপারিশ।[১৮]
- সোনালী ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যোগসাজশে হল-মার্ক গ্রুপ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অর্থ লোপাট, অনিয়ম ও দুর্নীতি সংঘটিত হয়েছিল সেসব জড়িত ব্যক্তির তালিকা এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ।[১৯]

ওয়াসা ও সিটি করপোরেশনের অনিয়ম ও দুর্নীতি সম্বন্ধে দাখিলকৃত স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন কমিটি প্রত্যাখ্যান করে পুনরায় তদন্ত সাপেক্ষে সঠিক প্রতিবেদন জমা দেওয়ার সুপারিশ করে। কারণ যে ধরনের অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে,

---

[১১] মৎস্য ও প্রানী সম্পদ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি- পঞ্চম বৈঠক (প্রথম প্রতিবেদন)।

[১২] মৎস্য ও প্রানী সম্পদ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি- নবম বৈঠক (প্রথম প্রতিবেদন)।

[১৩] স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত কমিটির সুপারিশ, দৈনিক যুগান্তর, ২১ এপ্রিল ২০১৬।

[১৪] স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত কমিটির সুপারিশ, দৈনিক যুগান্তর, ১৩ মে ২০১৬।

[১৫] কৃষি মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত কমিটির সুপারিশ, দৈনিক যুগান্তর, ১১ মার্চ ২০১৬।

[১৬] খাদ্য মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত কমিটির সুপারিশ, দৈনিক যুগান্তর, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬।

[১৭] বন মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত কমিটির সুপারিশ, দৈনিক যুগান্তর, ৮ জানুয়ারি ২০১৬।

[১৮] সরকারি প্রতিষ্ঠান-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি - ১৮তম বৈঠক (দ্বিতীয় প্রতিবেদন)।

[১৯] প্রাগুক্ত।

উল্লেখ্য, স্থায়ী কমিটিগুলোর সভায় গণমাধ্যমের প্রবেশাধিকার না থাকায় এবং কমিটির তার সাথে প্রতিবেদনের তথ্যের সামঞ্জস্য পাওয়া যায়নি।[২০] প্রতিবেদন সংসদ সচিবালয় থেকে প্রকাশে বিলম্ব হওয়ায় কমিটি-সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়া সম্ভব হয় না।

৯. রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব

এই আলোচনা পর্বে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কিছু অংশ ছাড়া সদস্যদের বক্তব্যজুড়ে প্রাধান্য পেয়েছে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোট সম্পর্কে অসংসদীয় ভাষার (কটূক্তি, আক্রমণাত্মক ও অশ্লীল শব্দ) ব্যবহার এবং অন্য দলের শাসনামলের কার্যক্রমের ব্যর্থতা। সদস্যরা সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নিয়ে ১ হাজার ৫৭৯ বার এবং সংসদের ভেতরের প্রতিপক্ষকে নিয়ে ২৬৫ বার অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার করেন। সদস্যদের বক্তব্যে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সংসদের ভেতরের প্রতিপক্ষ সম্পর্কিত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয় উপস্থাপন অব্যাহত থাকতে দেখা যায়। রাষ্ট্রপতির ভাষণের বিষয় সংশ্লিষ্ট দিকনির্দেশনা নিয়ে সদস্যদের বক্তব্যে নিজস্ব নির্বাচনী এলাকার উন্নয়ন-সম্পর্কিত পরিকল্পনার প্রস্তাব উত্থাপন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি প্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ লক্ষণীয়। বিরোধী দল কর্তৃক কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থান ও কার্যক্রম নিয়ে গঠনমূলক সমালোচনা করতেও দেখা যায়।

১০. সংসদীয় কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় স্পিকারের ভূমিকা

কার্যপ্রণালি বিধি ২৭০-এর ৬, ৭ ও ৯ উপবিধি লঙ্ঘন করে সরকার ও বিরোধীদলীয় সদস্যরা অসংসদীয় আচরণ ও ভাষা ব্যবহার করেছেন। উল্লেখ্য, কার্যপ্রণালি বিধিতে উল্লিখিত আক্রমণাত্মক/ কটূক্তি/ অশ্লীল/সংসদ-বিগর্হিত/ অসৌজন্যমূলক/ মানহানিকর বক্তব্য অসংসদীয় ভাষা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া কোনো সদস্য বিদ্রূপাত্মক বাচনভঙ্গি ও অঙ্গভঙ্গি প্রয়োগের মাধ্যমে কাউকে আক্রমণ করে, কাউকে হেয় করে তাদের বক্তব্য প্রদান করে থাকলে সেগুলোও এখানে অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। বিভিন্ন আলোচনা পর্বে সদস্যরা অসংসদীয় ভাষার ব্যবহারে মোট সময়ের ১৫ শতাংশ ব্যয় করেন। সরকারি ও বিরোধী উভয় দলের নেতা এবং সদস্যরা সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নিয়ে বিভিন্নভাবে কটাক্ষ করলেও স্পিকারকে অনেক ক্ষেত্রে এ ধরনের আলোচনার সময় নীরব ভূমিকায় দেখা যায়। সংসদীয় কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্বের আলোচনায় সদস্যরা ৪৩৩ বার সংসদের ভেতরের প্রতিপক্ষ দলকে নিয়ে এবং ২ হাজার ১০১ বার সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নিয়ে অসংসদীয় ভাষার অবতারণা করেন। কার্যপ্রণালি বিধি লঙ্ঘন করে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোটের প্রসঙ্গে সরকারি দল এবং বিরোধী দলের সদস্যদের অসংসদীয় ভাষার ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে স্পিকারের প্রত্যাশিত ভূমিকার ঘাটতি দেখা যায়। বিধি অনুযায়ী অধিবেশন চলাকালে গ্যালারিতে শৃঙ্খলা রক্ষা করা স্পিকারের দায়িত্ব হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার কার্যকর ভূমিকার ঘাটতি লক্ষণীয়। এর মধ্যে অধিবেশন চলাকালীন নিজ নিজ আসন ছেড়ে অন্য আসনে অবস্থান নিয়ে অন্য সদস্যদের সাথে কথা বলা, অনেক সদস্যের ক্ষেত্রে নিজেদের

[২০] স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত কমিটির সুপারিশ, দৈনিক সমকাল, ৬ আগস্ট ২০১৫

মধ্যে ছোট ছোট গ্রুপে কথা বলা, অধিবেশন চলাকালীন সদস্যদের সংসদ কক্ষের ভেতর বিচ্ছিন্নভাবে চলাফেরা করা, কোনো সদস্যের বক্তব্য চলাকালীন তার নিকটবর্তী আসনের সদস্য কর্তৃক নিজ আসনে বসে নিজেদের মধ্যে কথা বলা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

১১. জেন্ডার প্রেক্ষিত : সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সংসদ সদস্যের অংশগ্রহণ

এ সাতটি অধিবেশনে ৬১ শতাংশ নারী মোট কার্যদিবসের ৭৫ শতাংশের বেশি কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে সাতজন নারী সদস্য (তিনজন সংরক্ষিত আসন), মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে মোট ৪২ জন (৩২ জন সংরক্ষিত আসন), চারজন নারী সদস্য (তিনজন প্রধান বিরোধী দলের) বিলের ওপর জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাব এবং সংশোধনী প্রস্তাব দেন, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ৭১ বিধিতে ৮ জন নারী সদস্য ৯টি নোটিশের ওপর এবং ৭১-ক বিধিতে ৩৩ জন নারী সদস্য ১১৭টি নোটিশের ওপর আলোচনা করেন। এ ছাড়া ৫৬ জন (৩৯ জন সংরক্ষিত আসন) নারী সদস্য মূল বাজেট আলোচনায় এবং ৫০ জন সদস্য রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় বক্তব্য রাখেন। সরকারি প্রতিশ্রুতি-সম্পর্কিত কমিটিতে কোনো নারী সদস্য নেই, ৮টি কমিটির সভাপতি নারী (৪টি কমিটিতে স্পিকার পদাধিকারবলে সভাপতি)। নারী সদস্যদের সংখ্যাগত বৃদ্ধি ঘটলেও আইন প্রণয়ন, প্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায় নারী সদস্যদের ভূমিকা এখনো প্রান্তিক পর্যায়ে রয়ে গেছে। আইন প্রণয়নসহ সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অন্যান্য কার্যক্রমে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ সীমিত পর্যায়ের।

১২. সংসদীয় কার্যক্রমে বিরোধী দলের ভূমিকা

স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠায় সরকারি দলের পাশাপাশি বিরোধী দলের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রধান বিরোধী দল হিসেবে জাতীয় পার্টি সংসদে প্রতিনিধিত্ব করলেও সরকারের মন্ত্রিসভায় প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি অর্থাৎ সরকারে তাদের দ্বৈত অবস্থান এবং দশম সংসদের প্রায় তিন বছরের বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রধান বিরোধী দলের বিতর্কিত অবস্থানের কারণে তাদের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ। সংসদীয় কার্যক্রমে সরকারদলীয় সদস্যদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোটকে নিয়ে অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। আইন প্রণয়ণের মতো গুরুত্বপূর্ণ পর্বে জনমত যাচাই-বাছাই ও সংশোধনী প্রস্তাব দিয়ে আলোচনা করা, প্রস্তাব গৃহীত না হওয়ায় ওয়াকআউটের মতো সিদ্ধান্ত নিলেও তাদের প্রস্তাবগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হতে দেখা যায় না। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, আর্থিক অনিয়ম নিয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে দেখা যায়। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলতে যথেষ্ট সময় না দেওয়ায় প্রধান বিরোধী সদস্যদের ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে দেখা যায়।

১৩. উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

অষ্টম, নবম ও দশম সংসদে সংসদীয় কার্যক্রমের নির্দেশক পর্যবেক্ষণে অধিবেশনের গড় বৈঠককাল তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি, আইন প্রণয়নে মোট ব্যয়িত সময়ের শতকরা হার আগের তুলনায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি, প্রতি কার্যদিবসে সদস্যদের গড় উপস্থিতির হার তুলনামূলকভাবে কিছুটা বৃদ্ধি, প্রতি কার্যদিবসের গড় কোরাম-সংকট কিছুটা হ্রাস, বিরোধী দলের সংসদ বর্জন না করা এবং সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে আগের অধিবেশনগুলোর তুলনায় বিরোধী দলের

অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, বিরোধী দল কর্তৃক সরকারের কাজের গঠনমূলক সমালোচনার মতো কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যায়। আইন প্রণয়নে ব্যয়িত মোট সময় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেলেও আইনপ্রতি ব্যয়িত গড় সময়ের বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য নয়। অন্যদিকে সরকারি ও বিরোধী উভয় পক্ষের বক্তব্যে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সংসদের ভেতরের প্রতিপক্ষ নিয়ে অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার ও অধিবেশন চলাকালীন সদস্যদের আচরণে বিধির ব্যত্যয়, অসংসদীয় আচরণ ও ভাষার ব্যবহার বন্ধে স্পিকারের কার্যকর ভূমিকার ঘাটতি; অন্যান্য পর্বে (অনির্ধারিত আলোচনা, বাজেট ও রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা) সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত আলোচিত হত্যাকাণ্ড, জঙ্গি অপতৎপরতা, আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতিবিষয়ক আলোচনা করা হলেও জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিশ পর্বে উক্ত বিষয় উত্থাপন করে আলোচিত না হওয়া (অধিবেশনে উত্থাপিত নোটিশ পর্যবেক্ষণ করে); আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলো রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সদস্যদের আলোচনার জন্য উপস্থাপিত না হওয়া লক্ষ করা গেছে। আইন প্রণয়ন পর্বে সদস্যদের (বিশেষ করে সরকারি দল) অংশগ্রহণ কম ছিল; বিরোধী সদস্যদের মতামত ও প্রস্তাব গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়নি। আইন প্রণয়নে জনমত গ্রহণের বিদ্যমান পদ্ধতিগুলোর প্রয়োগের ঘাটতির ফলে জন-অংশগ্রহণের সীমিত সুযোগ, সংসদীয় কার্যক্রমের আইন প্রণয়ন ও প্রশ্নোত্তর পর্বে নারী সদস্যদের তুলনামূলক কম অংশগ্রহণ ছিল। সদস্যদের সংশ্লিষ্ট কমিটি-সম্পর্কিত ব্যবসায়িক সংশ্লিষ্টতা, বিধি অনুযায়ী কমিটির সভা না হওয়া, কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের সময়সীমা ও বাধ্যবাধকতা না থাকা, সংসদীয় কার্যক্রম-সম্পর্কিত (সংসদের কার্যবিবরণী) ও কমিটিসংশ্লিষ্ট তথ্যের (কমিটি প্রতিবেদন) উন্মুক্ততা ও অভিগম্যতার ঘাটতি ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ লক্ষণীয়।

অষ্টম ও নবম সংসদে বিরোধী দল সংসদ বর্জন করলেও দশম সংসদে এখনো এ ধরনের চর্চা দেখা যায়নি। এ ছাড়া অন্যান্য সংসদের তুলনায় বিরোধী দলের কম ওয়াকআউট করার মাধ্যমে সংসদীয় কার্যক্রমে তারা যে ইতিবাচকভাবে অবস্থান করছে তা নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের ভিন্নতার কারণে দশম সংসদ নির্বাচন এবং পরবর্তী সময়ে সংসদীয় কার্যক্রমে বিভিন্ন সময়ে প্রধান বিরোধী দলসহ অন্যান্য বিরোধী সদস্যদের অবস্থান বিতর্কিত এবং প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। কোনো কোনো সদস্যকে জাতীয় সংসদে সদস্য হিসেবে পদ রক্ষায় অধিবেশনে হাজিরা দিতে দেখা যায়। দশম সংসদের প্রথম এক বছর ধরে পালিয়ে থাকার পর অনুপস্থিতির ৬৫তম কার্যদিবসে সরকারদলীয় সদস্য সংসদে এসে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করেন কিন্তু অধিবেশনে যোগ দেননি, পরবর্তী বছর (২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) মাত্র একটি কার্যদিবসে সেই সদস্য হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর দিতে এলেও কোনো আলোচনা পর্বে অংশ নেননি। উল্লেখ্য, তিনি হত্যা মামলায় অভিযুক্ত এবং পলাতক ছিলেন। পরে গ্রেপ্তার হয়ে এখন কারাগারে আছেন। ২০১৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে এই আসন শূন্য রয়েছে। এই সদস্য সম্পর্কে সংসদ অধিবেশনে তেমন আলোচনা হতেও দেখা যায়নি।[২১] সংসদীয় গণতন্ত্রচর্চায় কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে সদস্যদের স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষেত্রে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের বাধা লক্ষণীয়। সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিলে হাইকোর্টের রায়ের পর্যবেক্ষণেও বলা হয়, 'সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংসদ সদস্যদের হাত-পা বেঁধে দিয়েছে। সংসদে দলীয় অবস্থানের বিষয়ে প্রশ্ন

[২১] দৈনিক প্রথম আলো, ৮ জুলাই, ২০১৫; দৈনিক যুগান্তর, ৭ জুলাই, ২০১৫।

করার স্বাধীনতা তাদের নেই। এমনকি যদি দলীয় সিদ্ধান্ত ভুলও হয়, তাহলেও নয়। তারা দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে সংসদ সদস্যরা তাদের রাজনৈতিক দলের নীতিনির্ধারকদের কাছে জিম্মি।'

১৪. সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য টিআইবির সুপারিশ

সংসদে সদস্যদের অংশগ্রহণ

১. 'সংসদ সদস্য আচরণবিধি বিল' প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন সাপেক্ষে পুনরায় সংসদে উত্থাপন, চূড়ান্ত অনুমোদন ও আইন হিসেবে প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

২. সংসদে অধিকতর শৃঙ্খলা রক্ষাসহ অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার বন্ধে বিধি অনুযায়ী স্পিকারকে আরও জোরালো ভূমিকা নিতে হবে।

৩. সরকারের জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায় প্রধান বিরোধী দল প্রকৃত বিরোধী দলসুলভ ভূমিকা পালনে আগ্রহী হলে তাদের দ্বৈত অবস্থান থেকে সরে আসতে হবে।

৪. সদস্যদের স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের জন্য সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে, যেখানে দলের বিরুদ্ধে আস্থা/অনাস্থার ভোট এবং বাজেট ছাড়া বাকি সব ক্ষেত্রে সদস্যদের মতপ্রকাশ ও সমালোচনার বিধান থাকবে।

৫. আন্তর্জাতিক চুক্তি সদস্যদের আলোচনার জন্য রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সংসদে উপস্থাপন করতে হবে, জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে প্রকাশযোগ্য নয় এমন বিষয় ব্যতীত অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তির বিস্তারিত ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

সংসদীয় কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি

৬. আইন প্রণয়নে জনগণের অধিকতর অংশগ্রহণের জন্য জনমত যাচাই-বাছাইয়ের প্রস্তাব গ্রহণ করতে হবে, পিটিশন কমিটিকে কার্যকর করতে হবে, আইনের খসড়ায় জনমত গ্রহণের জন্য সংসদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

৭. সরকারি দলকে বিরোধী দলের যৌক্তিক প্রস্তাবগুলো বিবেচনায় আনতে হবে।

কমিটি কার্যকর করা

৮. বিধি অনুযায়ী নিয়মিত কমিটির সভা অনুষ্ঠান করতে হবে।

৯. সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী কমিটির কার্যক্রমকে সম্পূর্ণভাবে স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত রাখতে হবে।

১০. কমিটির প্রতিবেদন নিয়মিত (প্রস্তাব - ছয় মাসে অন্তত ১টি) প্রকাশ করতে হবে।

তথ্য প্রকাশ

১১. সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতি, কমিটির প্রতিবেদনসহ সংসদ-সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। ওয়েবসাইটের তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে, বার্ষিক সংসদীয় ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করতে হবে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬
দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন-সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যের ওপর বাংলাদেশের প্রস্তুতি, বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ*

শাহজাদা এম আকরাম, মো. ওয়াহিদ আলম, আবু সাঈদ মো. জুয়েল মিয়া, মো. রেযাউল করিম, আতিয়া আফরিন, খালেদা আক্তার, নাহিদ শারমিন, মো. মোস্তফা কামাল ও মো. শহিদুল ইসলাম

১. প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

'এজেন্ডা ২০৩০' বা 'এসডিজি' হিসেবে পরিচিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন শীর্ষক বৈঠকে ১৯৩টি সদস্যরাষ্ট্র দ্বারা গৃহীত হয়। ১ জানুয়ারি ২০১৬ থেকে এসডিজি কার্যকর হয়েছে। জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্রগুলো ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি বাস্তবায়ন করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। এসডিজির মধ্যে মোট ১৭টি 'বৈশ্বিক অভীষ্ট' রয়েছে এবং এসব অভীষ্টের মধ্যে ১৬৯টি লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত। এসব লক্ষ্যের অগ্রগতির নির্দেশক হিসেবে ২৪৪টি সূচক চিহ্নিত করা হয়েছে। 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট' বা 'এমডিজি' থেকে এসডিজির মূল পার্থক্য হচ্ছে এটি এমডিজির সংখ্যাগত ধারণা থেকে গুণগত ধারণার ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করে।

এসডিজির একটি গুরুত্বপূর্ণ অভীষ্ট হচ্ছে এসডিজি ১৬, যেখানে 'টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন, সবার জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সব স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ' করার কথা বলা হয়েছে। এর অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্য ১২টি এবং সূচক ২৩টি। এসডিজির অন্যান্য অভীষ্ট অর্জনের জন্যও এই অভীষ্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিটি সদস্যরাষ্ট্র জাতিসংঘ নির্ধারিত লক্ষ্যগুলো অর্জনের অগ্রগতি জানিয়ে 'স্বেচ্ছাপ্রণোদিত জাতীয় পর্যালোচনা'র মাধ্যমে প্রতিবেদন দাখিল করতেও অঙ্গীকারবদ্ধ। এই প্রক্রিয়ায় সরকারের অগ্রগতি প্রতিবেদনের পরিপূরক হিসেবে স্বতন্ত্র বিশ্লেষণের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকারকে সহযোগিতা প্রদান করা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) অন্যতম উদ্দেশ্য। এসডিজি অর্জনের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের আইনি ও কাঠামোগত প্রস্তুতি কেমন, বাস্তব পরিস্থিতি এবং বিশেষ করে এসডিজি ১৬ অর্জন করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ কী কী তা চিহ্নিত করে সহায়তা করার জন্য এই গবেষণা হাতে নেওয়া হয়েছে।

* ২০১৭ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর টিআইবির সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

২. উদ্দেশ্য ও পরিধি

এই গবেষণার উদ্দেশ্য টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬-এর কয়েকটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশের প্রস্তুতি, বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা। এই গবেষণায় এসডিজি ১৬-এর ১২টি লক্ষ্যের মধ্যে চারটি লক্ষ্যের ওপর পর্যালোচনা (১৬.৪, ১৬.৫, ১৬.৬, ১৬.১০) করা হয়েছে। দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট বলে এসব লক্ষ্য নির্বাচিত হয়েছে। নির্বাচিত লক্ষ্যগুলোর মধ্যেও যেসব বিষয় দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসনের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নয়, সেগুলোর ওপর পর্যালোচনা করা হয়নি।

৩. গবেষণাপদ্ধতি

এটি একটি গুণগত গবেষণা, যেখানে প্রধানত গুণগত ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিমাণগত তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে। পরোক্ষ উৎস যেমন সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি, গবেষণা প্রতিবেদন, আন্তর্জাতিক সূচক, দেশভিত্তিক প্রতিবেদন, প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন, জাতীয় তথ্যভান্ডার, গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে পর্যালোচনা ও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ছাড়া মুখ্য তথ্যদাতা হিসেবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, সরকারি কর্মকর্তা, পেশাজীবী ও সাংবাদিকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ও প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে এপ্রিল-আগস্ট ২০১৭ সময়ের মধ্যে।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি লক্ষ্যকে নিম্নলিখিত তিনটি আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে :

প্রস্তুতি : এখানে সংশ্লিষ্ট লক্ষ্য-সংক্রান্ত আইনি, নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কেমন তা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

বাস্তবতা : আইনি, নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রায়োগিক বাস্তবতা আলোচনা করা হয়েছে।

চ্যালেঞ্জ : প্রায়োগিক ঘাটতির কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে।

৪. এসডিজি অর্জনে গৃহীত উদ্যোগ

এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারি উদ্যোগের মধ্যে উচ্চপর্যায়ের আন্তমন্ত্রণালয় এসডিজি বাস্তবায়ন ও তদারক কমিটি গঠন করা হয়েছে। এসডিজি বাস্তবায়নে মূল মন্ত্রণালয় ও সরকারি সংস্থাগুলোর কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সহযোগিতায় সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) এসডিজি তদারকির জন্য তথ্যের ঘাটতি বিশ্লেষণ করেছে এবং এসডিজি তদারকি কাঠামো তৈরি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন। ফলাফলভিত্তিক তদারকি ও মূল্যায়নের জন্য ওয়েবভিত্তিক তথ্যভান্ডার পদ্ধতি ('এসডিজি ট্র্যাকার' নামে পরিচিত) স্থাপন করা হয়েছে। এসডিজি অর্জনকে মাথায় রেখে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এসডিজি বাস্তবায়নে অর্থায়নের চাহিদা ও কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। এই চাহিদা অনুযায়ী ২০৩০ পর্যন্ত ৯২৮ দশমিক ৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। এ ছাড়া ২০১৭ সালের জন্য জাতিসংঘ দ্বারা নির্ধারিত কয়েকটি লক্ষ্যের ওপর জিইডি 'স্বেচ্ছাপ্রণোদিত জাতীয় পর্যালোচনা' প্রতিবেদন তৈরি করেছে, যা এ বছর জুলাই মাসে জাতিসংঘে উপস্থাপন করা হয়েছে। ওপরের

উদ্যোগ নেওয়ার প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন এনজিও, নাগরিক সমাজের প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি খাত ও গণমাধ্যমের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। বেসরকারি অংশীজনের উদ্যোগে এসডিজির জন্য নাগরিক প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই প্ল্যাটফর্মের আওতায় এসডিজি অর্জন-সংক্রান্ত সভা, সেমিনার, কর্মশালা ও গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

৫. এসডিজি অর্জনে গৃহীত উদ্যোগের চ্যালেঞ্জ

এসডিজির ২৪৪টি সূচকের মধ্যে বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য ২৪১টি। জিইডির তথ্যের ঘাটতির বিশ্লেষণ অনুযায়ী এর মধ্যে সরকারের কাছে ৭০টি সূচকের ওপর সম্পূর্ণ ও ১০৮টি সূচকের ওপর আংশিক তথ্য রয়েছে; বাকি ৬৩টি সূচকের ওপর সরকারি কোনো তথ্য নেই। দেখা যায় এসডিজি ১৬-এর অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি লক্ষ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট দুর্নীতি ও ঘুষ, সরকারি সেবা ও প্রতিষ্ঠানের ওপর জনগণের সন্তুষ্টি, বিচারবহির্ভূত হত্যা ইত্যাদির ওপর সরকারি কোনো তথ্য নেই এবং কয়েকটি বিষয় যেমন অর্থ পাচার ও সম্পদ পুনরুদ্ধারের ওপর সরকারের কাছে আংশিক তথ্য বিদ্যমান। এসডিজি ১৬-এর অন্তর্ভুক্ত দুর্নীতি ও ঘুষের ওপর আন্তর্জাতিক ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তথ্য-উপাত্তকে সরকারের একাংশের অস্বীকার করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। দুর্নীতি ও ঘুষের মতো রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর বিষয়ে সরকার কতটুকু নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠভাবে তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করবে, যেখানে আইনসভা, নির্বাহী বিভাগ ও সরকারি কর্মচারীদের একাংশের জড়িত থাকার ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে, তা নিয়ে আশঙ্কা বিদ্যমান। উপরন্তু দুর্নীতি ও ঘুষের ওপর তথ্য সংগ্রহে নাগরিক সমাজের প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করতেও সরকারের একাংশের প্রবল অনীহা বিদ্যমান।

লক্ষ্যভিত্তিক পর্যালোচনা

৬. লক্ষ্য ১৬.৪ : '২০৩০ সালের মধ্যে অবৈধ অর্থ ও অস্ত্র প্রবাহ উল্লেখযোগ্য হারে কমানো, ব্যবহৃত সম্পদের পুনরুদ্ধার ও প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়া শক্তিশালী করা এবং সব ধরনের সংঘবদ্ধ অপরাধ মোকাবিলা করা'।

এই লক্ষ্যের জন্য প্রযোজ্য সূচক (১৬.৪.১) হচ্ছে দেশের ভেতরে ও বাইরে অবৈধ অর্থ প্রবাহের মোট মূল্য (চলতি মার্কিন ডলারে)।

৬.১ প্রস্তুতি

অবৈধ অর্থ প্রবাহ ও সম্পদ পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন ২০১২ (সংশোধিত ২০১৫) এবং অপরাধ-সংক্রান্ত বিষয়ক পারস্পরিক আইনি সহযোগিতা আইন ২০১২ প্রণীত হয়েছে। অর্থ পাচার প্রতিরোধে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, যার মধ্যে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ), দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি) এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশন উল্লেখযোগ্য। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি ও দায়িত্ব ভিন্ন। এ ছাড়া অর্থ পাচার প্রতিরোধ ও জঙ্গি অর্থায়ন প্রতিরোধের জন্য জাতীয় সমন্বয় কমিটি, কার্যকর কমিটি, চুরি

যাওয়া সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। অর্থ পাচারসংক্রান্ত দুটি জাতীয় ঝুঁকি পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং দুটি খাতভিত্তিক (রিয়েল এস্টেট ও এনজিও) কাঠামোগত ঝুঁকি পর্যালোচনা সম্পাদন করা হয়েছে। অর্থ পাচার ও জঙ্গি অর্থায়ন প্রতিরোধের জন্য জাতীয় কৌশল (২০১৫-২০১৭) প্রণয়ন করা হয়েছে, যেখানে নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ছাড়া অর্থ পাচার প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অংশগ্রহণ করছে; বাংলাদেশ 'এগমন্ট গ্রুপ'-এর সদস্য, যেখানে ১৫২টি সদস্যরাষ্ট্র রয়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ বিশ্ব শুল্ক সংস্থা ও রিজিওনাল ইন্টেলিজেন্স লিয়াজোঁ অফিসেসের সদস্য। আর্থিক গোয়েন্দা তথ্যবিনিময়ের জন্য ইতিমধ্যে ৫৫টি দেশের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

৬.২ বাস্তবতা

প্রয়োজনীয় আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ থেকে বাইরে ও বাইরে থেকে দেশের ভেতরে অর্থ পাচারের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০০৫-২০১৪ সময়ে বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচারের পরিমাণ ১২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই সময়ে পাচারকৃত প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণ ৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আরেকটি প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১১-২০১৬ সময়ে সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও নাগরিকদের জমা কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে– ২০১৫ সালে ৪ হাজার ৬২৭ কোটি টাকা থেকে ২০১৬ সালে ৫ হাজার ৫৬০ কোটি টাকা ; যদিও কর্তৃপক্ষের ভাষ্য অনুযায়ী এর ৯৩ শতাংশ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যিক লেনেদেনের ভিত্তিতে পাওনা। অন্যদিকে বাংলাদেশে অবৈধভাবে অর্থ প্রবেশের পরিমাণ ২০০৫ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ১২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়া ২০১৬ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে সাইবার অপরাধীরা যে ১০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার চুরি করে তার মধ্যে ৮১ মিলিয়ন ফিলিপাইনে ও শ্রীলঙ্কায় ২০ মিলিয়ন ডলার পাচার করে।

চুরি যাওয়া সম্পদ পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য খুব বেশি নয়। ২০১৩ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ৯ দশমিক ৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (৭২ দশমিক ৮১ কোটি টাকা) বাজেয়াপ্ত, ২০১৬-১৭ সালে জরিমানা বাবদ শূন্য দশমিক ৩৪ মিলিয়ন ডলার (২ দশমিক ৭৩ কোটি টাকা) এবং বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে চুরি হওয়া ৩৪ দশমিক ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

তবে অর্থ পাচার প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে বাংলাদেশের অগ্রগতি লক্ষণীয়। প্যারিসভিত্তিক ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্কফোর্সের ৪০টি আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে টেকনিক্যাল কমপ্লায়েন্সের বিবেচনায় বাংলাদেশের অবস্থান সন্তোষজনক– এই ৪০টি আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে পুরোপুরি কমপ্লায়েন্ট ৬টি, বহুলাংশে কমপ্লায়েন্ট ২২টি এবং আংশিক কমপ্লায়েন্ট ১২টির ক্ষেত্রে। ব্যাসেল এএমএল ইনডেক্স ২০১৭ অনুসারে অর্থ পাচার (মানি লন্ডারিং) ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ সূচকে ১৪৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৮২তম।

অর্থ পাচার প্রতিরোধে বেশ কিছু কার্যক্রম চলমান। অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য বিএফআইইউ ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে। বিভিন্ন আর্থিক ও আর্থিক নয় এমন সংস্থা থেকে সন্দেহজনক অর্থবিনিময় প্রতিবেদন (এসটিআর) সংগ্রহ করে আইন প্রয়োগকারী ও নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার কাছে হস্তান্তর করা হচ্ছে। ২০১০-২০১৪ সময়ের মধ্যে দুর্নীতি, অর্থ পাচার, জঙ্গি অর্থায়ন, ওষুধ পাচার, মানব পাচার, জুয়া, আত্মসাৎ, কর ও শুল্ক অবমুক্ত-সংক্রান্ত ৩৮টি বৈদেশিক অনুরোধ পেয়েছে, অন্যদিকে ১৭টি অনুরোধ বিদেশে পাঠানো হয়েছে। অর্থ পাচার মামলার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত ১০টি মামলার বিচার সম্পন্ন হয়েছে, যেখানে ১০টি দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে। তবে বর্তমানে ২২২টি মামলা এখন পর্যন্ত অনিষ্পন্ন রয়েছে।

৬.৩ চ্যালেঞ্জ

অর্থ পাচার প্রতিরোধে যেসব চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান তার মধ্যে জাতীয় ও খাতভিত্তিক ঝুঁকি পর্যালোচনায় ঘাটতি উল্লেখযোগ্য। দেখা যায় এই পর্যালোচনায় নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর রাজনৈতিকীকরণ, দুর্নীতিতে রাজনৈতিক-প্রশাসনিক আঁতাত, সিকিউরিটিজ ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বোর্ডে সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যদের রাজনীতির সাথে ত্রিমুখী সম্পৃক্ততা চিহ্নিত করা হয়নি। এ ছাড়া রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের অর্থ পাচারের ঝুঁকি; যেমন : সাম্প্রতিক ঋণ কেলেঙ্কারি, নির্বাহী কমিটি বা বোর্ডে রাজনৈতিক নিয়োগ যথাযথভাবে চিহ্নিত করা হয়নি। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, সিকিউরিটিজ ও আর্থিক নয় এমন নির্দিষ্ট ব্যবসা বা পেশার (ডিএনএফবিপি) দ্বারা অর্থ পাচার কীভাবে হতে পারে সে-সংক্রান্ত ঝুঁকি ও ধারণায় ঘাটতি রয়েছে। অর্থ পাচার প্রতিরোধ-সংক্রান্ত জাতীয় কৌশলে কারিগরি দক্ষতা ও আর্থিক সহায়তার দিকনির্দেশনার ঘাটতি বিদ্যমান। এ ছাড়া কোম্পানি আইন ১৯৯৪ ও ট্রাস্ট আইন ১৮৮২-তে কোম্পানি ও ট্রাস্টগুলোর জন্য 'বেনামি মালিকানা'-সংক্রান্ত তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়নি।

অর্থ পাচার প্রতিরোধে নিয়ন্ত্রক ও তদারকি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতার ঘাটতি চিহ্নিত করা যায়। কোনো কোনো নিয়ন্ত্রক ও তদারকি প্রতিষ্ঠানে (যেমন দুদক, এনবিআর) সক্ষমতা ও নির্দিষ্ট মামলা পরিচালনা ইউনিটের অনুপস্থিতির কারণে অর্থ পাচার-সংক্রান্ত মামলার তদন্ত ও নিষ্পত্তিতে ঘাটতি রয়েছে। যেমন রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর মামলার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা, তদন্তের শুরুতে কার্যকরভাবে অর্থ পাচার-সংক্রান্ত অপরাধের তথ্য যাচাই না করা এবং অবৈধ অর্থের উৎস সন্ধান ও ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি লক্ষ করা যায়। অর্থ পাচার মামলা পরিচালনায় আদালত ও অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে। বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক ও তদারকি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আন্তপ্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার ওপর ভিত্তি করে মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়ার ঘাটতি রয়েছে। এ ছাড়া ডিএনএফবিপিগুলোর তদারকিতে ঘাটতি এবং অর্থ পাচারের পরিমাণ নির্ধারণ ও এ-সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সূচক যাচাইয়ের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতিও রয়েছে।

৭. লক্ষ্য ১৬.৫ : 'সব ধরনের দুর্নীতি ও ঘুষ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করা'।

এই লক্ষ্যের জন্য প্রযোজ্য সূচকগুলো হচ্ছে গত– ১২ মাসে কোনো সরকারি কর্মচারী বা কর্মকর্তার সাথে অন্তত একবার যোগাযোগ হয়েছে এবং তাকে ঘুষ প্রদান করেছে অথবা তাদের

পক্ষ থেকে ঘুষ দাবি করেছে– এমন মানুষের অনুপাত (সূচক ১৬.৫.১) এবং গত ১২ মাসে কোনো সরকারি কর্মচারী বা কর্মকর্তার সাথে অন্তত একবার যোগাযোগ হয়েছে এবং তাকে ঘুষ প্রদান করেছে, অথবা তাদের পক্ষ থেকে ঘুষ দাবি করা হয়েছে– এমন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অনুপাত (সূচক ১৬.৫.২)।

৭.১ প্রস্তুতি

বাংলাদেশে দুর্নীতিবিরোধী আইন, নীতি ও কৌশল বিদ্যমান। এসব আইনের মধ্যে দণ্ডবিধি-১৮৬০, ফৌজদারি কার্যবিধি আইন-১৮৯৮, দুর্নীতি দমন আইন-১৯৪৭, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন-২০০৪, সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধি-১৯৭৯, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ-১৯৭২, রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা-২০০৯, তথ্য অধিকার আইন-২০০৯, জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন-২০১১, অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন-২০০৯ উল্লেখযোগ্য। এসব আইনে দুর্নীতি-সংক্রান্ত কার্যক্রম সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান বর্ণিত হয়েছে। জাতীয় বিভিন্ন কৌশলপত্রে দুর্নীতি প্রতিরোধের অঙ্গীকার করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে রূপকল্প ২০২১, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২ এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০)। এ ছাড়া বাংলাদেশ জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশনে স্বাক্ষর, অনুসমর্থন করেছে ও পরবর্তী সময়ে তা বাস্তবায়নে কিছু উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নিয়েছে।

এসব আইন প্রয়োগের জন্য দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান, যার মধ্যে রয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), বিচার বিভাগ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল অফিস (ওসিএজি)। দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের জন্য দুদক ও বিচার বিভাগের মতো প্রতিষ্ঠানের আইনি স্বাধীনতা ও মর্যাদা নির্ধারিত, যার মাধ্যমে আইনগত ক্ষমতা, নির্ধারিত কর্তৃত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে। এ ছাড়া সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), বাংলাদেশ ব্যাংক, নির্বাচন কমিশন ও তথ্য কমিশন সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে এবং গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজ ও উন্নয়ন সহযোগীরা বেসরকারি অংশীজন হিসেবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। দুদকের দুর্নীতিবিরোধী উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে দুর্নীতি প্রতিরোধ, শনাক্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণে কার্যক্রম পরিচালনা, দুর্নীতি প্রতিরোধে নাগরিক সমাজ, উন্নয়ন সহযোগীসহ অন্যান্য অংশীজনের অংশগ্রহণ।

বিদ্যমান দুর্নীতিবিরোধী আইনগুলোতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মচারীদের সততা, স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা; উপহার, সুবিধা ও বন্ধুত্ব; স্বজনপ্রীতি, কর্তৃত্বের অপব্যবহার, স্বার্থের দ্বন্দ্ব সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন : সংসদ সদস্যদের জন্য আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে যে জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের আর্থিক তথ্য প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক (আরপিও), এটি সাধারণ জনগণের কাছে সহজলভ্য এবং লাভজনক কোনো প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করলে সংসদ সদস্যপদ বাতিল হওয়ার কথা।

একইভাবে সরকারি কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্যও আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। যেমন : দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যেখানে ক্ষমতা/ প্রভাব বিস্তার করার সম্ভাবনা

রয়েছে, সেখানে বিনিয়োগ করা; সরকারি কর্মচারীদের আওতার মধ্যে পড়ে এমন ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িত হওয়া সরকারি কর্মচারীদের জন্য নিষিদ্ধ। তাদের জন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হওয়ার ক্ষেত্রে পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান। সরকারি কর্মচারীদের প্রতিবছর শেষে সম্পদের বিবরণী ঘোষণা করতে হবে এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব অমান্য করলে শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। দুর্নীতির বিষয়ে তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা প্রদান ও তার গোপনীয়তা রক্ষার জন্য আইন প্রণীত হয়েছে।

সরকারি ক্রয় ও চুক্তিতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি-সংক্রান্ত বিধান রয়েছে। সরকারি ক্রয় আইন ২০০৬-এ ক্রয়ের সর্বোচ্চ সীমা উল্লিখিত হয়েছে। এ ছাড়া ক্রয়-সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশ, স্বতঃপ্রণোদিতভাবে সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বেসরকারি খাত থেকে দরদাতা নির্বাচন করার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল তথ্য প্রদান করলে শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

৭.২ বাস্তবতা

তবে যথেষ্ট আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সত্ত্বেও বাংলাদেশে দুর্নীতি ব্যাপকভাবে বিদ্যমান। দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি খাত ও প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নিতে গিয়ে খানা পর্যায়ে কী পরিমাণ ঘুষ ও দুর্নীতির অভিজ্ঞতা হয় তা নিয়ে টিআইবি নিয়মিতভাবে দেশব্যাপী জরিপ করে আসছে। দেখা গেছে, ধারাবাহিকভাবে খানা জরিপে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার উচ্চ। সর্বশেষ খানা জরিপে (২০১৫) দেখা গেছে, জরিপকৃত খানার ৬৭ দশমিক ৮ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে, যেখানে সেবা পেতে ৫৮ দশমিক ১ শতাংশ খানা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে।

দুর্নীতি ও ঘুষ-সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সূচকেও বাংলাদেশের স্কোর ও অবস্থান নিম্ন। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিআই) ২০১৬ সালের দুর্নীতির ধারণাসূচকে (শূন্য থেকে ১০০ স্কেলে) বাংলাদেশের পয়েন্ট ২৬ এবং ১৭৬টি দেশের মধ্যে ১৪৫তম ছিল। এই সূচকে বাংলাদেশ সব সময়ই উচ্চ-দুর্নীতিপ্রবণ দেশের শ্রেণিভুক্ত ছিল। বিশ্বব্যাংকের ২০১৬ সালের তথ্য অনুযায়ী, দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্কোর ১০০-এর মধ্যে ১৮ দশমিক ৮। গ্লোবাল কমপিটিটিভনেস র‍্যাংকিং ২০১৪ অনুসারে অবৈধ অর্থ প্রদান ও ঘুষের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্কোর ২ দশমিক ৩ (৭-এর মধ্যে) এবং অবস্থান ১৪৪টি দেশের মধ্যে ১৪০তম। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের ২০১৬-এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের দুর্নীতির প্রাক্কলিত অর্থমূল্য জিডিপির ৫ শতাংশ। অন্যদিকে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য (২০১৫) অনুযায়ী, এটি জিডিপির ২-৩ শতাংশ।

বাংলাদেশে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম প্রত্যাশিত পর্যায়ের নয়। দেখা যায় অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত করার হার কম এবং সার্বিকভাবে দুর্নীতির মামলা নিষ্পত্তির হারও কম। এ ছাড়া দুর্নীতির তদন্ত ও মামলা পরিচালনায় দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবের অভিযোগ রয়েছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৬ সালে প্রাপ্ত ১২ হাজার ৫৬৮টি অভিযোগের মধ্যে ১ হাজার ৫৪৩টি অনুসন্ধানের জন্য গৃহীত হয়, যেখানে এর আগের বছরগুলোতে গড়ে ১ হাজার ২০টি অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য গৃহীত

হয়েছিল। প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিভিন্ন বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ে ৫৪৩টি অভিযোগ প্রেরণ করা হয়েছে। ২০১৬ সালে ৩৫৯টি অবৈধ উপায়ে সুবিধা লাভসংক্রান্ত মামলা নথিভুক্ত ও ঘুষ নেওয়ার জন্য ১৩ জনকে আটক ও তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৬ সালে অবৈধ উপায়ে সুবিধা লাভসংক্রান্ত বিভিন্ন মামলায় ৩৮৮ জনকে আটক করা হয়েছে। অন্যান্য বছরের তুলনায় ২০১৭ সালে দুর্নীতির মামলায় শাস্তির হার বেড়েছে। দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমের মধ্যে দুদক প্রতিষ্ঠান ও এলাকাভিত্তিক গণশুনানির আয়োজন শুরু করেছে ২০১৫ সাল থেকে। এ ছাড়া নির্বাচিত ২৫টি খাত ও প্রতিষ্ঠানে উপস্থিতির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণমূলক উদ্যোগ নিয়েছে। দুর্নীতির অভিযোগ জানানোর জন্য সম্প্রতি হটলাইন চালু করেছে।

৭.৩ চ্যালেঞ্জ

দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে বেশ কিছু আইনি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব প্রকাশ সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়– বিদ্যমান আইনে কয়েকটি বিভাগের কর্মচারীদের আওতামুক্ত রাখা হয়েছে। স্বার্থের দ্বন্দ্ব-সংক্রান্ত প্রদত্ত বিবরণ প্রকাশ করতে সরকারি কর্মচারীরা বাধ্য নন। সরকারি কর্মচারীদের জন্য অবসর গ্রহণের পর একই খাতের বেসরকারি কোনো চাকরিতে যোগদানের আগে কত দিন ব্যবধান থাকতে হবে, সে সম্পর্কে কিছু উল্লেখ নেই। নির্বাচিত হয়ে যাওয়ার পর সংসদ সদস্যরা তাদের আর্থিক তথ্য প্রকাশ করতে বাধ্য নন। বাংলাদেশে 'লবিং'-সংক্রান্ত কোনো আইন বা নীতি নেই। গোপন তথ্যের অপব্যবহার প্রতিরোধ করার জন্য আইন ও নীতিমালায় কোনো মানদণ্ডের উল্লেখ নেই। জনস্বার্থ সুরক্ষা-সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে পেশাগত বাধ্যবাধকতা, স্বার্থের দ্বন্দ্ব, তথ্য প্রকাশকারী কোনো সমস্যায় পড়লে তার প্রতিকার, অভিযোগের নিষ্পত্তির জন্য স্বচ্ছ, কার্যকর ও সময়োপযোগী পদ্ধতির উল্লেখ নেই। একক উৎস থেকে ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় ও চুক্তি আইনে সুস্পষ্টভাবে সর্বোচ্চ সীমার উল্লেখ নেই। দরপত্রে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের বেনামি মালিকানার তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই এবং সরকারি ক্রয়ে গোপন আঁতাত বন্ধ করার জন্য কোনো বিধান নেই।

এ ছাড়া দুদকের দুর্নীতিবিরোধী কোনো কৌশলগত পরিকল্পনা নেই। সরকারি কর্মচারীদের সম্পদের বিবরণী সাধারণ জনগণের কাছে সহজলভ্য নয় এবং কতজন কর্মচারী সম্পদের বিবরণী প্রকাশ করেননি, তাদের কোনো পরিসংখ্যান নেই। সরকারি কর্মচারীদের প্রকাশিত সম্পদের বিবরণীর কোনো অনলাইন ডেটাবেজ নেই, যার মাধ্যমে অন্যান্য সংস্থা এ তথ্য যাচাই করতে পারে। সরকারি কর্মচারী ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের স্বার্থ-সংক্রান্ত তথ্য যাচাই করা, সরকারি কর্মচারীদের সম্পদের বিবরণী যাচাই করা, তথ্য প্রকাশকারীদের নিরাপত্তা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য কোনো নির্ধারিত প্রতিষ্ঠান বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি নেই। সব সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য একই রকম তথ্য প্রকাশ পদ্ধতির অনুপস্থিতি রয়েছে। এ ছাড়া তথ্য প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সচেতনতার অভাব লক্ষ করা যায় এবং এ-সংক্রান্ত আইনের বাস্তবায়নও সীমিত।

৮. লক্ষ্য ১৬.৬ : 'সব স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানের বিকাশ'।

এই লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত সূচক হচ্ছে খাতভিত্তিক (বা বাজেট কোড বা অনুরূপ কোনো বিষয়ভিত্তিক) অনুমোদিত মূল বাজেটের তুলনায় প্রাথমিক সরকারি খরচের অনুপাত (সূচক ১৬.৬.১) এবং সরকারি সেবার সর্বশেষ অভিজ্ঞতায় সন্তুষ্ট জনসংখ্যার অনুপাত (সূচক ১৬.৬.২)।

এ গবেষণায় পর্যালোচনার জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান ও খাতগুলো বেছে নেওয়া হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান ও খাতের মধ্যে রয়েছে ১. সংসদ, ২. নির্বাহী বিভাগ (রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদের সদস্য), ৩. বিচার বিভাগ, ৪. স্থানীয় সরকার, ৫. জনপ্রশাসন, ৬. আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, ৭. নির্বাচন কমিশন, ৮. মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি), ৯. দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), ১০. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, ১১. তথ্য কমিশন, ১২. রাজনৈতিক দল, ১৩. গণমাধ্যম, ১৪. নাগরিক সমাজ / এনজিও এবং ১৫. ব্যবসা খাত।

৮.১ প্রস্তুতি

গবেষণার বিশ্লেষণে দেখা যায়, সব জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংবিধান ও আইনে বিস্তারিত দিকনির্দেশনা রয়েছে। একদিকে সংসদ, বিচার বিভাগ, নির্বাহী বিভাগ, নির্বাচন কমিশন, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের ক্ষেত্রে সংবিধানের মাধ্যমে স্বাধীন পদমর্যাদা নিশ্চিত করা হয়েছে, আবার অন্যদিকে দুদক, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও তথ্য কমিশনকে আইনের মাধ্যমে স্বাধীন পদমর্যাদা দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, জনপ্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে সংবিধানে কর্তৃত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে। নাগরিক সমাজ ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে সংশ্লিষ্ট আইনে বৈধতা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের জনবল, সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যক্রম বিস্তারিতভাবে নির্ধারিত রয়েছে সংসদ, নির্বাহী বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, সিএজি, নির্বাচন কমিশন, জনপ্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও দুদকের ক্ষেত্রে। সংসদ (২০১২-২০১৪), মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (২০১৩-১৮), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (২০১৬-২০) এবং তথ্য কমিশন (২০১৫-২১) কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।

অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান ও খাতে সেবার মান উন্নত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে এটুআই প্রকল্প ও গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মাঠপর্যায়ে অটোমেশন সফটওয়্যারের ব্যবস্থা ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ই-ফাইলিং ব্যবস্থার জন্য কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ঢাকা মেট্রোপলিটান পুলিশ কর্তৃক ই-ট্রাফিক পুলিশ পদ্ধতির প্রবর্তন, পুলিশের প্রধান কার্যালয়ে অপরাধ তথ্য ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন, অনলাইন পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট, পুলিশ স্টেশনে 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার' এবং জেলা পর্যায়ে 'ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার' স্থাপন করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ২০১৬-এর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ওয়েবনির্ভর রেজাল্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্যবহার, অনলাইন ভোটার নিবন্ধীকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং জাতীয় পরিচয়পত্র হিসেবে স্মার্ট কার্ড বিতরণ চলমান রয়েছে। সিএজি কার্যালয়ে ডিজিটাল নিরীক্ষা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে অনলাইন জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন চালু করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ই-সেবা হিসেবে নথি, ই-তথ্যকোষ, জাতীয় তথ্য বাতায়ন প্রবর্তন করা হয়েছে। শুদ্ধাচার উৎসাহিত করার জন্য মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ কর্তৃক সততা পুরস্কার নীতি ২০১৭ প্রণয়ন, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে নৈতিকতা কমিটি গঠন এবং শিক্ষার্থীদের জন্য দুদকের 'সততা ইউনিট গঠন' উল্লেখযোগ্য। এসব প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি-সংক্রান্ত বেশ কিছু উদ্যোগ লক্ষ করা যায়।

যেমন সব প্রতিষ্ঠানের জন্য নাগরিক সনদ প্রবর্তন করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে ওয়ার্ড সভা ও উন্মুক্ত বাজেটের প্রবর্তন করা হয়েছে। জেলা ও বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে সাপ্তাহিক গণশুনানির প্রবর্তন করা হয়েছে। দুদকের পক্ষ থেকে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি (দুপ্রক) গঠন করা হয়েছে এবং সেবা খাত নিয়ে গণশুনানির আয়োজন করা হচ্ছে। জেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশন কর্তৃক উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রায় সব প্রতিষ্ঠান তাদের বার্ষিক প্রতিবেদন, বুলেটিন, নিউজলেটার নিয়মিতভাবে প্রকাশ করছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলে গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থাও কার্যকর হয়েছে।

দক্ষতা বৃদ্ধি-সংক্রান্ত উদ্যোগের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে অন্য সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর, ভালো কাজের জন্য জেলা প্রশাসকদের উৎসাহব্যঞ্জক পত্র প্রেরণ এবং 'জনপ্রশাসন পুরস্কার নীতি' প্রণয়ন করা উল্লেখযোগ্য।

৮.২ বাস্তবতা

ওপরে উল্লিখিত বিভিন্ন আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও উদ্যোগ সত্ত্বেও এসব প্রতিষ্ঠান অনেক ক্ষেত্রেই প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর, স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ নয় বলে গবেষণায় দেখা যায়।

সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা দুর্বল। আইন প্রণয়নে সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণ সীমিত বলে লক্ষ করা যায়। স্থায়ী কমিটিগুলোর বেশির ভাগই নিয়ম অনুযায়ী বৈঠক করে না এবং কমিটিগুলোর সক্রিয়তা ও কার্যকারিতার ঘাটতি রয়েছে। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে কাজে লাগিয়ে সংসদে ক্ষমতাসীন দলের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব বিদ্যমান। সংসদে সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদনের ওপর আলোচনা হয় না এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি নিয়েও কোনো আলোচনা হয় না। সংসদ অধিবেশন সরাসরি সম্প্রচার করা হলেও অন্যান্য সংসদীয় কার্যক্রমে প্রবেশাধিকার সীমিত। নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার সময় আর্থিক তথ্য প্রকাশ করলেও নির্বাচিত হওয়ার পর সংসদ সদস্যরা তাদের বার্ষিক আর্থিক তথ্য প্রকাশ করেন না। নির্বাচন ছাড়া জনগণের কাছে সংসদ সদস্যদের দায়বদ্ধ করার কোনো ব্যবস্থা নেই এবং সংসদের বাইরের কার্যক্রমের জন্যও তাদের দায়বদ্ধতা নেই। কোনো কোনো স্থায়ী কমিটির সদস্যের 'স্বার্থের দ্বন্দ্ব' বিদ্যমান।

নির্বাহী বিভাগের ক্ষেত্রে নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্বাধীন। প্রায় সব সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে নির্বাহী বিভাগের প্রভাব লক্ষ করা যায়। সরকারপ্রধান বা মন্ত্রিসভার সদস্যরা তাদের সম্পদের বিবরণী প্রকাশ করেন না। নিরীক্ষা-সংক্রান্ত আপত্তি কদাচিৎ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ আমলে নেয়। এ ছাড়া কর্মী পর্যায়ে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এখনো প্রবর্তিত হয়নি। কোনো কোনো মন্ত্রীর ব্যক্তিগত ব্যবসায় তার নির্বাহী পরিচয় ব্যবহার করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

মামলাজটের কারণে বিচার বিভাগের কার্যকারিতা প্রত্যাশিত পর্যায়ে নেই। ২০১৬ সালের তথ্য অনুযায়ী ওই সময়ে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ছিল ৩১ লাখ ৩৯ হাজার ২৭৫। অধস্তন আদালতে সেবা প্রদানে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যায়।

উচ্চ আদালতের বিচারপতিদের নিয়োগ প্রদান প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার ঘাটতি রয়েছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। বিচারক ও বিচার বিভাগের কর্মীদের সম্পদের বিবরণী প্রকাশ করা হয় না। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে। অধস্তন আদালতের ওপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিতর্ক চলমান।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো সেবা প্রদান, সম্পদ বরাদ্দ, ক্রয় ও বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল। উপজেলা ও জেলা পরিষদ এখনো প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর নয়। স্থানীয় সেবা প্রদানে 'দলকেন্দ্রিক' মেরুকরণ ও দুর্নীতি লক্ষণীয়। ওয়ার্ড সভা ও উন্মুক্ত বাজেট যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয় না। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ওপর সরকার ও সংসদ সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান। রাজনৈতিক পরিচয়ের ভিত্তিতে মেয়রদের বরখাস্ত করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর স্থানীয় সরকার বিভাগের তদারকিও দুর্বল।

জনপ্রশাসনে সেবা প্রদান, সম্পদ বরাদ্দকরণ ও ক্রয়ের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীলতা বিদ্যমান। বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মচারী নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া দক্ষ জনবলের ঘাটতিও রয়েছে। সরকারি কর্মকর্তাদের স্বার্থের দ্বন্দ্ববিষয়ক তথ্য ও সম্পদের বিবরণী প্রকাশ করা হয় না। পদোন্নতি ও পদায়ন-প্রক্রিয়া অস্বচ্ছ বলে অভিযোগ রয়েছে। অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর নয়।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কার্যকারিতাও প্রত্যাশিত পর্যায়ের নয়। গত ১০ বছরে দেশে অপরাধ সংঘটনের হার প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে বলে দেখা যায়। এসব সংস্থার বিরুদ্ধে বিচারবহির্ভূত হত্যা, বিনা বিচারে আটকে রাখা ও গুমের অভিযোগ থাকলেও বিচারবহির্ভূত হত্যা সম্পর্কে পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয় না এবং বিচারবহির্ভূত হত্যা ও নির্যাতন সম্পর্কে তদন্ত ও মামলা করা হয় না। এ ছাড়া ঘুষ, দুর্নীতি ও আইনের অপব্যবহার, দায়িত্বে অবহেলা ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেবা প্রদানে অস্বীকৃতির ঘটনাও অনেক। আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় কর্মরতদের স্বার্থের দ্বন্দ্ববিষয়ক তথ্য ও সম্পদের বিবরণী প্রকাশ করা হয় না।

সর্বশেষ মেয়াদের নির্বাচন কমিশন অবাধ, স্বাধীন ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন সম্পন্ন করতে ব্যর্থ বলে অভিযোগ রয়েছে। জাতীয় ও স্থানীয় প্রায় নির্বাচনে সহিংসতা ও জাল ভোটের ব্যাপকতা ছিল। নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় যাচাই করে না, রাজনৈতিক দলগুলোর আয়-ব্যয়ের তথ্য প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কমিশনের তৎপরতার ঘাটতি রয়েছে এবং নির্বাচনী দায়িত্ব ও নীতিমালা ভঙ্গকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় না। কমিশনারদের নিয়োগ-প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতা বিদ্যমান। সর্বোপরি নির্বাচন কমিশন জনগণের কাছে দায়বদ্ধ নয়।

সক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কারণে মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক সব সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা প্রতিবছর সম্পন্ন করতে পারে না এবং তৃতীয় পক্ষের নিরীক্ষা প্রতিবেদন যাচাই করতে পারে না। মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ে কর্মরতদের স্বার্থের দ্বন্দ্ববিষয়ক তথ্য ও সম্পদের বিবরণী প্রকাশ করা হয় না এবং তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ নিষ্পত্তিতে ঘাটতি লক্ষ করা যায়। সিএজির নিয়োগ-প্রক্রিয়া অস্বচ্ছ বলে অভিযোগ রয়েছে।

দুর্নীতির মামলার দীর্ঘসূত্রতা, মামলা পরিচালনায় দুর্বলতা এবং মামলায় শাস্তির হার খুব কম থাকার ফলে প্রতীয়মান যে দুর্নীতি দমন কমিশন এখনো প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর হতে পারেনি। দুদকের দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম এখনো কার্যকর নয়। দুদকের তদন্ত প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কমিশনারদের নিয়োগ-প্রক্রিয়া অস্বচ্ছ এবং দুদকের কোনো বাহ্যিক দায়বদ্ধতার ব্যবস্থা নেই।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম দৃশ্যমান নয়। এই কমিশনের অনিষ্পন্ন অভিযোগের জট অনেক। অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কমিশনের প্রধান ও কমিশনারদের নিয়োগ দেওয়া হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদনে আয়-ব্যয়ের তথ্য হালনাগাদ নয় এবং বাহ্যিক দায়বদ্ধতা ব্যবস্থার অভাব রয়েছে।

তথ্য কমিশনেও অনিষ্পন্ন অভিযোগের জট বিদ্যমান। অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কমিশনারদের নিয়োগ দেওয়া হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। তথ্য কমিশনের বাহ্যিক দায়বদ্ধতা ব্যবস্থার অভাব রয়েছে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোতে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের ঘাটতি বিদ্যমান, যেখানে দলীয় প্রধানের কাছে আনুগত্যনির্ভর দায়বদ্ধতা লক্ষ করা যায়। রাজনীতিতে এখন পেশিশক্তি ও অর্থের প্রাধান্য বেশি। প্রায় সব দলই রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মের ব্যবহার করে। নির্বাচনে বিজয়ী দল সরকারকে নিজেদের দলের অংশ হিসেবে গণ্য করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। প্রায় সব দলেই তহবিল সংগ্রহ ও ব্যয়ের তথ্যে অস্বচ্ছতা রয়েছে। প্রায় সব দলের বিরুদ্ধে নির্বাচনের নিয়মকানুন না মানার অভিযোগ রয়েছে।

গণমাধ্যমগুলোতে ব্যবসায়ী-রাজনীতিক মালিকানার প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশের গণমাধ্যম দলীয় রাজনৈতিক পরিচয় দ্বারা বিভক্ত। সংবাদ প্রতিবেদনে স্বসেন্সরশিপ আরোপ করা হয়। গণমাধ্যমগুলোতে আয় ও ব্যয়ে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে এবং বেশির ভাগ গণমাধ্যমে ওয়েজ বোর্ড মেনে না চলার প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

নাগরিক সমাজ এবং/অথবা এনজিও খাতও অনেক ক্ষেত্রে দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবান্বিত। বেশির ভাগ এনজিওতে প্রকল্পকেন্দ্রিক কার্যক্রমের প্রাধান্য রয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এনজিও খাত বিদেশি অনুদানের ওপর নির্ভরশীল, এবং অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রয়োজনের তুলনায় দাতার ভাবধারা বা প্রাধান্য অনুযায়ী পরিচালিত বলে অভিযোগ রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তথ্য প্রকাশ মানসম্মত নয়। অনেক ক্ষেত্রে তথ্য প্রকাশের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগে অপারগতা লক্ষ করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে এনজিওগুলোর অভ্যন্তরীণ জবাবদিহি ব্যবস্থা দুর্বল এবং সুবিধাভোগীদের কাছেও জবাবদিহির ঘাটতি রয়েছে। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বাস্তবতা হচ্ছে প্রধান নির্বাহী কর্তৃক নিয়ন্ত্রণের প্রবণতা। এ ছাড়া নাগরিক সমাজের মতপ্রকাশের ক্ষেত্র বর্তমানে সীমিত।

বাংলাদেশের ব্যবসা খাতে সরকার ও অন্যান্য অংশীজনের সাথে অশুভ যোগসাজশ ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে কার্যসম্পাদনের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ব্যবসায়িক সংগঠনগুলোর রাজনৈতিকীকরণের মাধ্যমে সরকারের ওপর প্রভাব বিস্তার করার প্রবণতাও বিদ্যমান। মুনাফা-সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ, আয়কর প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার ঘাটতির অভিযোগ

রয়েছে বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। ব্যবসায় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে শ্রমিক সংগঠন রোধের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এ ছাড়া কাজের পরিবেশ উন্নত করা, শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ও সুবিধা প্রদানের জন্য সরকারি নির্দেশ পালনে ঘাটতি বিদ্যমান।

৮.৩ চ্যালেঞ্জ

আইনে বিদ্যমান ঘাটতির কারণে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বলে চিহ্নিত করা যায়। যেমন জাতীয় সংসদে দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার জন্য সংসদ সদস্যদের ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, যার ফলে তাদের কাছ থেকে গঠনমূলক আলোচনা-সমালোচনা পাওয়া যায় না। নির্বাহী বিভাগের সদস্যদের সম্পদের বিবরণ প্রকাশ করার জন্য কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা নেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইনের অনুপস্থিতি বা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন জনপ্রশাসন আইন নেই এবং পুলিশ আইন যুগোপযোগী নয়। মন্ত্রী, তাদের সমান পদমর্যাদার ব্যক্তিবর্গ ও সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণ বিধিমালা নেই। সিএজির কর্মকর্তাদের জন্য স্বার্থের সংঘাতবিষয়ক বিধিমালা নেই। উচ্চ আদালতের বিচারক, নির্বাচন কমিশন, সিএজির নিয়োগে যথাযথ যোগ্যতা এবং নিয়োগ পদ্ধতির অনুপস্থিতি রয়েছে। দুদক, মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনার / সদস্য বাছাইয়ের মানদণ্ড ও পদ্ধতি সুনির্দিষ্ট নেই। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের কর্তৃত্ব প্রদানের কারণে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথককরণে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। আইন সীমাবদ্ধতার কারণে সংসদ সদস্য, নির্বাচন কমিশন, সিএজি, দুদক, মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনার / সদস্যদের জনগণের কাছে দায়বদ্ধতার ঘাটতি রয়েছে।

দলীয় রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব বিস্তারের ফলে অনেক প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা প্রত্যাশিত পর্যায়ে নেই বলে লক্ষ করা যায়। যেমন সংসদ সদস্যদের উপদেষ্টার ভূমিকা ও প্রশাসনের ক্ষমতার কারণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসন অপর্যাপ্ত। স্থানীয় সরকার পর্যায়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সরকার কর্তৃক বরখাস্ত করার ক্ষমতা বিদ্যমান। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান, যেমন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিচার বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, সিএজি, নির্বাচন কমিশন, দুদক, মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশনকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে। সংসদ, বিচার বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, সিএজি, নির্বাচন কমিশন, দুদক, মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন বাজেট ও প্রশাসনিক জনবলের জন্য সরকারের ওপর নির্ভরশীল। গণমাধ্যম, ব্যবসায়, নাগরিক সমাজ ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ তৈরি করার মাধ্যমে সরকারের হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ বাড়ানো হয়েছে বলে মনে করা হয়। যেমন তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি আইন-২০১৩, বৈদেশিক অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১৬-এর মাধ্যমে যথাক্রমে গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও বিচার বিভাগে নিয়োগ; বিভিন্ন সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্য নিয়োগে দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব প্রচ্ছন্ন।

কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান, যেমন বিচার বিভাগ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, নির্বাচন কমিশন, দুদক, ও সিএজি, মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশনে প্রয়োজনীয় মানবসম্পদের ঘাটতি রয়েছে।

ব্যবসা, গণমাধ্যম, স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে দক্ষতার ঘাটতি এবং বিচার বিভাগ, মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশনে পর্যাপ্ত অবকাঠামোর ঘাটতি রয়েছে। এনজিওগুলোর দাতানির্ভরতা এবং গণমাধ্যমের বিজ্ঞাপননির্ভরতা তাদের আর্থিক সীমাবদ্ধতাকে প্রকাশ করে। ছোট রাজনৈতিক দলগুলোর তহবিল সংগ্রহের সুযোগ সীমিত। এ ছাড়া সংসদ, বিচার ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, নির্বাচন কমিশন, মানবাধিকার কমিশনের বরাদ্দকৃত বাজেট ব্যবহারে সামর্থ্যগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে বাজেট পূর্বানুমানে দুর্বলতা রয়েছে। স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও পরিষেবা প্রদান ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসচেতনতার ঘাটতি বিদ্যমান।

৯. লক্ষ্য ১৬.১০ : 'জাতীয় আইন এবং আন্তর্জাতিক চুক্তির ভিত্তিতে, তথ্যের প্রাপ্তির অবাধ সুযোগ নিশ্চিতকরণ এবং মৌলিক স্বাধীনতা সুরক্ষাকরণ'।

এই লক্ষ্যের জন্য প্রযোজ্য সূচক হচ্ছে গত ১২ মাসে সাংবাদিক, সংশ্লিষ্ট মিডিয়াকর্মী, ট্রেড ইউনিয়নের এবং মানবাধিকারকর্মীদের হত্যা, গুম, বিনা বিচারে আটকে রাখা এবং নির্যাতনের সংখ্যা (সূচক ১৬.১০.১)।

৯.১ প্রস্তুতি

বাংলাদেশের সংবিধানের মাধ্যমে মৌলিক কিছু স্বাধীনতা, যেমন আইনের চোখে সমতা, জীবন ও জীবিকার অধিকার, চিন্তা ও বিবেক এবং বাক্‌স্বাধীনতা, সংঘ ও সভা/ সমাবেশ করার স্বাধীনতা, ধর্মচর্চা, আন্দোলনের স্বাধীনতা এবং সম্পত্তির অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য অধিকার (যেমন তথ্য অধিকার) সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী নিশ্চিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ বিভিন্ন ধরনের অধিকার-সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ঘোষণা ও সনদে স্বাক্ষর বা অনুসমর্থন (আংশিক/ সম্পূর্ণভাবে) করেছে। এর মধ্যে UDHR (মানবাধিকার), ICCPR (নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার), CRC (শিশু অধিকার), CEDAW (নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য বিলোপ), UNCRMW (অভিবাসী কর্মীর অধিকার), ILO Conventions (শ্রমিক অধিকার) উল্লেখযোগ্য।

অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর মাধ্যমে তথ্যে উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে প্রবেশাধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। এই আইনে তথ্যের সংজ্ঞা, আবেদনকারীর চাহিদা অনুযায়ী সাড়া দেওয়ার জন্য কর্মকর্তা নিয়োগ, তথ্য সময়মতো না পেলে আপিল করার ব্যবস্থা, অগ্রহণযোগ্য আবেদনের ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা এবং স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশনার ন্যূনতম মানদণ্ড উল্লেখ করা হয়েছে। এই আইনের অধীনে রাষ্ট্রপতির কাছে দায়বদ্ধ একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন সংস্থা তথ্য কমিশন গঠন করা হয়েছে। এ ছাড়া 'কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১৫-২০২১' প্রণয়ন এবং স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশন নির্দেশিকা-২০১৪ জারি করা হয়েছে।

৯.২ বাস্তবতা

যথাযথ আইনিকাঠামো থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে মৌলিক স্বাধীনতা খর্ব হওয়ার প্রবণতা বিদ্যমান। যেমন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দ্বারা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এখনো চলার অভিযোগ রয়েছে। ২০১৬ সালে ১৯৫ জন, ২০১৫ সালে ১৯২ জন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার

দ্বারা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে। ২০১৬ সালে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মাধ্যমে ৯৭ জন ব্যক্তিকে গুম, অপহরণ ও হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ২০১৬ সালে ১ জন, ২০১৫ সালে ৫ জন সাংবাদিক / ব্লগার হত্যার শিকার হয়েছেন।

তথ্য অধিকারের ক্ষেত্রে দেশের স্কোর এবং রেটিং মাঝামাঝি। ফ্রিডম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড রেটিং (২০১৭) অনুযায়ী বাংলাদেশের স্কোর ১০০-এর মধ্যে ৪৭, যার অর্থ 'আংশিক উন্মুক্ত'। ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্স (২০১৭) অনুযায়ী বাংলাদেশের স্কোর ১০০-এর মধ্যে ৪৮ দশমিক ৩৬ এবং অবস্থান ১৮০টি দেশের মধ্যে ১৪৬তম। গ্লোবাল রাইট টু ইনফরমেশন রেটিং (২০১৬) অনুযায়ী বাংলাদেশের স্কোর ১৫০-এর মধ্যে ১০৭ পয়েন্ট এবং অবস্থান ১১১টি দেশের মধ্যে ২৪তম। বাংলাদেশে তথ্যের আবেদন প্রাপ্তির তুলনায় তথ্য সরবরাহের হার সন্তোষজনক– তথ্য কমিশনের তথ্য অনুযায়ী ২০১৫ সালে ৬ হাজার ১৮১টি আবেদনের মধ্যে ৫ হাজার ৯৪০ জন আবেদনকারীকে (৯৬ শতাংশ) তথ্য সরবরাহ করা হয়। সারা দেশের সব জেলা ও উপজেলায় প্রায় ২১ হাজার তথ্য কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিগুলোতে, বিশেষ করে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন মেনে চলার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৯.৩ চ্যালেঞ্জ

জনগণের মৌলিক স্বাধীনতা লঙ্ঘনের বিভিন্ন ঘটনা সরকারের পক্ষ থেকে অস্বীকার করার প্রবণতা লক্ষণীয়। এসব ঘটনা তদন্তে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অনীহা সরকারের পক্ষ থেকে সদিচ্ছার ঘাটতি হিসেবে প্রতীয়মান এবং তদন্তের ফলাফল প্রকাশে স্বচ্ছতার ঘাটতি দেখা যায়। তথ্য ও মতামত প্রকাশের বিরুদ্ধে কোনো কোনো আইনের কয়েকটি ধারার অপব্যবহার হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। যেমন জনসাধারণের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা বা তাদের পরিবারের সদস্যদের সমালোচনাকারীদের বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি আইন-২০০৬-এর ৫৭ ধারার উদ্বেগজনক অপব্যবহার এবং বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম) নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১৬-এর ১৪ ধারার নিবর্তনমূলক অংশ অভিব্যক্তি এবং বেসরকারি সংস্থার স্বাধীনতাকে সীমিত করেছে। এ ছাড়া 'জাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা ২০১৭' এবং 'বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট আইন', 'ন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং অ্যাক্ট', 'ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট'-এর প্রস্তাবিত খসড়া মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও বাধানিষেধ বাড়াবে বলে আশঙ্কা করা হয়।

১০. সার্বিক পর্যবেক্ষণ

সার্বিকভাবে বলা যায় গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত এসডিজি ১৬-এর লক্ষ্যগুলোর প্রায় সবগুলোর ক্ষেত্রে কিছু কিছু ঘাটতি সত্ত্বেও বাংলাদেশে আইন, নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি যথেষ্ট পরিপুষ্ট। তবে একদিকে কোনো কোনো আইনে দুর্বলতা রয়েছে, আবার অন্যদিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইনের ঘাটতি রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ সীমিত বা চর্চায় ঘাটতি রয়েছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইনের অপব্যবহার লক্ষ করা যায়। দলীয় বিবেচনায় আইনের প্রয়োগ হয় বলে দেখা যায়।

বিভিন্ন উদ্যোগ সত্ত্বেও বাংলাদেশে দুর্নীতি ও ঘুষ, অর্থ পাচার, মৌলিক স্বাধীনতার ব্যত্যয় ও মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত রয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর নয় এবং কার্যকর না হওয়ার পেছনে দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব, কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা, নির্বাহী বিভাগ ও প্রশাসনের আধিপত্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানেই জনগণের কাছে জবাবদিহির কোনো কাঠামো নেই এবং এসব প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ জবাবদিহির ব্যবস্থাও দুর্বল। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ পর্যাপ্ত নয়।

১১. সুপারিশ

গবেষণার পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে টিআইবির পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সুপারিশ নিচে উপস্থাপন করা হলো।

আইনি সংস্কার

১. সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান ও সদস্যদের নিয়োগে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট যোগ্যতার মাপকাঠি নির্ধারণ করতে হবে এবং স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

২. সংবিধানের ৭০ ধারা সংশোধন করে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া সংসদ সদস্যদের নিজ দলের সিদ্ধান্তের বাইরে/ বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার অনুমোদন দিতে হবে।

৩. অধস্তন আদালতের ওপর আইন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণমূলক ধারা বাতিল করতে হবে।

৪. সরকারি কর্মচারীদের স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা, অধিকার ও দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য পাবলিক সার্ভিস আইন প্রণয়ন করতে হবে।

৫. পুলিশকে জনবান্ধব করার জন্য পুলিশ আইন ১৮৬১ সংস্কার, বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪-এর ৫৪ ধারা বাতিল করতে হবে।

৬. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্থানীয় সংসদ সদস্যদের উপদেষ্টা করার বিধান রহিত করতে হবে।

৭. নির্বাচন কমিশনের গঠন, কমিশনারদের নিয়োগ-প্রক্রিয়া ও কার্যক্রম নিয়ে আইন প্রণয়ন করতে হবে।

৮. জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিরুদ্ধে উত্থাপিত মানবাধিকার লঙ্ঘন-সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্ত ও মামলা করার ক্ষমতা দিতে হবে।

৯. তথ্য অধিকার আইনে ব্যবসায়, রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যমকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১০. তথ্যপ্রযুক্তি আইন-২০১৩-এর ৫৭ ধারা বাতিল করতে হবে।

১১. বৈদেশিক অনুদান আইন-২০১৬-এর ১৪ ধারার নিবর্তনমূলক অংশ বাতিল করতে হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়

১২. দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সহায়ক সংস্থাগুলোর জনবলকাঠামো পর্যালোচনা করে প্রয়োজন অনুযায়ী জনবল বাড়ানো, প্রেষণে নিয়োগের পরিবর্তে নিজস্ব কর্মীদের পদায়ন এবং কর্মীদের দক্ষতা ও অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে।

১৩. দুর্নীতি দমনে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী প্রতিষ্ঠানের (দুদক, সিএজি, বিচার বিভাগ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা) জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।

১৪. দুদক, এনবিআর, মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মতো আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর জন্য অর্থ পাচার তদন্ত ও মামলা পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট ইউনিট থাকতে হবে; অর্থ পাচার প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে আন্ডার-ইনভয়েসিং, ওভার-ইনভয়েসিং চিহ্নিত করার জন্য শুল্ক কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতায়িত করতে হবে।

১৫. প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্য ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনা দিতে হবে।

প্রায়োগিক পর্যায়

১৬. জাতীয় শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে জনগণের আস্থা ও সন্তুষ্টি, ঘুষ ও দুর্নীতির অভিজ্ঞতা সম্পর্কে দেশব্যাপী বেজলাইন জরিপ বিবিএসের মাধ্যমে জরুরি ভিত্তিতে সম্পন্ন করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষার স্বার্থে সরকারি ও বেসরকারি বা নাগরিক সমাজ কর্তৃক সংগৃহীত উপাত্তের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে সমন্বয় প্রয়োজন।

১৭. এসডিজি বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনায় এসডিজি ১৬-কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সরকারকে ২০৩০ পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা / মাইলফলক নির্ধারণ করা প্রয়োজন (যেমন ২০৩০ সালের মধ্যে কতটুকু দুর্নীতি ও ঘুষ কমাতে হবে বা সেবা নিয়ে সন্তুষ্ট সেবাগ্রহীতাদের হার কতটুকু বাড়াতে হবে তার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা)।

১৮. দুর্নীতির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রকাশের জন্য দুর্নীতিগ্রস্ত জনপ্রতিনিধি, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী ও অন্যদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ও দৃশ্যমান ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৯. দুর্নীতির মামলার কার্যকর, সময়ানুগ তদন্ত ও নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে হবে।

২০. স্বচ্ছ ক্রয়-প্রক্রিয়া : সব সরকারি প্রতিষ্ঠানের সব ক্রয়ের জন্য ই-প্রকিউরমেন্ট প্রচলন করতে হবে।

২১. সব ধরনের বিচারবহির্ভূত হত্যা, গুম ও পুলিশি হেফাজতে মৃত্যুর তদন্তের জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে।

দুর্নীতি প্রতিরোধে দুর্নীতি দমন কমিশন পরিচালিত গণশুনানি কার্যকারিতা, চ্যালেঞ্জ ও করণীয়*

মো. ওয়াহিদ আলম, মো. রেযাউল করিম ও মো. শহিদুল ইসলাম

১. প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

গণশুনানি একটি বহুপাক্ষিক প্রক্রিয়া, যেখানে সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সামনে সেবাগ্রহীতা বা অংশীজন কর্তৃক সুনির্দিষ্ট সমস্যা উপস্থাপন এবং তা সমাধানকল্পে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্র তৈরি হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহি নিশ্চিত করা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেবার মান উন্নয়ন ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গণশুনানি একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সেবার মান উন্নয়নে গণশুনানির কার্যকারিতা বিবেচনা করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ২০১৪ সালের ডিসেম্বর থেকে বিভিন্ন সেবা খাতের ওপর গণশুনানির আয়োজন শুরু করে।

ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার প্রভাব ও পর্যাপ্ত প্রশাসনিক সংস্কারের অভাবে বাংলাদেশে অদক্ষ, অসংবেদনশীল ও দুর্নীতিগ্রস্ত সেবাপ্রদানের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এ দেশে সরকারি সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে জনগণকে অনাকাঙ্ক্ষিত অর্থ ব্যয় এবং বারবার যাওয়ার পাশাপাশি অতিরিক্ত বিলম্ব ও হয়রানির শিকার হওয়ার উদাহরণ রয়েছে। দুর্নীতির ওপর জাতীয় খানা জরিপ-২০১৫-এর তথ্য অনুযায়ী ৬৭ দশমিক ৮ শতাংশ খানা সরকারি ও বেসরকারি সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে।

অন্যদিকে এ দেশের আইনি ও নীতিকাঠামোতে একটি জবাবদিহিমূলক, সংবেদনশীল ও দুর্নীতিমুক্ত সেবাপ্রদানের ভিত্তি রচনা করা হয়েছে। সংবিধানে [ধারা ৭(১)] জনগণকে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক বলা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে দুর্নীতিমুক্ত সেবাপ্রদান, সরকারি সেবায় সংক্ষুব্ধি নিরসনব্যবস্থা এবং নাগরিক পুনর্নিবেশ (ফিডব্যাক) ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। এ লক্ষ্যে দুদক তার পঞ্চবার্ষিকী কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১৭-২০২১-তে দুর্নীতিমুক্ত সেবাপ্রদান নিশ্চিত করতে গণশুনানি আয়োজনের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। এ ছাড়া সরকারি অফিসে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভিন্ন সেবা খাতে গণশুনানি আয়োজনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে ১ জুন, ২০১৪ একটি অফিস আদেশ জারি করা হয়। পরবর্তী সময়ে দুর্নীতি দমন ও সেবার মান উন্নয়নে দুদক ২০১৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর থেকে টিআইবির সাথে যৌথভাবে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এককভাবে বিভিন্ন সেবা খাত ও প্রতিষ্ঠানের ওপর গণশুনানির আয়োজন শুরু করে। দুর্নীতি প্রতিরোধ, হয়রানি হ্রাস ও সেবার

*২০১৭ সালের ৫ নভেম্বর টিআইবির সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

মান উন্নয়নে এই গণশুনানি কতটা সফল এবং এর বাস্তবায়নে কোনো ধরনের কৌশলগত ঘাটতি আছে কি না, তা মূল্যায়নের দাবি রাখে। অধিকন্তু আয়োজিত গণশুনানিগুলোর ওপর এখন পর্যন্ত কোনো গবেষণা বা মূল্যায়ন করা হয়নি। এ প্রেক্ষাপটে দুদক পরিচালিত গণশুনানির কার্যকারিতা ও চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণে টিআইবি এই গবেষণা হাতে নিয়েছে।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো সেবা খাতে দুর্নীতি প্রতিরোধে দুদক পরিচালিত গণশুনানির ভূমিকা পর্যালোচনা করা। এই গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো

- দুর্নীতি ও অনিয়ম-সংক্রান্ত সংক্ষোভ নিরসনে গণশুনানির কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করা।
- অভিযোগ-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোয় গণশুনানির প্রভাব তুলে ধরা।
- গণশুনানি কার্যক্রম আয়োজন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা।
- গণশুনানির কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে সুপারিশ প্রণয়ন করা।

৩. গবেষণার পরিধি

২০১৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দুদক মোট ৩৫টি গণশুনানির আয়োজন করে; যার মধ্যে ২০১৪ সালে একটি, ২০১৫ সালে ৫টি এবং ২০১৬ সালে ২৯টি গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। গণশুনানি অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ছয় মাস অতিবাহিত হয়েছে– এমন গণশুনানি গবেষণার জন্য বিবেচনা করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে ডিসেম্বর ২০১৪ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত মোট ১৭টি গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। তবে এর মধ্যে ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা, নড়াইল সদর, রাজশাহীর চারঘাট, পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়ায়–এ চারটি স্থানে অনুষ্ঠিত শুনানির অভিযোগকারী সংক্রান্ত পর্যাপ্ত তথ্য, যেমন– নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর ইত্যাদি না থাকায় জরিপভুক্ত করা যায়নি। এমতাবস্থায়, চূড়ান্তভাবে গবেষণার উপযোগী গণশুনানির সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩টি।

৪. গবেষণাপদ্ধতি

মিশ্র পদ্ধতি অনুসরণে এ গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে। গবেষণার ক্ষেত্রে গুণগত ও পরিমাণগত উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। পরিমাণগত পদ্ধতির অংশ হিসেবে অভিযোগকারী ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওপর দুটি পৃথক জরিপ পরিচালনা করা হয়। অভিযোগকারীদের জরিপে ১৩টি গণশুনানিতে লক্ষিত ২৯৯ জন অভিযোগ উত্থাপনকারীর মধ্যে ১৯৫ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের জরিপের ক্ষেত্রে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ৫৯টি প্রতিষ্ঠানের মধ্য থেকে ৫১টি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। উভয় জরিপের ক্ষেত্রে ভুল ঠিকানা, ফোন নম্বর না থাকা এবং কর্মকর্তাদের না পাওয়ার কারণে লক্ষিত সব তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন আধা কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয়।

গুণগত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ও কেস স্টাডিসহ কিছু গুণগত পদ্ধতির টুলস ব্যবহার করা হয়েছে। মুখ্য তথ্যদাতা হিসেবে গণশুনানির আয়োজন ও বাস্তবায়নে জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা হলেন- জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, উপজেলা

নির্বাহী কর্মকর্তা, দুদকের কমিশনার ও কর্মকর্তারা (ঢাকা ও মাঠপর্যায়ের), জেলা ও উপজেলার 'দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি' (দুপ্রক) প্রতিনিধি, সচেতন নাগরিক কমিটির (সনাক) প্রতিনিধি এবং অর্থায়নকারী সংস্থার প্রতিনিধিরা (বিশ্বব্যাংক)। মুখ্য তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়েছে।

পরোক্ষ তথ্যের উৎসগুলো হলো– প্রাসঙ্গিক বই, প্রবন্ধ, গবেষণা ও প্রকাশিত প্রতিবেদন, নথি, গণশুনানির কার্যবিবরণী ইত্যাদি।

৫. একনজরে দুদক আয়োজিত গণশুনানি

দুদক দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সেবার মান উন্নয়নে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সেবা খাতের ওপর গণশুনানির আয়োজন করে। এসব গণশুনানিতে যেসব স্থানীয় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা সম্পর্কে অভিযোগ উঠেছে, সেগুলো হলো উপজেলা ভূমি অফিস, সাবরেজিস্ট্রি অফিস, সেটেলমেন্ট অফিস, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ইত্যাদি। ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় যেসব সেবার ওপর গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে সেগুলো হলো, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ) ও পাসপোর্ট।

৬. গণশুনানির কার্যকারিতা

৬.১ অভিযোগ জমাদান ও উত্থাপনের ধরন

১৩টি গণশুনানিতে লক্ষিত মোট ২৯৯ জন অভিযোগকারীর মধ্যে ৬৫ দশমিক ২ শতাংশ (১৯৫ জন) অভিযোগকারীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, যাদের মধ্যে ৬৬ শতাংশ গণশুনানি অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে পূর্বনির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপিত অভিযোগ বক্সে অভিযোগ জমা দেন আর অবশিষ্ট ৩৪ শতাংশ অভিযোগকারী গণশুনানি অনুষ্ঠানের দিন অভিযোগ জমা দেন। জরিপকৃত অভিযোগকারীদের মধ্যে ৯৬ শতাংশ অভিযোগকারী অভিযোগ উত্থাপন করার সুযোগ পান, যাদের মধ্যে ৮৬ শতাংশ পুরোপুরি অভিযোগ উত্থাপন করতে পেরেছেন এবং বাকি ১৪ শতাংশ অভিযোগকারী আংশিকভাবে তাদের অভিযোগ উত্থাপনের সুযোগ পান। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, অভিযোগকারীদের মধ্যে ৯৪ শতাংশ অভিযোগকারী কোনো ধরনের ভয়ভীতি ছাড়া অভিযোগ উত্থাপন করতে পেরেছেন। বাকি (৬ শতাংশ) অভিযোগকারীরা নির্ভয়ে অভিযোগ উত্থাপন করতে পারেননি বলে মতামত দিয়েছেন। নির্ভয়ে অভিযোগ উত্থাপন করতে না পারার প্রধান কারণগুলো হলো– কর্তৃপক্ষের ভয়, পরবর্তী সময়ে সেবা না পাওয়ার আশঙ্কা, হয়রানির শিকার হওয়ার ভয়, রাজনৈতিক বা প্রভাবশালীদের বাধা ও চাপ।

৬.২ যেসব প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা গেছে, অধিকাংশ অভিযোগ ভূমি অফিস ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের (৬৭ শতাংশ) বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়েছে। ভূমি অফিস-সংক্রান্ত অভিযোগগুলোর মধ্যে উপজেলা ভূমি অফিসের বিরুদ্ধে ২৯ শতাংশ। অন্য যেসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বিরুদ্ধে ১৩ শতাংশ, রাজউক ১২ শতাংশ এবং স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান ১০ শতাংশ উল্লেখযোগ্য।

৬.৩ অভিযোগের ধরন

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ঘুষ গ্রহণ, হয়রানি, দায়িত্বে অবহেলা, খারাপ আচরণ ও প্রতারণাবিষয়ক অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। ভূমি খাতের ক্ষেত্রে প্রতারণার মাধ্যমে ভূমি আত্মসাৎ, ভূমি দখল, সঠিক মালিকানাস্বত্ব ছাড়া ভূমি দখল, পেশিশক্তি ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতে ডাক্তারদের অবহেলা, ওষুধের অপ্রাপ্যতা, হাসপাতালে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে ঘুষ প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে অভিযোগ উঠতে দেখা গেছে। এ ছাড়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ক্ষেত্রে বাসাবাড়িতে বিদ্যুৎ-সংযোগ দিতে বিলম্ব হওয়া ও সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে ঘুষ প্রদানের অভিযোগ উঠেছে। রাজউকের সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে অবৈধ উপায়ে প্লট দখল ও রাজউক কর্তৃক বরাদ্দকৃত প্লট না পাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। বিআরটিএর ক্ষেত্রে অভিযোগকারীদের ঘুষ-সংক্রান্ত অভিযোগ উত্থাপিত হতে দেখা গেছে।

৬.৪ গণশুনানি চলাকালে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রদত্ত সমাধানের চিত্র

গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী দুই-তৃতীয়াংশেরও অধিক অভিযোগকারী (৭৮ শতাংশ) গণশুনানি চলাকালে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সমাধানের প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন। সমাধানের প্রতিশ্রুতি হিসেবে যেসব পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো গণশুনানির পরে সমস্যা সমাধান করে দেওয়া (৬৯ শতাংশ), অভিযোগ খতিয়ে দেখা (১৯ শতাংশ), সুনির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া (১৫ শতাংশ), শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ (২ শতাংশ) ও সামাজিকভাবে সমাধানের নির্দেশ (১ শতাংশ)।[২২] অভিযোগকারীদের মধ্যে ২২ শতাংশ অভিযোগকারী গণশুনানি চলাকালে সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে সমাধানের কোনো প্রতিশ্রুতি পাননি। অভিযোগকারীদের মতামত অনুযায়ী সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি না পাওয়ার কারণগুলো হলো, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অভিযোগকে গুরুত্ব না দেওয়া (৫১ শতাংশ), কর্তৃপক্ষের অবহেলা (৯ শতাংশ) এবং অভিযোগটি কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারের বাইরে (১১ শতাংশ) অন্যতম।

৬.৫ গণশুনানি পরবর্তী সময়ে অভিযোগের সমাধানের চিত্র

গবেষণায় অভিযোগের সমাধানের পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষের সাড়া প্রদান সম্পর্কে একটি ইতিবাচক চিত্র দেখা যায়। অভিযোগকারীদের মতামত অনুযায়ী, ৭৮ শতাংশ অভিযোগকারী গণশুনানি চলাকালে অভিযোগ সমাধানের প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন। পরে এদের ২৭ শতাংশ অভিযোগকারী চূড়ান্তভাবে অভিযোগের সমাধান পেয়েছেন। বাকি দুই-তৃতীয়াংশের অধিক অভিযোগকারী (৭৩ শতাংশ) জরিপকালে উত্থাপিত অভিযোগের কোনো সমাধান পাননি। তবে এদের মধ্যে ১৪ শতাংশ অভিযোগকারী জানান, তাদের সমস্যার সমাধান প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় আছে। গবেষণায় দেখা গেছে, বিআরটিএ, ইউনিয়ন ভূমি অফিস, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের সমাধান হওয়ার সংখ্যা বেশি। তবে উপজেলা ভূমি অফিস, সেটেলমেন্ট অফিস, সাবরেজিস্ট্রি অফিস ও রাজউক উল্লেখযোগ্যসংখ্যক অভিযোগ সমাধান করতে পারেনি। এর সম্ভাব্য কারণ হতে পারে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজের ধারা অপেক্ষাকৃত জটিল ও কতিপয় আইন ও নির্ধারিত কার্যপদ্ধতির মাধ্যমে কর্মসম্পাদন করতে হয়।

[২২] এ ক্ষেত্রে একাধিক উত্তর গ্রহণীয় বিধায় মোট শতকরা হার ১০০-এর অধিক হবে।

৬.৬ উত্থাপিত অভিযোগের সমাধান না হওয়ার কারণ

অভিযোগকারীদের মতামত অনুযায়ী যে ৭৩ শতাংশ অভিযোগের সমাধান হয়নি তার অন্যতম কারণগুলো হলো, কর্তৃপক্ষের অসহযোগিতা (৬৯ শতাংশ), নিয়মবহির্ভূত অর্থ দাবি (২৭ শতাংশ), উদ্যোগের অভাব (২৪ শতাংশ)।[২৩] এই পরিপ্রেক্ষিতে কোনো কোনো তথ্যদাতা জানান, দুদক ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পরিবীক্ষণ ও ফলোআপ কার্যক্রমের অভাবে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক অভিযোগের যথাযথ সমাধান হচ্ছে না।

৬.৭ গণশুনানির পর পুনরায় সেবা নিতে গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হওয়া

অভিযোগকারীদের মতামত অনুযায়ী ৭৮ শতাংশ অভিযোগকারী পুনরায় সেবা নিতে যান, যাদের মধ্যে ৪৩ শতাংশ অভিযোগকারী গণশুনানি পরবর্তীকালে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সেবা নিতে গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। অভিযোগকারীরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, কর্তৃপক্ষের সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী না হওয়া (৭০ শতাংশ), কর্তৃপক্ষের অসহযোগিতামূলক আচরণ (৬০ শতাংশ), আগের চেয়ে খারাপ আচরণের মুখোমুখি হওয়া (৪২ শতাংশ), কাজ আটকে দেওয়া (১৮ শতাংশ), বিধিবহির্ভূত অর্থ আদায় (১২ শতাংশ), কর্তৃপক্ষের নাখোশ হওয়া (৮ শতাংশ), মোবাইল ফোনে ও পুলিশকে দিয়ে হুমকি প্রদান (৫ শতাংশ)।[২৪] অভিযোগকারীদের মধ্যে যারা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, তাদের মধ্যে ৭৫ শতাংশ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অন্য কর্মকর্তার কাছ থেকে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন। এ ছাড়া যার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে, তার কাছ থেকে (৪০ শতাংশ), দালাল (৫ শতাংশ) ও প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার কাছ থেকেও (৩ শতাংশ) অভিযোগকারীরা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন।

৬.৮ গণশুনানি-পরবর্তী সেবার মান উন্নয়নে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ

কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী সেবার মান উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোতে বেশ কিছু ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তবে প্রতিষ্ঠানগুলোতে আগের তুলনায় গণশুনানি-পরবর্তী এসব উদ্যোগের হার অপেক্ষাকৃত বেশি লক্ষ করা গেছে। প্রায় সব প্রতিষ্ঠানে জনসেবায় স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও সংবেদনশীলতা বৃদ্ধিতে ইতিবাচক উদ্যোগ লক্ষ করা গেছে। অভিযোগ-সংশ্লিষ্ট ৭৭ শতাংশ প্রতিষ্ঠানে গণশুনানি-পরবর্তী তথ্যবোর্ড দেখা যায়, যেখানে গণশুনানির আগে এই হার ছিল ৫৪ শতাংশ। এ ছাড়া নথি/ফাইল সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতি, মোবাইলে অভিযোগ গ্রহণ, প্রতি সপ্তাহে সেবাবিষয়ক গণশুনানি অনুষ্ঠান, সচেতনতামূলক পোস্টার/লিফলেট বিতরণ, অভিযোগ বক্স স্থাপন, দিকনির্দেশনা চিহ্ন ব্যবহার, ফ্রন্টডেস্কে দায়িত্বরত লোকের উপস্থিতি, সিসিটিভির মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ ও ওয়াই-ফাইয়ের ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গণশুনানির আগের চেয়ে পরবর্তী সময়ে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে।

---

[২৩] এ ক্ষেত্রে একাধিক উত্তর গ্রহণীয় বিধায় মোট শতকরা হার ১০০-এর অধিক হবে।

[২৪] এ ক্ষেত্রে একাধিক উত্তর গ্রহণীয় বিধায় মোট শতকরা হার ১০০-এর অধিক হবে।

চিত্র-১ : গণশুনানির আগে ও পরে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত ইতিবাচক পদক্ষেপ

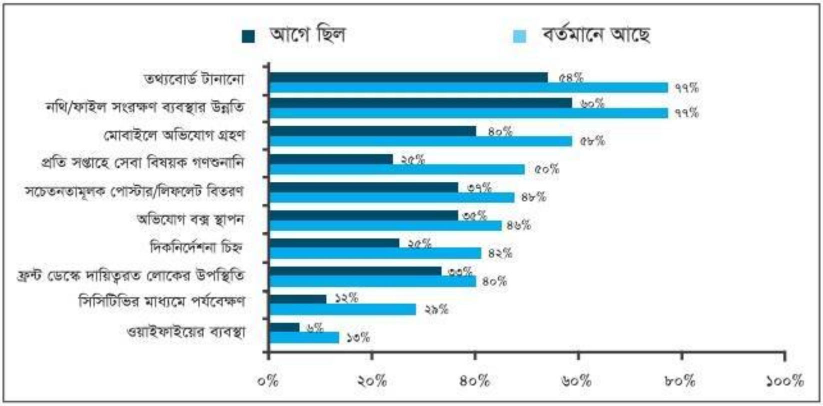

৬.৯ গণশুনানির ইতিবাচক দিক

সব অভিযোগকারী গণশুনানি কার্যক্রমকে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতা বৃদ্ধিতে ইতিবাচক হিসেবে দেখেছেন। যেসব কারণে গণশুনানি তাদের কাছে ভালো লেগেছে তার মধ্যে অন্যতম হলো, সেবাগ্রহীতাদের সামনে সেবাপ্রদানকারীকে জাবাবদিহি করার ব্যবস্থা (৭৫ শতাংশ), দুর্নীতির অভিযোগ কর্মকর্তাদের সামনে বলার সুযোগ (৬৯ শতাংশ), অভিযোগ সমাধানের প্রতিশ্রুতি আদায় (২০ শতাংশ) ।[২৫]

৬.১০ গণশুনানি আয়োজনের ব্যবস্থা সম্পর্কে অভিযোগকারীদের মতামত

গণশুনানি আয়োজনের ব্যবস্থা সম্পর্কে অভিযোগকারীরা সন্তোষজনক মতামত দিয়েছেন। গণশুনানির আয়োজকেরা গণশুনানির প্রচারণার জন্য বিভিন্ন ধরনের মাধ্যম ব্যবহার করেছেন। গণশুনানিতে উপস্থিত অভিযোগকারীদের মতামত অনুযায়ী বন্ধু/প্রতিবেশী (২৯ শতাংশ) ও মাইকিংয়ের (২৯ শতাংশ) মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি মানুষ গণশুনানি সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। এ ছাড়া লিফলেট-পোস্টার (২৩ শতাংশ) ও দুদকের কর্মকর্তা ও দুপ্রক প্রতিনিধিদের (২২ শতাংশ) মাধ্যমেও অনেকে গণশুনানির আয়োজন সম্পর্কে জানতে পেরেছেন।

আয়োজনস্থলে বসার ব্যবস্থা সম্পর্কে ৯৫ দশমিক ৮ শতাংশ অংশগ্রহণকারী সন্তোষজনক মতামত দিয়েছেন। তাদের মতে, আয়োজনস্থল বসার জন্য আরামদায়ক ও সন্তোষজনক ছিল। এ ছাড়া সাউন্ড-সিস্টেমের গুণগত মান সম্পর্কে ৯৭ দশমিক ৪ শতাংশ, আয়োজনস্থলের অবস্থান ও এর যাতায়াত উপযোগিতা সম্পর্কে ৯৭ দশমিক ৪ শতাংশ এবং অনুষ্ঠান শুরু সম্পর্কে ৯৪ দশমিক ২ শতাংশ অংশগ্রহণকারী সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

---

[২৫] এ ক্ষেত্রে একাধিক উত্তর গ্রহণীয় বিধায় মোট শতকরা হার ১০০-এর অধিক হবে।

৭. গণশুনানির চ্যালেঞ্জ

গবেষণায় দেখা গেছে, গণশুনানিতে তিনটি পর্যায়ে চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। গণশুনানির আয়োজন, গণশুনানি চলাকালে ও গণশুনানির পরবর্তীকালে আয়োজন কর্তৃপক্ষসহ অন্যান্য অংশীজনকে নানামুখী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছে। নিচে এসব চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করা হলো :

৭.১ গণশুনানির আয়োজন পর্যায়ে চ্যালেঞ্জ

গণশুনানি সম্পর্কে সচেতনতার অভাব : গণশুনানি কী, কেন করা হয় এবং এতে কী উপকার হবে সে সম্পর্কে সাধারণ মানুষ সচেতন নন। ফলে অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও অভিযোগকারীদের গণশুনানিতে অভিযোগ উত্থাপন ও অংশগ্রহণ করতে দেখা যায় না।

সেবা সম্পর্কে ধারণার অভাব : সেবাগ্রহীতাদের অনেকে জানেন না, কোন সেবা কীভাবে পাওয়া যায়, কে কোন কাজের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং কার এখতিয়ার কতটুকু। এর ফলে অভিযোগকারীদের অনেকে এক অফিসের অভিযোগ অন্য অফিসের বিরুদ্ধে উত্থাপন করেন। তা ছাড়া কিছু অভিযোগকারী আদালতে বিচারাধীন বিষয়েও অভিযোগ উত্থাপন করেছেন।

পর্যাপ্ত প্রচারণার অভাব : সাধারণত উপজেলা বা জেলা সদরকে কেন্দ্র করে গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয় এবং গণশুনানির প্রচারণাও উপজেলা ও জেলা সদরের আশপাশে সীমাবদ্ধ থাকে। ফলে প্রান্তিক এলাকার জনগণ গণশুনানি সম্পর্কে অবহিত হওয়া থেকে বঞ্চিত হন।

প্রান্তিক অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর কম অংশগ্রহণ : গণশুনানির আয়োজনস্থল উপজেলা কিংবা জেলা সদরে হওয়ায় প্রান্তিক অঞ্চলের জনসাধারণের গণশুনানিতে আসার সুযোগ কম থাকে।

অভিযোগ জমা দিতে দ্বিধা : অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ জেলা প্রশাসক বা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় ও অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কার্যালয়ে স্থাপিত অভিযোগ বাক্সে অভিযোগ জমা দিতে দ্বিধাবোধ করেন।

অভিযোগ উত্থাপনে বাধা : কিছু স্থানে অভিযোগ উত্থাপন না করতে দালাল, রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিসহ কর্তৃপক্ষের একাংশের পক্ষ থেকে ভয় দেখানোর অভিযোগ রয়েছে।

সরকারি কর্মকর্তাদের একাংশের অনাগ্রহ ও অনুপস্থিতি : অভিযোগ-সংশ্লিষ্ট কিছু সরকারি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের একাংশের বিভিন্ন অজুহাতে (যেমন অন্য কাজে ব্যস্ততা) গণশুনানিতে অংশগ্রহণে অনাগ্রহ এবং অনুপস্থিতি লক্ষ করা গেছে।

দুদকের জনবল, লজিস্টিকস ও অর্থবরাদ্দের ঘাটতি : গণশুনানির জন্য দুদকের জনবল, লজিস্টিকস ও অর্থবরাদ্দের ঘাটতি রয়েছে। তা ছাড়া সব জেলায় দুদকের কার্যালয় না থাকায়, অনেক ক্ষেত্রে ঢাকা কিংবা বিভাগীয় কার্যালয় থেকে গণশুনানির কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়েছে।

সব অফিসকে আমন্ত্রণ না জানানো : যেসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে বেশি পরিমাণে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে এমন বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানকে, যেমন পুলিশ, কর বিভাগ ইত্যাদি গণশুনানিতে আমন্ত্রণ জানাতে দেখা যায়নি।

৭.২ গণশুনানি চলাকালীন চ্যালেঞ্জ

বিলম্বে অনুষ্ঠান শুরু হওয়া : ক্ষেত্রবিশেষে অতিথিদের জন্য অপেক্ষা করা ও তাদের প্রটোকল দেওয়াসহ বিভিন্ন কারণে দেরিতে অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার উদাহরণ রয়েছে।

অতিথিদের দীর্ঘ বক্তৃতা : ক্ষেত্রবিশেষে অতিথিদের দীর্ঘ বক্তৃতায় গণশুনানির উল্লেখযোগ্য সময় ব্যয় হওয়ার উদাহরণ রয়েছে।

৭.৩ গণশুনানি-পরবর্তী চ্যালেঞ্জ

বদলি ও অবসরজনিত সমস্যা : অভিযোগ-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের একাংশের গণশুনানির পর বদলি ও অবসরে যাওয়ায় অভিযোগ ক্ষেত্রবিশেষে চাপা পড়ে যায়।

প্রতিশ্রুতির ফলোআপ না হওয়া : গণশুনানিতে উপস্থিত কর্মকর্তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না, তা ধারাবাহিকভাবে ফলোআপে ঘাটতি রয়েছে।

কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারের বাইরে : কিছু ক্ষেত্রে অভিযোগকারীরা এমন অভিযোগ উত্থাপন করেন, যা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারের বাইরে। বিশেষত ভূমি-সংক্রান্ত অভিযোগগুলোর ক্ষেত্রে এমন চিত্র দেখা যায়। ফলে এসব অভিযোগের সমাধান করা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে।

৮. সার্বিক পর্যবেক্ষণ

সার্বিকভাবে বলা যায়, গণশুনানির মাধ্যমে সেবাপ্রদানকারী ও সেবাগ্রহণকারীদের মুখোমুখি করার মাধ্যমে জনসাধারণকে ক্ষমতায়িত করার সুযোগ সৃষ্টি এবং একই সাথে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। এ ছাড়া গণশুনানিতে উত্থাপিত অভিযোগ সমাধানকল্পে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি মোতাবেক পদক্ষেপ গ্রহণের হার উল্লেখযোগ্য। তবে অধিকাংশ অভিযোগকারী গবেষণার তথ্য সংগ্রহকালীন সময় পর্যন্ত সমাধান পাননি। অনেক ক্ষেত্রে পুনরায় সেবা নিতে গিয়ে তারা অনিয়মের শিকার হয়েছেন। শুনানির পরবর্তী সময়ে অভিযোগকারীদের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক সমাধান দেওয়া হচ্ছে কি না, তার ফলোআপে ঘাটতি থাকায় গণশুনানির সাফল্যের ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। শুনানির পর প্রায় সব প্রতিষ্ঠান সেবার মান উন্নয়নে ইতিবাচক প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করা সত্ত্বেও কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একাংশের মধ্যে সেবাপ্রদানে পেশাদারত্বের ঘাটতি লক্ষণীয়। গণশুনানি আয়োজনে দুদক ও আয়োজক প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার, যেমন জনবল, লজিস্টিকস ও অর্থবরাদ্দের ঘাটতি রয়েছে।

৯. সুপারিশ

গবেষণার পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে টিআইবির পক্ষ থেকে গণশুনানিকে আরো কার্যকর করার লক্ষ্যে কতিপয় সুপারিশ প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত সুপারিশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুপারিশ নিচে উপস্থাপন করা হলো :

১. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অবসর, বদলি বা অন্য কোনো কারণে যাতে অভিযোগের সমাধান বাধাগ্রস্ত না হয়, সে লক্ষ্যে প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ।

২. গণশুনানি আয়োজনের জন্য দুদকসহ স্থানীয় প্রশাসনের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দেওয়া।

৩. প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে। এ প্রচারণায় স্থানীয় এনজিও ও সংগঠনকে সম্পৃক্ত করা।

৪. বক্তৃতায় বেশি সময় ব্যয় না করা এবং সময়মতো গণশুনানি শুরু করা।

৫. অভিযোগকারীরা যাতে নির্ভয়ে অভিযোগ উত্থাপন করতে পারেন এবং গণশুনানির পর যাতে কোনো হয়রানি ও নিরাপত্তাহীনতার ঝুঁকিতে না পড়েন সে লক্ষ্যে দুদক ও স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬. যেসব খাত ও প্রতিষ্ঠানের ওপর অভিযোগের আধিক্য রয়েছে, সেসব খাত ও প্রতিষ্ঠানের ওপর পৃথক পৃথক গণশুনানির আয়োজন করা।

৭. গণশুনানিতে অভিযোগ-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা।

৮. শুনানিতে উত্থাপিত অভিযোগ প্রতিশ্রুত সময়ের মধ্যে সমাধান নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও দুদকের পক্ষ থেকে ফলোআপ তথা পরিবীক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ।

শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসন : সমস্যা ও উত্তরণের উপায়*

মনজুর-ই-খোদা ও শাহজাদা এম আকরাম

১. প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শ্রম অভিবাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। দেশের ভেতরে কর্মসংস্থানের চাপ কমানো, বৈদেশিক মুদ্রার জোগান ও মজুত বাড়ানোর ক্ষেত্রে বৈদেশিক কর্মসংস্থান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ ছাড়া জাতীয় উন্নয়নে ফেরত আসা অভিবাসীদের বিনিয়োগ ও কারিগরি দক্ষতার কারণে অর্থনীতিতে তাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশে রেমিট্যান্স এসেছিল ১ হাজার ৪৯৩ কোটি ডলার এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৫৩১ কোটি ডলার। প্রবাসী আয় প্রবাহের পরিমাণ বাংলাদেশে অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রার আয় প্রবাহ যথা আনুষ্ঠানিক উন্নয়ন-সহায়তা (Official Development Assistance) এবং নিট রপ্তানি আয়কে (Net Earning from Export) অতিক্রম করেছে। ২০১৫ সালে অভিবাসীদের পাঠানো অর্থ বাংলাদেশের জিডিপির প্রায় ৭ দশমিক ৮৩ শতাংশ।

বাংলাদেশ থেকে শ্রমের অভিবাসন খাতে সেবা প্রদান, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করার জন্য ১৯৭৬ সালে তৎকালীন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণলয়ের অধীনে 'জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)' প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং ১৯৮২ সালে 'বহির্গমন আদেশ, ১৯৮২' প্রণয়ন করা হয়। শ্রম অভিবাসন খাতের উন্নয়নে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গঠন করা হয় ২০০১ সালে। পরবর্তী সময়ে আরও বেশ কয়েকটি আইন ও বিধি প্রণীত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ২০০৬ সালে 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি' প্রণয়ন এবং ২০১৩ সালে 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩' প্রণয়ন। এ ছাড়া বাংলাদেশ ১০টি আন্তর্জাতিক কনভেনশনে স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করেছে, যার মধ্যে জাতিসংঘের 'অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের অধিকার সংরক্ষণ কনভেনশন, ১৯৯০' সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ খাতকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য পরবর্তী সময়ে ধারাবাহিকভাবে আরও উদ্যোগ নেওয়া হয়, যার মধ্যে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬ প্রবর্তন, ১৯৮২ সালের আদেশ রহিত করে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন-২০১৩ প্রণয়ন এবং ২০১১ সালের এপ্রিলে প্রবাসীকল্যাণ ব্যাংক স্থাপন।

বাংলাদেশ থেকে শ্রমের অভিবাসন-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, আইনি কাঠামো ও অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসনের ওপর বিস্তারিত গবেষণার ঘাটতি রয়েছে। এ-সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী শ্রম অভিবাসন খাতে অভিবাসন-পূর্ব ও অভিবাসন-পরবর্তী বিভিন্ন সমস্যা বিদ্যমান এবং এ খাতে এখনো স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা যায়নি (রামরু, ২০১৬)। বাংলাদেশের শ্রম অভিবাসন-সংক্রান্ত আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিদ্যমান থাকলেও বিভিন্ন গবেষণা ও সংবাদ

*২০১৭ সালের ৯ মার্চ টিআইবির সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

মাধ্যমে হয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন গবেষণায় শ্রম অভিবাসন খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ, প্রকাশিত প্রতিবেদনে শ্রম অভিবাসন খাতে বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত ও উদঘাটন করা হয়েছে এবং শ্রম অভিবাসন খাতে সুশাসনের অপর্যাপ্ততা ঝুঁকিপূর্ণ অনিয়মিত অভিবাসন ও মানব পাচারকে উৎসাহিত করে বলে মতামত দেওয়া হয়েছে (পারভেজ ও অন্যান্য, ২০১৬; ইকোনমিক ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, ২০১৬; রশিদ ও আশরাফ, ২০১৫; আইওএম, ২০১৫; ম্যাকিনসলে গ্লোবাল ইনস্টিটটিউট, ২০১৬)।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

শ্রম অভিবাসন খাতে বিপুলসংখ্যক ব্যক্তির কর্মসংস্থান, রেমিট্যান্সের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি বিবেচনায় এই বর্তমান গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে, যেখানে শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা হয়েছে। এই গবেষণার উদ্দেশ্য বাংলাদেশের শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা ও এসব চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের উপায় চিহ্নিত করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে :

- বাংলাদেশের শ্রম অভিবাসন-সংক্রান্ত আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পর্যালোচনা করা;
- শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা, তাদের মধ্যকার সমন্বয়, ব্যবস্থাপনা ও জবাবদিহির ক্ষেত্র চিহ্নিত করা;
- শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন ও কারণ চিহ্নিত করা এবং
- শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসন ও কার্যকর জবাবদিহির পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সুপারিশ প্রস্তাব করা।

এই গবেষণায় আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে দেশের বাইরে কাজ নিয়ে যাওয়ার বা আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসনের প্রক্রিয়া; আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসন-সংক্রান্ত সুশাসন কাঠামো পর্যালোচনা এবং আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় ভ্যালু চেইন, এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান দুর্নীতি ও অনিয়ম এবং এসব অনিয়মের কারণ অনুসন্ধান আওতা হিসেবে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বর্তমান গবেষণা মূলত গুণবাচক তথ্য বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা। গবেষণার পদ্ধতি হিসেবে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, নিবিড় সাক্ষাৎকার এবং দলগত আলোচনা ব্যবহার করা হয়েছে। এ ছাড়া শ্রম অভিবাসন-সংশ্লিষ্ট নীতিমালা, আইন ও বিধি, প্রকাশিত-অপ্রকাশিত গবেষণা, প্রবন্ধ, সরকারি-বেসরকারি তথ্য ও দলিল এবং সংবাদপত্র ও অন্যান্য গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ পর্যালোচনা করা হয়েছে। ২০১৬ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ গবেষণার খসড়া ফলাফল প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সাথে উপস্থাপন করা হয় এবং তাদের মতামতের ওপর ভিত্তি করে তথ্য-উপাত্ত হালনাগাদ ও যাচাই করা হয়। বর্তমান গবেষণা জরিপনির্ভর নয় বলে প্রাপ্ত ফলাফল সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয় বা সাধারণীকরণ সম্ভব নয়, তবে এ খাতে বিদ্যমান পরিস্থিতির একটি দিকনির্দেশনামূলক চিত্র উপস্থাপন করে।

৩. শ্রম অভিবাসন ব্যবস্থাপনা কাঠামো

বাংলাদেশের শ্রম অভিবাসন কাঠামোকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়– প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে একদিকে রয়েছে কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং অন্যদিকে বেসরকারি রিক্রুটিং এজেন্সি ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা কেন্দ্র। উল্লেখ্য, এসব প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের আইন ও বিধি দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। অন্যদিকে এ খাতে বেশ কিছু অংশীজন রয়েছে, যারা স্বীকৃত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বাইরে থেকে শ্রম অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় স্বতন্ত্র ভূমিকা পালন করছে, যাদের অপ্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

চিত্র ১ : বাংলাদেশের শ্রম অভিবাসন ব্যবস্থাপনা কাঠামো

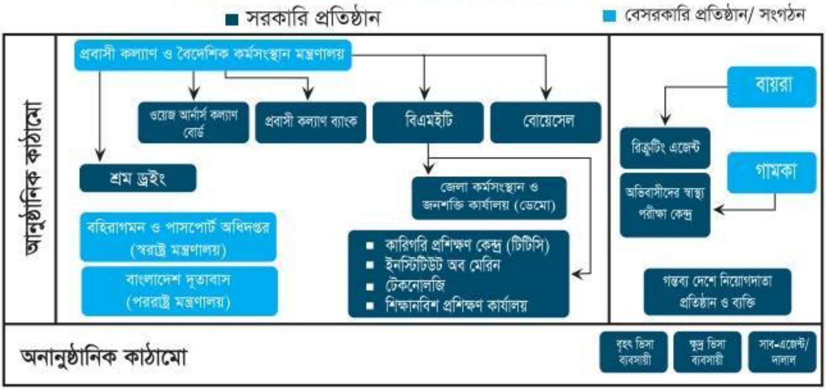

শ্রম অভিবাসন ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে মুখ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় চারটি দপ্তর/ সংস্থার মাধ্যমে সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করছে :

১. জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি); ২. বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল); ৩. ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এবং ৪. প্রবাসীকল্যাণ ব্যাংক। মন্ত্রণালয়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উইং হচ্ছে বিদেশের মিশনে অবস্থিত শ্রম উইং, যা এসব দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয় সহযোগিতায় শ্রমবাজার সম্প্রসারণের কাজ অব্যাহত রেখেছে। এ ছাড়া বাংলাদেশের নাগরিকদের বিদেশে যাতায়াতে সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর নতুন পাসপোর্ট প্রদান ও পুরোনো পাসপোর্ট নবায়ন সেবা দিয়ে থাকে। এ ছাড়া বিশ্বের ৬৫টি বাংলাদেশি মিশনে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট ও মেশিন রিডেবল ভিসা প্রদান করা হচ্ছে।

শ্রম অভিবাসন ব্যবস্থাপনা কাঠামোয় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রিক্রুটিং এজেন্সি ও তাদের সংগঠন বায়রা (Bangladesh Association of International Recruiting Agencies- BAIRA) অন্যতম। বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের অভিবাসন-প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য সরকার অনুমোদিত

মাধ্যম হচ্ছে ব্যক্তিমালিকানাধীন রিক্রুটিং এজেন্সি বা কোম্পানি। ২০১৬ সালের ডিসেম্বরের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, অনুমোদিত এজেন্সির সংখ্যা ১ হাজার ৩৭টি। এ ছাড়া বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে স্বাস্থ্য পরীক্ষা কেন্দ্র ও তাদের সংগঠন 'জিসিসি অনুমোদিত মেডিকেল সেন্টার অ্যাসোসিয়েশন (গামকা) (GCC Approved Medical Centre's Association - GAMCA)'।

শ্রম অভিবাসনের অপ্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত অংশীজনের মধ্যে রয়েছে দেশের বাইরে নিয়োগকারী বা নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠান, বিদেশি রিক্রুটিং এজেন্ট, বড় ও ক্ষুদ্র ভিসা ব্যবসায়ী বা এজেন্ট এবং দেশের ভেতরে বিভিন্ন স্তরে সক্রিয় মধ্যস্বত্বভোগী ও দালাল। অভিবাসী কর্মী নিয়োগ-প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বিদেশি শ্রমিক নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান বা নিয়োগদাতা। মূলত তাদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতেই প্রবাসের শ্রমবাজারে অভিবাসী কর্মীর প্রবেশাধিকার ও কাজের সুযোগ ঘটে।

বাংলাদেশ থেকে অভিবাসী কর্মী গ্রহণকারী মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ এবং মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুরসহ প্রায় সব দেশেই বিদেশি শ্রমিক বা অভিবাসী কর্মী সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান বা রিক্রুটিং এজেন্ট রয়েছে। এসব রিক্রুটিং এজেন্সি গন্তব্য দেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পে অভিবাসী কর্মী নিয়োগের চাহিদা মোতাবেক প্রবাসী কর্মী সরবরাহ করে। বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মী গ্রহণকারী দেশগুলোতে একশ্রেণির বাংলাদেশি এবং ভিনদেশি ব্যবসায়ী রয়েছে, যারা অভিবাসী কর্মী নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশি রিক্রুটিং এজেন্সি থেকে গ্রুপ ভিসা ক্রয় করে এবং বাংলাদেশের রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর কাছে বিক্রি করে। দুই দেশের শ্রম বাজারে বিদ্যমান লাভজনক এই ভিসা বাণিজ্যে এসব ব্যবসায়ী পাইকারি ভিসা ব্যবসায়ীর ভূমিকা পালন করে।

প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মীদের একাংশ একই প্রতিষ্ঠানে বা একই নিয়োগদাতার অধীনে দীর্ঘদিন সুনামের সাথে কাজ করার সুবাদে নিয়োগদাতার সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলে। পরবর্তীকালে একই প্রতিষ্ঠানে নতুন অভিবাসী কর্মীর প্রয়োজন হলে, নিয়োগদাতার সাথে তৈরি হওয়া ভালো সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে এবং অর্থের বিনিময়ে নিয়োগদাতাকে রাজি করিয়ে তার কাছ থেকে অভিবাসী শ্রমিকের চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে। এ ধরনের ভিসা ব্যবসায়ীকে ক্ষুদ্র ভিসা ব্যবসায়ী বা ভিসা সংগ্রহকারী বলা যেতে পারে। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব ভিসা অর্থের বিনিময়ে সংগ্রহ করা হয় এবং পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীর কাছে উচ্চ মূল্যে বিক্রি করা হয়।

বাংলাদেশি রিক্রুটিং এজেন্টগুলো তাদের সংগৃহীত চাহিদাপত্র অনুসারে অভিবাসী কর্মী সংগ্রহের জন্য মধ্যস্থতাকারী বা দালালের ওপর নির্ভরশীল। সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীদের সাথে রিক্রুটিং এজেন্সির সরাসরি যোগাযোগ থাকে না। অন্যদিকে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো মূলত ঢাকা ও চট্টগ্রাম নগরভিত্তিক; সারা দেশে তৃণমূল পর্যায়ে তাদের শাখা কার্যালয় বা স্থানীয় প্রতিনিধি নেই। ফলে সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মী ও রিক্রুটিং এজেন্সির মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে দালাল বা

মধ্যস্থতাকারীরা কাজ করে। তবে এই মধ্যস্থতাকারী বা দালালের আবার শ্রেণিভেদ আছে। প্রথম পর্যায়ের সাব-এজেন্ট বা দালাল সরাসরি রিক্রুটিং এজেন্টের সাথে কাজ করে। অন্যদিকে তাদের সাথে আরেক শ্রেণির দালালের যোগাযোগ থাকে, যারা তৃণমূল পর্যায়ে সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। প্রথম পর্যায়ের একজন দালালের সাথে একাধিক তৃণমূল পর্যায়ের দালালের যোগাযোগ থাকে এবং তাদের মাধ্যমেই মূলত অভিবাসী কর্মী সংগ্রহ বা ভিসা বিক্রি করা হয়। প্রথম পর্যায়ের দালালদের নিজেদের ভেতরেও যোগাযোগ থাকে।

৪. সরকারের গৃহীত সাম্প্রতিক পদক্ষেপ

বৈদেশিক কর্মসংস্থান সেবা সহজীকরণের অংশ হিসেবে সরকার সম্প্রতি বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে সেবার বিকেন্দ্রীকরণ করার উদ্যোগের অংশ হিসেবে ২৫টি জেলায় ফিঙ্গারপ্রিন্ট গ্রহণ করা হচ্ছে। বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করে ঢাকার পাশাপাশি চট্টগ্রামে স্মার্টকার্ড প্রদান করা হচ্ছে। প্রবাসী কর্মীর পরিবার ও স্বজনদের বিদেশ গমনের ক্ষেত্রে অনাপত্তিপত্র চট্টগ্রাম ও সিলেট থেকেও দেওয়া শুরু হয়েছে। বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীরা যেন নিজেদের ভিসা অনলাইনে যাচাই করতে পারেন, তার উদ্যোগ হিসেবে বিএমইটির ওয়েবসাইটে ও ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে অনলাইন ভিসা যাচাইয়ের সুবিধা রয়েছে এবং মোবাইল থেকে যাচাই করার জন্য মোবাইল অ্যাপস তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে বাহরাইন, আরব আমিরাত, কাতার ও সিঙ্গাপুরের ক্ষেত্রে এই সুবিধা বিদ্যমান। যেসব দেশে দীর্ঘদিন বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসন বন্ধ ছিল তাদের মধ্যে অনেক দেশে সাম্প্রতিক সময়ে সরকারের কূটনৈতিক উদ্যোগে নতুন করে শ্রম অভিবাসন শুরু হয়েছে। মালয়েশিয়ায় সরকার-সরকার (জিটুজি) প্লাস প্রক্রিয়ায় কর্মী পাঠানোর উদ্দেশ্যে ২০১৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি মালয়েশিয়ার সরকারের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বিদেশে কর্মরত নারী কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য বিএমইটিতে 'প্রবাসী নারী কর্মী অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল' (Complaint Management and Cell for Expatriate Female Workers) গঠন করা হয়েছে। এ ছাড়া অভিযোগ-সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের জন্য হটলাইন টেলিফোন চালু করা হয়েছে। অভিযোগ দাখিলের জন্য হটলাইনের পাশাপাশি ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে। অভিবাসনের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রবাসীকল্যাণ ব্যাংক থেকে ঋণ প্রদান, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও এসব কেন্দ্রের সক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৫. শ্রম অভিবাসন-প্রক্রিয়া

বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসন-প্রক্রিয়া প্রধানত তিনটি পর্যায়ে হয়। প্রথম পর্যায়ে গন্তব্য দেশের নিয়োগদাতা ও সংশ্লিষ্ট মধ্যস্বত্বভোগীদের দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে একদিকে নিয়োগের কার্যাদেশ/ ভিসা কেনাবেচা হয়, আবার অন্যদিকে গন্তব্য দেশে ভিসা অনুমোদন করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দূতাবাসের শ্রম উইংয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়। গন্তব্য দেশ থেকে কার্যাদেশ বা ভিসা কেনার জন্য হুন্ডির মাধ্যমে দেশ থেকে টাকা পাচার করে এ দেশি রিক্রুটিং এজেন্সি। শ্রম অভিবাসন-প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় পর্যায়ে সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীদের কাছে ভিসা বিক্রি করা হয়।

এপর্যায়ে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত সাব-এজেন্ট বা দালালদের মাধ্যমে সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মী নির্বাচন করে এবং তাদের কাছে দালালরা ভিসা বিক্রি করে। বিভিন্ন হাত ঘুরে ভিসা তাদের কাছে যাওয়ার কারণে ভিসার দাম বহুগুণে বেড়ে যায়। এ ছাড়া বিনা মূল্যে হওয়ার কথা থাকলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারী কর্মীদের কাছ থেকেও অবৈধভাবে টাকা আদায় করা হয় বলে জানা যায়। প্রক্রিয়ার তৃতীয় পর্যায়ে ভিসা প্রক্রিয়াকরণের সময় জটিল একটি প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়, যেখানে অনেকগুলো অংশীজন প্রতিষ্ঠান জড়িত। স্বাস্থ্য পরীক্ষা থেকে শুরু করে পুলিশি ছাড়পত্র, ভিসা স্ট্যাম্পিং, মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন, নিবন্ধন, প্রাক-বহির্গমন প্রশিক্ষণ এবং চূড়ান্তভাবে বহির্গমন ছাড়পত্র সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ অবৈধভাবে আদায় করা হয় বিদেশগামী কর্মীদের কাছ থেকে।

বিভিন্ন দেশ থেকে অভিবাসী কর্মীর চাহিদাপত্র ও ভিসা সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে নিয়োগদাতা, অভিবাসী কর্মী সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ও সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীসহ বিভিন্ন পক্ষ জড়িত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব পক্ষের মধ্যে সংযোগ বা যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তার সূত্রে বেশ কয়েকটি মধ্যস্থতাকারী বা মধ্যস্বত্বভোগী পক্ষ জড়িত। বিভিন্ন গন্তব্য দেশ থেকে বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মীর জন্য ভিসা সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী পক্ষ হচ্ছে (১) নিয়োগদাতা/ স্পনসর/ কফিল, (২) গন্তব্য দেশে শ্রমিক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান/ রিক্রুটিং এজেন্সি, (৩) বৃহৎ ভিসা ব্যবসায়ী/ সংগ্রহকারী, (৪) ক্ষুদ্র ভিসা ব্যবসায়ী/ সংগ্রহকারী, (৫) বাংলাদেশি রিক্রুটিং এজেন্সি, (৬) প্রথম পর্যায় ও তৃণমূল পর্যায়ে সক্রিয় সাব-এজেন্ট বা দালাল এবং (৭) সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মী।

চিত্র ২ : ভিসা সংগ্রহ ও ভিসা বিক্রির বিভিন্ন ধাপ

৫.১ গন্তব্য দেশে কার্যাদেশ/ চাহিদাপত্র সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ

শ্রম অভিবাসন-প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হচ্ছে অভিবাসী কর্মী গ্রহণকারী বিভিন্ন দেশ থেকে অভিবাসী কর্মীর চাহিদাপত্র ও ভিসা সংগ্রহ। গন্তব্য দেশে সম্ভাব্য নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান বা নিয়োগদাতা কর্তৃক অভিবাসী কর্মীর জন্য চাহিদাপত্র প্রস্তুত করার মাধ্যমে অভিবাসী

কর্মীর জন্য ভিসা সংগ্রহ-প্রক্রিয়া শুরু হয়। আইনানুযায়ী নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠান বা নিয়োগদাতা গন্তব্য দেশের কোনো অভিবাসী কর্মী সরবরাহকারী রিক্রুটিং এজেন্সিকে প্রয়োজনীয় অভিবাসী কর্মী সংগ্রহের জন্য চাহিদাপত্র ও কার্যাদেশ দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সি অভিবাসী কর্মী সরবরাহ করার জন্য নির্দিষ্ট হারে সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করে। একই ভাবে গন্তব্য দেশের, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন ধনাঢ্য ব্যক্তি, যারা সে দেশের আইন অনুযায়ী নিজ গৃহে গৃহকর্মী, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, পাচক, মালি, ড্রাইভার বিভিন্ন পদে অভিবাসী কর্মী নিয়োগ দিতে সক্ষম, তারা স্পনসর বা কফিল হিসেবে অভিবাসী কর্মীর চাহিদাপত্র তৈরি করেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গন্তব্য দেশে অভিবাসী কর্মী সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান বা রিক্রুটিং এজেন্সি নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে চাহিদাপত্র অনুয়ায়ী অভিবাসী কর্মী সরবরাহের কার্যাদেশ কিনে নেয়। কিছু ক্ষেত্রে রিক্রুটিং এজেন্সির পরিবর্তে গন্তব্য দেশের অপ্রাতিষ্ঠানিক বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ভিসা ব্যবসায়ীরাও এই কার্যাদেশ অতিরিক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে থাকেন। এই কার্যাদেশের সাথে চাহিদাপত্রের অনুলিপি, নিয়োগকারীর পক্ষে অভিবাসী কর্মী রিক্রুট করার অধিকার বা ক্ষমতাপত্র বা 'ওকালা' দেওয়া হয়।

সৌদি আরবে কাজের জন্য বাংলাদেশ সরকার নির্ধারিত খরচ ১ লাখ ৬৫ হাজার টাকা, অথচ একজন অভিবাসী কর্মীকে এ ক্ষেত্রে ব্যয় করতে হচ্ছে প্রায় সাড়ে ৫ লাখ থেকে সর্বোচ্চ ১২ লাখ টাকা পর্যন্ত। মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর বা মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে যেতেও কমপক্ষে আড়াই লাখ থেকে সর্বোচ্চ ৮ লাখ টাকা খরচ হয়ে থাকে। বিভিন্ন গবেষণার তথ্য অনুযায়ী মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমবাজারে কর্মরত অন্যান্য দেশের অভিবাসী কর্মী অপেক্ষা বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মীর অভিবাসন ব্যয় কয়েকগুণ বেশি। আন্তর্জাতিক অভিবাসী সংস্থার (আইওএম) তথ্য অনুযায়ীও দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বোচ্চ অভিবাসন ব্যয় হয় বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকদের। মূলত গন্তব্য দেশগুলো থেকে ভিসা ক্রয় করার ক্ষেত্রে এই অভিবাসন ব্যয়ের উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয় হয়।

সারণি ১ : কর্মী প্রেরণকারী দেশভেদে সৌদি আরবের ভিসার বিক্রয়মূল্য

কর্মী প্রেরণকারী দেশ	ভিসার ক্রয়মূল্য (সৌদি রিয়াল)
ফিলিপাইন	বিনা মূল্যে (টিকিটসহ অতিরিক্ত ৩৭৫০ রিয়াল কর্মীকে প্রদান করা হয়)
নেপাল	৫০০ - ৮০০
ভারত	১০০০ - ১৫০০
পাকিস্তান	৩০০০ - ৫০০০
বাংলাদেশ	৭০০০ - ১৫০০০

অভিবাসী কর্মী সরবরাহের চাহিদাপত্র সংগ্রহের পর সাধারণত গন্তব্য দেশে কার্যাদেশপ্রাপ্ত রিক্রুটিং এজেন্সি বা ভিসা ব্যবসায়ী সে দেশে অবস্থিত বাংলাদেশি দূতাবাস বা হাইকমিশন থেকে চাহিদাপত্র যাচাই ও সত্যায়ন করিয়ে থাকে।

৫.১.১ ভিসা সংগ্রহ ও সত্যায়নে দুর্নীতি ও অনিয়ম

গন্তব্য দেশে অবৈধভাবে ভিসা বিক্রি এবং ভিসা কেনার জন্য হুন্ডির মাধ্যমে অর্থ পাচার : বাস্তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মীদের প্রায় সব গন্তব্য দেশেই নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানের কিছু অসাধু কর্মকর্তা ওই প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সম্মতিতে অথবা তাদের অগোচরে বিনা মূল্যে সরবরাহ না করে চাহিদাপত্র বা ভিসা বিক্রি করে, যা আইনত সম্পূর্ণ অবৈধ। অনেক ক্ষেত্রে নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি ভিসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে তাদের প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত অভিবাসী কর্মীর চাহিদাপত্র তৈরি করে এবং পরে তা অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রি করে। বাংলাদেশ ও গন্তব্য দেশ উভয় দেশের আইন অনুযায়ী ভিসা বাণিজ্য নিষিদ্ধ হওয়ায় ভিসা ক্রয় করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বৈধভাবে ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রেরণ করা সম্ভব হয় না। ফলে বাংলাদেশি ভিসা ব্যবসায়ীরা ভিসা ক্রয়ে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে হুন্ডির মাধ্যমে গন্তব্য দেশে পাচার করেন।

চাহিদাপত্র সত্যায়নে অনিয়ম ও দুর্নীতি : অনেক ক্ষেত্রেই গন্তব্য দেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাসের শ্রম উইং চাহিদাপত্র অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট নিয়োগকর্তা সম্পর্কে যথাযথভাবে যাচাই না করেই চাহিদাপত্র সত্যায়ন করে বলে অভিযোগ রয়েছে। কোনো কোনো গন্তব্য দেশে বাংলাদেশি দূতাবাসের বিপক্ষে নিয়মবহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে চাহিদাপত্র সত্যায়ন এবং হয়রানির অভিযোগ রয়েছে।

সারণি ২ : গন্তব্য দেশভেদে ভিসার ক্রয়মূল্য ও অভিবাসী কর্মীর কাছে বিক্রয়মূল্য (২০১৬ সালের উপাত্ত অনুযায়ী প্রাক্কলন)*

ক্রম	দেশ	৯০% পুরুষ কর্মীর সংখ্যা (২০১৬)	ভিসার ন্যূনতম ক্রয়মূল্য	ভিসার ন্যূনতম বিক্রয়মূল্য	মোট ক্রয়মূল্য (কোটি টাকা)	মোট বিক্রয়মূল্য (কোটি টাকা)
১	সৌদি আরব	৬৮,০৬৪	১,২০,০০০	৫,০০,০০০	৮১৭	৩,৪০৩
২	বাহরাইন	৬৪,৮৭৯	৭০,০০০	২,৫০,০০০	৪৫৪	১,৬২২
৩	ওমান	১,৫৭,৮১৫	৭০,০০০	২,৫০,০০০	১,১০৫	৩,৯৪৫
৪	কাতার	১,০৩,৫০১	১,২০,০০০	৩,৫০,০০০	১,২৪২	৩,৬২৩
৫	আরব আমিরাত	২,৬৮২	১,০০,০০০	২,৫০,০০০	২৭	৬৭
৬	মালয়েশিয়া	৩৬,০৮৭	১,০০,০০০	৩,৫০,০০০	৩৬১	১,২৬৩
৭	সিঙ্গাপুর	৪৯,১৬৩	২,৫০,০০০	৬,০০,০০০	১,২২৯	২,৯৫০
				মোট	৫,২৩৪	১৬,৮৭৩

২০১৬ সালে শ্রম অভিবাসনের উপাত্ত অনুযায়ী ওই বছর যে সাতটি দেশে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক পুরুষ অভিবাসী কর্মী গেছেন, তাদের ৯০ শতাংশের ক্ষেত্রে একটি রক্ষণশীল প্রাক্কলন করে দেখা যায়, ভিসা কেনা বাবদ কমপক্ষে ৫ হাজার ২৩৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে; যার পুরোটাই ওই সব দেশে হুন্ডির মাধ্যমে পাচার হয়েছে।

৫.২ বাংলাদেশে ভিসা বিক্রি

গন্তব্য দেশে বাংলাদেশি দূতাবাসে চাহিদাপত্র সত্যায়নের পর এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সত্যায়ন ছাড়াই এসব চাহিদাপত্র বাংলাদেশি রিক্রুটিং এজেন্সির কাছে বিক্রি করা হয়। সাধারণত বাংলাদেশি রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো গন্তব্য দেশের বিভিন্ন রিক্রুটিং এজেন্সি, প্রবাসী কর্মী নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠান থেকে অভিবাসী কর্মী নিয়োগের জন্য চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে। একইভাবে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো গন্তব্য দেশে বিভিন্ন অপ্রাতিষ্ঠানিক ভিসা ব্যবসায়ীর কাছ থেকেও কর্মীর চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে। এ ছাড়া ক্ষুদ্র ভিসা ব্যবসায়ী অথবা কর্মরত অভিবাসী শ্রমিকদের একাংশের ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগৃহীত একক (Individual) ভিসা প্রক্রিয়াকরণের কাজও রিক্রুটিং এজেন্সি করে থাকে।

বাংলাদেশি রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সংগৃহীত ভিসা বিক্রির ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব নেটওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যস্বত্বভোগী দালালদের ওপর নির্ভরশীল। রিক্রুটিং এজেন্সি নির্দিষ্ট সংখ্যক দলীয় ভিসা সংগ্রহ বা ক্রয় করার পর তার নেটওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত সব প্রথম পর্যায়ের দালালকে ভিসার দেশ, ভিসার ধরন, প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা, সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীর যোগ্যতা এবং দালালদের জন্য প্রযোজ্য বিক্রয়মূল্য জানিয়ে দেয়। এরপর একজন প্রথম পর্যায়ের দালাল তার নিজ নেটওয়ার্কের সব তৃণমূল পর্যায়ের দালালের কাছে উল্লিখিত ভিসা সম্পর্কে সব তথ্য এবং তৃণমূল পর্যায়ের দালালের জন্য তার নির্দিষ্ট বিক্রয়মূল্য জানিয়ে দেয়। সবশেষে তৃণমূল পর্যায়ের দালাল তার নেটওয়ার্কের মধ্যে সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করে এবং তাদের ভিসার সব তথ্য ও বিক্রয়মূল্য জানিয়ে দেয়। রিক্রুটিং এজেন্সি নিজেদের সংগ্রহ করা ভিসা বিক্রির ক্ষেত্রে ভিসাপ্রতি বিভিন্ন খরচ বাদে ব্যবসায়িক লাভ বাবদ ন্যূনতম ৩০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা নিয়ে থাকে।

সামগ্রিকভাবে ভিসা সংগ্রহ থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন মধ্যস্বত্বভোগীর হাতবদলের মাধ্যমে সর্বশেষ পর্যায়ে অভিবাসী কর্মীর কাছে ভিসা বিক্রির পর্যায়ে ভিসাপ্রতি কয়েক দফা মূল্য সংযোজিত হওয়ার মাধ্যমে কয়েকগুণ মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। সর্বশেষ পর্যায়ে অভিবাসী কর্মীর কাছে বিক্রয়মূল্যের সাথে সাধারণত কর্মীর স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফি, ভিসা প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন ধাপে প্রয়োজনীয় সরকারি ফি, আয়কর ও নিয়মবহির্ভূত ব্যয় এবং কর্মীর বিদেশ গমনের টিকিটের মূল্য অন্তর্ভুক্ত থাকে (সারণি ৩)।

সারণি ৩ : গন্তব্য দেশভেদে বিভিন্ন পর্যায়ে ভিসার বিক্রয়মূল্য (লাখ টাকা)

দেশ	নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠান	বিদেশি রিক্রুটিং এজেন্সি	বৃহৎ ভিসা ব্যবসায়ী	ক্ষুদ্র ভিসা ব্যবসায়ী*	বাংলাদেশি রিক্রুটিং এজেন্সি	দালাল (১ম পর্যায়)	দালাল (তৃণমূল পর্যায়)
সৌদি আরব	১.২ - ২.৮	১.৫ - ৩.২	২.০ - ৩.৭	১.২ - ২.৮	৪.০ - ৫.৫	৪.৫ - ৬.৫	৫.০ - ১২**
বাহরাইন	০.৭ - ০.৮	১.০ - ১.৩	১.২ - ১.৫	০.৭ - ০.৮	১.৭ - ২.০	২.০ - ২.৩	২.৫ -৩.৫
ওমান	০.৭ - ০.৮	১.০ - ১.৩	১.২ - ১.৫	০.৭ - ০.৮	১.৭ - ২.০	২.০ - ২.৩	২.৫ -৩.৫
কাতার	১.২ - ১.৫	১.৫ - ১.৭	১.৭ - ২.০	১.২ - ১.৫	২.২ - ৩.০	২.৫ - ৩.০	৩.৫ - ৫.০
আরব আমিরাত	১.০ - ১.৫	১.৩ - ১.৮	১.৫ - ১.৮	১.০ - ১.৫	২.৫ - ৩.৫	২.৮ - ৪.০	২.৫ - ৮.০
মালয়েশিয়া	১.০ - ১.৪	১.২ - ১.৫	১.৫ - ২.০	১.০ - ১.৪	২.৫ - ৩.০	৩.৫ - ৫.০	৩.৫ - ৬.৫
সিঙ্গাপুর	২.৫ - ৩.০	২.৮ - ৩.৮	৩.৫ - ৪.৫	২.৫ - ৩.০	৫.০ - ৬.০	৫.৫ - ৬.৫	৫.০ - ৬.০

৫.২.১ অভিবাসী কর্মীর কাছে ভিসা বিক্রিতে দুর্নীতি ও অনিয়ম

অভিবাসী কর্মীর কাছে দালালদের ভিসা বিক্রি : সাধারণত দালালদের কাছ থেকে ভিসা ক্রয়ের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মী বিদেশে চাকরি সম্পর্কে সবকিছু সঠিকভাবে না জেনেই শুধু ব্যক্তিগত পরিচয়ের ওপর নির্ভর করে আর্থিক লেনদেন করে থাকেন। ভিসা নিশ্চিতের অনেক আগে থেকেই কিস্তিতে অর্থ জমা দেওয়ার কারণে এবং অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে তৈরি হওয়া নির্ভরশীলতার কারণে সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মী দালালের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে থাকেন। বিদেশে চাকরি সম্পর্কে দালাল যেটুকু তথ্য সরবরাহ করে সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীকে তা-ই বিশ্বাস করতে হয়। সাধারণত আগ্রহী অভিবাসী কর্মীকে বিদেশ গমনের প্রাক্কালে বিমানবন্দরে যাওয়ার পর কাজের চুক্তি তার হাতে দেওয়া হয়।

অভিবাসী কর্মীদের কাছ থেকে ভিসার জন্য অতিরিক্ত মূল্য আদায় : এসব দালাল কোনো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায়, তাদের কোনো জবাবদিহির ক্ষেত্র বা সুযোগ থাকে না। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই দালালরা অভিবাসী কর্মীর সাথে আর্থিক প্রতারণা, দীর্ঘসময় ধরে ভিসার জন্য হয়রানি করে এবং ভালো চাকরি বা সুযোগ-সুবিধার প্রলোভনের মাধ্যমে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে থাকে। বর্তমানে সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে গৃহকর্মী ভিসায় সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে নারী অভিবাসী প্রেরণ করার নিয়ম থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই দালালরা স্বাস্থ্য পরীক্ষা, বহির্গমন ছাড়পত্র সংগ্রহ, ভালো শহরে পাঠানোসহ বিভিন্ন অজুহাতে প্রতারণার মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে গড়ে ১০-১৫ হাজার টাকা আদায় করে থাকে।

৫.৩ ভিসা প্রক্রিয়াকরণ ও বহির্গমন ছাড়পত্র সংগ্রহ

গন্তব্য দেশ থেকে ভিসা সংগ্রহ এবং বিভিন্ন পর্যায়ে হাতবদলের মাধ্যমে সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীর কাছে ভিসা বিক্রি নিশ্চিত হওয়ার পর বাংলাদেশে বিভিন্ন ধাপে ভিসা প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন করা হয়।

চিত্র ৩ : বাংলাদেশে ভিসা প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন ধাপ

*● অনিয়ম ও দুর্নীতি সংঘটনের পর্যায়

এ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ, সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা, কর্মীর পুলিশ ছাড়পত্র সংগ্রহ, কর্মীর পাসপোর্টে ভিসা স্ট্যাম্পিং বা কর্মীর নামে পেপার ভিসা সংগ্রহ, কেন্দ্রীয় ডেটাবেজে নাম নিবন্ধন এবং সবশেষে বিএমইটি থেকে অনুমোদনের মাধ্যমে বহির্গমন ছাড়পত্র সংগ্রহ করা হয়। পরে ফ্লাইট টিকিট সংগ্রহের মাধ্যমে অভিবাসী কর্মী গন্তব্য দেশে গমন করেন।

সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মী নির্বাচন : দলীয় ভিসার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে ভিসা প্রক্রিয়াকরণের প্রথম ধাপে আগ্রহী অভিবাসী কর্মী নির্বাচন করা হয়। আইনানুযায়ী রিক্রুটিং এজেন্সি অভিবাসী কর্মী নিয়োগ-সংক্রান্ত কার্যাদেশ পাওয়ার পর দলীয় ভিসার ক্ষেত্রে চাহিদাপত্র অনুযায়ী কর্মী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অনুমতি গ্রহণের পর বিএমইটির কেন্দ্রীয় ডেটাবেজ থেকে আগ্রহী কর্মী সংগ্রহ করবে। ডেটাবেজে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মী পাওয়া না গেলে সে ক্ষেত্রে গণমাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কর্মী সংগ্রহ করার সুযোগ রয়েছে। তবে বর্তমানে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো সাধারণত ডেটাবেজ থেকে কর্মী সংগ্রহ না করে তাদের নিজস্ব দালালনির্ভর নেটওয়ার্ক ব্যবহারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আগ্রহী অভিবাসী কর্মী নির্বাচন করে।

অন্যদিকে, ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগ্রহ করা একক ভিসার ক্ষেত্রে একজন সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীর ভিসা প্রক্রিয়াকরণের প্রথম ধাপ হচ্ছে কোনো নিবন্ধিত রিক্রুটিং এজেন্সির সাথে যোগাযোগ করা এবং ভিসা প্রক্রিয়াকরণে চুক্তিবদ্ধ হওয়া। কেননা দলীয় বা একক, উভয় ভিসার ক্ষেত্রেই বহির্গমন ছাড়পত্রের জন্য নিবন্ধিত রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে বিএমইটিতে আবেদন করতে হয়, যদিও একক ভিসার জন্য বহির্গমন ছাড়পত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মী নিজেই 'ওয়ান স্টপ' সেবার জন্য আবেদন করতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিয়ে তা সংগ্রহ করতে পারেন। কিন্তু কার্যত বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন গন্তব্য দেশে গমনকারী প্রায় শত ভাগ অভিবাসী কর্মী তাদের বহির্গমন ছাড়পত্রের জন্য রিক্রুটিং এজেন্সির ওপর নির্ভরশীল। এখানে সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মী কর্তৃক রিক্রুটিং এজেন্সিকে সরকার নির্ধারিত আয়কর ও বিভিন্ন ফির সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ সার্ভিস চার্জও দিতে হয়।

প্রতিটি গন্তব্য দেশের জন্য সেই দেশের চাহিদা ও মান অনুযায়ী স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য কিছু স্বাস্থ্য পরীক্ষা কেন্দ্র নির্ধারিত আছে। স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য প্রথমে রিক্রুটিং এজেন্সি তার সংগৃহীত চাহিদাপত্র অনুযায়ী গামকা কার্যালয় থেকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক মেডিকেল স্লিপ সংগ্রহ করে। আগ্রহী অভিবাসী কর্মী এজেন্সি প্রদত্ত এই মেডিকেল স্লিপ নিয়ে গামকা কার্যালয়ে হাজির হয় এবং ছবি ও আঙুলের ছাপ দিয়ে প্রাথমিক নিবন্ধন সম্পন্ন করে। গামকা কার্যালয় থেকে আগ্রহী অভিবাসী কর্মীকে তার স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কেন্দ্রের নাম জানিয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে অভিবাসী কর্মী গামকা নিবন্ধন কার্ড নিয়ে তার জন্য নির্বাচিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত ফি হিসেবে মোট ৬ হাজার ১৫০ টাকা জমা দিতে হয়।

গন্তব্য দেশের দূতাবাসে ভিসা স্ট্যাম্পিং : নির্বাচিত অভিবাসী কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে গন্তব্য দেশের দূতাবাস থেকে পাসপোর্টে ভিসা স্ট্যাম্পিং করাতে হয়। এ ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রত্যেক অভিবাসী কর্মীর জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ পৃথক ভিসা আবেদন ফাইল তৈরি করতে হয়। অভিবাসী কর্মী ব্যক্তিগত উদ্যোগে নিজের জন্য পুলিশ ছাড়পত্র (Police Clearance Report) সংগ্রহ করে। দূতাবাসে জমা দেওয়া নথির সব তথ্য সঠিক পাওয়া সাপেক্ষে কর্মীর পাসপোর্টে ভিসা স্ট্যাম্পিং করা হয়। তথ্যগত অসম্পূর্ণতা বা ভুল পাওয়া গেলে ফাইল ফেরত দেওয়া হয়। কোনো কোনো গন্তব্য দেশের ভিসা স্ট্যাম্পিংয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের দূতাবাসের বিরুদ্ধে অযথা সময়ক্ষেপণ, হয়রানি ও নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায় করার অভিযোগ রয়েছে। তবে কোনো কোনো গন্তব্য দেশ, যেমন ওমান, বাহরাইন ও কাতারের পাসপোর্টে ভিসা স্ট্যাম্পিংয়ের প্রয়োজন হয় না।

মন্ত্রণালয় থেকে নিয়োগ অনুমতি, নাম নিবন্ধন ও প্রশিক্ষণ : গন্তব্য দেশের দূতাবাস থেকে আগ্রহী অভিবাসী কর্মীর পাসপোর্টে ভিসা স্ট্যাম্পিং হওয়ার পর অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গন্তব্য দেশ থেকে কর্মীর নামে ছাপানো পেপার ভিসা সংগ্রহের পর দলীয় ভিসার ক্ষেত্রে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে অভিবাসী কর্মী নিয়োগ অনুমতির জন্য আবেদন করতে হয়। তবে একক ভিসা প্রক্রিয়াকরণে মন্ত্রণালয়ের অনুমতির প্রয়োজন হয় না।

মন্ত্রণালয়ের অনুমতি পাওয়ার পর বিদেশগামী কর্মীদের কেন্দ্রীয় ডেটাবেজে ছবি ও বায়োমেট্রিক ফিঙ্গার প্রিন্টের মাধ্যমে নাম নিবন্ধন করতে হয়। এ ক্ষেত্রে সরকারি ফি ২০০ টাকা। বর্তমানে ঢাকার বাইরে ২৫টি জেলার কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (ডেমো) থেকে ফিঙ্গার প্রিন্ট ও ছবিসহ নাম নিবন্ধন করার সুযোগ রয়েছে। পাসপোর্টে ভিসা স্ট্যাম্পিং হওয়ার পর অথবা পেপার ভিসা সংগ্রহ করার পর বিএমইটির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত যেকোনো প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে বিদেশ গমন-সংক্রান্ত তিন দিনের একটি প্রি-ডিপার্চার প্রশিক্ষণ নিতে হয়। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণ-সংক্রান্ত একটি সনদ দেওয়া হয়, যা বহির্গমন ছাড়পত্রের জন্য আবেদনের সাথে জমা দিতে হয়।

বহির্গমন ছাড়পত্র গ্রহণ : বিএমইটিতে বহির্গমন ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করার আগে কর্মী সংগ্রহের কার্যাদেশ অনুসারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মী নির্বাচন, নির্বাচিত কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সাপেক্ষে তাদের পাসপোর্টে ভিসা স্ট্যাম্পিং বা পেপার ভিসা সংগ্রহ, কেন্দ্রীয় ডেটাবেজে কর্মীদের ফিঙ্গার প্রিন্ট ও ছবিসহ নাম নিবন্ধন, প্রয়োজনীয় প্রি-ডিপার্চার প্রশিক্ষণ এবং দলীয় ভিসার ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের নিয়োগানুমতি নিশ্চিত করতে হয়। সাধারণত রিক্রুটিং এজেন্সির প্রতিনিধি সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীপ্রতি বহির্গমন ছাড়পত্রের জন্য পৃথক পৃথক ফাইল তৈরি করে। প্রতিটি ফাইলের ফরোয়ার্ডিং লেটারে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার অনুমতির স্বাক্ষর সংগ্রহ করে কর্মীর গন্তব্য দেশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সেকশনে ফাইল জমা দিতে হয়। আবেদন প্রাপ্তির পর কর্মীদের ভিসার সঠিকতা যাচাই, নিয়োগকর্তার সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্র ও অঙ্গীকারনামা যাচাই শেষে বহির্গমন ছাড়পত্র অনুমোদন করা হয় এবং স্মার্টকার্ডের মাধ্যমে বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। পরে সংশ্লিষ্ট এজেন্সির প্রতিনিধি সবার বহির্গমন ছাড়পত্র বা স্মার্টকার্ড সংগ্রহ করে। সবশেষে কর্মীর পাসপোর্টে ছাড়পত্র নম্বরসহ বিএমইটির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর করাতে হয়।

৫.৩.১ *ভিসা প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতি ও অনিয়ম*

বিদেশগামী কর্মীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং এ-সংক্রান্ত অনিয়মের অভিযোগ : কোনো কোনো স্বাস্থ্য পরীক্ষা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিবাসী কর্মীর কাছ থেকে নিয়মবহির্ভভাবে অর্থ আদায় করার অভিযোগ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে মেডিকেলি যোগ্য প্রার্থীর স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রতিবেদনে তাকে অযোগ্য ঘোষণার ভয় দেখিয়ে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতার অজুহাতে একই অভিবাসী কর্মীর একাধিকবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোরও অভিযোগ পাওয়া যায়। কোনো কোনো স্বাস্থ্য পরীক্ষা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে নির্ধারিত সব স্বাস্থ্য পরীক্ষা ছাড়াই এ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

পুলিশি ছাড়পত্র সংগ্রহে নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ আদায় : পুলিশের ছাড়পত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে অধিকাংশ অভিবাসী কর্মীর পক্ষ থেকে নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ আদায়ের অভিযোগ পাওয়া যায়। এ ছাড়পত্র সংগ্রহের জন্য ৫০০ থেকে ১ হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করার অভিয়োগ রয়েছে।

নিয়োগানুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে অবৈধ অর্থ আদায় : প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে নিয়োগানুমতি সংগ্রহের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের একটি অসাধু চক্র ভিসাপ্রতি ১৩ হাজার থেকে ১৫ হাজার টাকা নিয়মবহির্ভূতভাবে আদায় করে বলে অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিএমইটির ডেটাবেজ থেকে নিবন্ধিত কর্মী বাছাই না করে তাদের নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অর্থাৎ দালালদের মাধ্যমে কর্মী সংগ্রহ করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অভিবাসী কর্মী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উপস্থিত না থেকে বা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ না করেও দালালদের সাথে নিয়মবহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে প্রশিক্ষণ সনদপত্র সংগ্রহ করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। বিএমইটি থেকে বহির্গমন ছাড়পত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে কর্মী বা ভিসাপ্রতি ন্যূনতম ১০০ থেকে ২০০ টাকা নিয়মবহির্ভূতভাবে আদায় করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

২০০৯ সাল থেকে মালয়েশিয়ায় বৈধভাবে কলিং ভিসায় বাংলাদেশ থেকে স্বল্প দক্ষ ও আধা দক্ষ অভিবাসী কর্মী নিয়োগ বন্ধ ছিল। অথচ বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ২০১৫ সালে প্রায় ৩০ হাজার

সারণি ৪ : ভিসা প্রক্রিয়াকরণে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও ছাড়পত্র গ্রহণে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের চিত্র (২০১৬)

ক্রম	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ	নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের খাত	২০১৬ সালে ভিসার সংখ্যা	ভিসাপ্রতি আদায়কৃত টাকার পরিমাণ
	প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	দলীয় ভিসার ক্ষেত্রে অনুমোদন	৬১,১২২	১৩,০০০ - ১৫,০০০
১	বিএমইটি	বহির্গমন ছাড়পত্রের অনুমোদন	৭,৫৭,৭৩১	১০০ - ২০০
২	থানা-পুলিশ	পুলিশ ছাড়পত্র	৭,৫৭,৭৩১	৫০০ - ১,০০০
৩	দেশভিত্তিক নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়			
৪	বিএমইটি	মালয়েশিয়ায় পেশাগত ভিসায় অদক্ষ বা আধা দক্ষ কর্মীর জন্য বহির্গমন ছাড়পত্র	৪০,১২৬	৫,০০০ - ১৫,০০০

এবং ২০১৬ সালে প্রায় ৪০ হাজার অভিবাসী কর্মী বিভিন্ন ভিসায় বিএমইটি থেকে বহির্গমন ছাড়পত্র নিয়ে মালয়েশিয়ায় গেছেন। এ ক্ষেত্রে পেশাগত কর্মীর ভিসায় স্বল্প দক্ষ ও আধা দক্ষ কর্মী পাঠানোর অভিযোগ রয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যমতে, মালয়েশিয়া ইমিগ্রেশন, সংশ্লিষ্ট দূতাবাস ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষের কিছু অসাধু কর্মকর্তার যোগসাজশে নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের বিনিময়ে এসব কর্মীর বহির্গমন ছাড়পত্রের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এসব ভিসায় মালয়েশিয়া যাওয়ার ক্ষেত্রে বহির্গমন ছাড়পত্রের জন্য বিএমইটিতে ভিসাপ্রতি সর্বনিম্ন ৫ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত নিয়মবহির্ভূতভাবে আদায়ের অভিযোগ রয়েছে।

৬. শ্রম অভিবাসন-প্রক্রিয়ায় সুশাসনের সমস্যার কারণ

শ্রম অভিবাসন-প্রক্রিয়ায় সুশাসনের সমস্যার কারণগুলো আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রক্রিয়াগত– এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়। বাংলাদেশের শ্রম অভিবাসন-সংক্রান্ত প্রধান আইন 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসন আইন ২০১৩'তে কয়েকটি ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ও বাস্তবসম্মত নির্দেশনা নেই। বাংলাদেশ থেকে সংঘটিত শ্রম অভিবাসনের সবচেয়ে বড় অংশই (প্রায় ৯০ শতাংশ) ব্যক্তিগত উদ্যোগে হলেও এ বিষয়ে এই আইনের কোনো উল্লেখ করা হয়নি। বরং অভিবাসী কর্মী পাঠানোর কর্তৃত্ব কেবল সরকারি কোনো সংস্থা ও রিক্রুটিং এজেন্টের বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং কর্মসংস্থান চুক্তির দায়দায়িত্ব রিক্রুটিং এজেন্টের ওপর নিয়োগকারীর সাথে যৌথ ও এককভাবে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আইনের অনেক ধারা (কর্মী বাছাই, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে) নির্দেশনামূলক, বাধ্যতামূলক নয়, যা আইনের শক্তিকে খর্ব করে। যেমন আইনের ধারা-১৮তে রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত অভিবাসীর ক্ষতিপূরণের কথা বলা হলেও তার বাধ্যবাধকতা রাখা হয়নি। এ ছাড়া এ খাতে সক্রিয় 'দালাল'দের কার্যক্রম কার্যত আইনের আওতার বাইরে রয়ে গেছে।

শ্রম অভিবাসনের বিধিগুলোতেও কিছু অসংগতি লক্ষ করা যায়। বহির্গমন বিধিমালায় ইমিগ্র্যান্ট রেজিস্ট্রার ও লেবার অ্যাটাশেদের ভূমিকা ও করণীয় সম্পর্কে বলা হয়েছে, কিন্তু তাদের জবাবদিহির আওতায় আনার জন্য কোনো প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করা হয়নি। রিক্রুটিং এজেন্সি লাইসেন্স ও আচরণ বিধিমালায় অভিবাসন-সম্পর্কিত অপরাধ ও অনিয়মজনিত কারণে শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু অভিবাসীর ক্ষতিপূরণের কোনো বিধান এখানে নির্দিষ্ট করা হয়নি। এখন পর্যন্ত বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩-এর ওপর ভিত্তি করে কোনো বিধিমালা প্রণীত হয়নি, ২০০২ সালের বিধিমালাই এখনো বিদ্যমান। ফলে এখনকার বাস্তবতায় এ খাতে নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করা সম্ভব হচ্ছে না।

শ্রম অভিবাসন-প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান সমস্যা, দুর্নীতি ও অনিয়মের পেছনে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা একটি বড় কারণ। শ্রম অভিবাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে আর্থিক সক্ষমতার ঘাটতি লক্ষ করা যায়। একদিকে এ খাতে বরাদ্দকৃত বাজেট প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল, অন্যদিকে বরাদ্দকৃত বাজেটও সম্পূর্ণ ব্যবহৃত হয় না। শ্রম অভিবাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের প্রতিষ্ঠানেই জনবলের ঘাটতি রয়েছে। প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে শূন্যপদের হার প্রায় ৩৬ দশমিক ৭

শতাংশ। বিএমইটির প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতেও জনবলের ঘাটতি রয়েছে, যে কারণে প্রি-ডিপারচার প্রশিক্ষণে ঘাটতি থেকে যায়।

ভিসা প্রক্রিয়াকরণ এবং রিক্রুটিং এজেন্টদের কার্যক্রমে বিকেন্দ্রীকরণের ঘাটতি বিদ্যমান। ভিসা প্রক্রিয়া করার বিভিন্ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের (রিক্রুটিং এজেন্ট, বিএমইটি, মন্ত্রণালয়, গন্তব্য দেশের দূতাবাস, স্বাস্থ্য পরীক্ষা কেন্দ্র, ট্রাভেল এজেন্ট) কার্যালয় প্রধানত রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত, ফলে এসব কাজের জন্য অভিবাসী কর্মীদের একাধিকবার ঢাকায় আসতে হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অভিবাসী কর্মীদের স্বল্পশিক্ষিত ও (পল্লি অঞ্চল থেকে আসার কারণে) ঢাকার পরিবেশের সাথে পরিচিত না হওয়ার কারণে দালালদের ওপরই নির্ভর করতে হয়। অন্যদিকে প্রায় সব রিক্রুটিং এজেন্টের কার্যালয় ঢাকায় (এবং ক্ষেত্রবিশেষে চট্টগ্রামে) এবং মাঠপর্যায়ে তাদের শাখা না থাকার ফলে অভিবাসী কর্মী বাছাইয়ের জন্য তাদের দালালদের ওপরেই নির্ভর করতে হয়। ফলে সার্বিকভাবে এ খাতটি প্রধানত 'দালালনির্ভর'।

ভিসা প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ, একজন অভিবাসী কর্মীকে অভিবাসন-প্রক্রিয়ায় একাধিকবার বায়োমেট্রিক আইডেন্টিটি, তথা আঙুলের ছাপ ও ছবি দিতে হয়। এ ছাড়া দলীয় ভিসা ও অপ্রচলিত দেশের ভিসার ক্ষেত্রে বহির্গমন ছাড়পত্রের জন্য মন্ত্রণালয় ও বিএমইটি উভয়ের কাছে আবেদন করতে হয়। শ্রম শাখাগুলো কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করবে বা মিশনে শাখাগুলো কার অধীনে থাকবে, তা নিয়েও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে মতপার্থক্য থাকার অভিযোগ রয়েছে। গন্তব্য দেশে ভিসা কেনাবেচা, গন্তব্য দেশে কর্মসংস্থানের বৈধতা যাচাই, বাংলাদেশে অভিবাসন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির ক্ষেত্রে ঘাটতি বিদ্যমান। শ্রম শাখাগুলোর সেবা দিতে গিয়ে ব্যর্থতার পেছনে অন্যান্য কারণের মধ্যে আছে ভৌগোলিকভাবে বড় আয়তনের দেশগুলোতে মিশনের অবস্থানগত দূরত্ব, দক্ষ কর্মকর্তা ও জনবলের অভাব, আইনি সেবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব। এর মধ্যে সৌদি আরবের মতো বড় রাষ্ট্রগুলোর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে যে ধরনের যানবাহনের প্রয়োজন হয় তা-ও নেই অনেক মিশনের।

শ্রম অভিবাসন-প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান সমস্যা, দুর্নীতি ও অনিয়মের পেছনের কারণগুলোর মধ্যে প্রক্রিয়াগত সীমাবদ্ধতা অন্যতম। পুরো শ্রম অভিবাসন-প্রক্রিয়া জটিল ও দীর্ঘ। ভিসা সংগ্রহ থেকে শুরু করে বহির্গমন ছাড়পত্র ও স্মার্টকার্ড পাওয়া পর্যন্ত ২৪ থেকে ২৭টি ধাপ অতিক্রম করতে হয়। এর মধ্যে বিএমইটিতে রয়েছে ৯ থেকে ১১টি ধাপ। ভিসা সংগ্রহ করার জন্য বেশির ভাগ অভিবাসী কর্মী দীর্ঘদিন ধরে দালাল বা ক্ষুদ্র ভিসা ব্যবসায়ীকে টাকা দেন। বহির্গমন ছাড়পত্রের জন্য মন্ত্রণালয়ে সত্যায়িত ভিসার ক্ষেত্রে ৩ থেকে ৫ দিন এবং অসত্যায়িত ভিসার ক্ষেত্রে ৭ থেকে ১৫ দিন সময় লাগে। এ ক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ আছে এবং এই লেনদেনের ওপর অনুমোদনের দীর্ঘসূত্রতা নির্ভরশীল। পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে প্রায় ৩০-৪৫ দিন ব্যয় হয়। অন্যদিকে বিএমইটি থেকে বহির্গমন ছাড়পত্র প্রাপ্তি প্রায় শত ভাগ ক্ষেত্রে এজেন্সিনির্ভর। বর্তমানে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী স্বল্প দক্ষ ও আধা দক্ষ অভিবাসী কর্মীদের বহির্গমন ছাড়পত্রের জন্য ব্যক্তিগতভাবে আবেদনের সুযোগ নেই। দলীয় ভিসার ক্ষেত্রে বহির্গমন ছাড়পত্রের জন্য মন্ত্রণালয় ও বিএমইটি উভয়ের কাছে আবেদন করতে হয়।

শ্রম অভিবাসন-প্রক্রিয়া প্রায় পুরোটাই দালালনির্ভর। ফলে লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিক্রুটিং এজেন্সির সাথে অভিবাসী কর্মীর সরাসরি যোগাযোগ প্রায় অনুপস্থিত। বিদেশে নিয়োগ ও কাজের শর্তাবলি-সংক্রান্ত তথ্য, অভিবাসন-সংক্রান্ত তথ্য, অভিবাসন-প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদির জন্য অভিবাসী কর্মীরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দালালদের ওপর নির্ভরশীল। একইভাবে তৃণমূল পর্যায় থেকে কর্মী বাছাই, তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা, ভিসা প্রক্রিয়াকরণে সহায়তা ইত্যাদির জন্য রিক্রুটিং এজেন্টরাও দালালদের ওপর নির্ভরশীল। এসব কারণে অভিবাসী কর্মীদের একটি বড় অংশই আর্থিক লেনদেনে কোনো রসিদ নিতে পারে না, ফলে এ খাতে ব্যয়ের দালিলিক প্রমাণ অনুপস্থিত রয়ে যায়। সব দেশের জন্য সরকারিভাবে অভিবাসনের ব্যয় নির্ধারিত নেই। কোনো অভিবাসী কর্মী প্রতারিত হলে কী পরিমাণ ক্ষতিপূরণ পাবেন, তা প্রয়োজনীয় দালিলিক প্রমাণের ঘাটতি থাকায় নির্ধারণ করা যায় না এবং সংশ্লিষ্ট অভিবাসী কর্মী সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পান না।

বাংলাদেশে সম্ভাব্য আগ্রহী অভিবাসী কর্মী যেকোনো মূল্যে ভিসা কিনতে চান এবং দালালদের কাছে টাকা জমা রাখেন। অন্যদিকে গন্তব্য দেশে কর্মীর চাহিদা সীমিত এবং বেশ কয়েকটি প্রধান গন্তব্য দেশে গত কয়েক বছর শ্রম অভিবাসন বন্ধ ছিল। ফলে সেসব দেশেও বৈধ উপায়ের বাইরে গিয়ে অভিবাসনের প্রবণতা তৈরি হয়েছে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে গন্তব্য দেশে ভিসা ব্যবসায়ীদের অসাধু প্রতিযোগিতা তৈরি হয় এবং মধ্যস্বত্বভোগীদেরও অতিরিক্ত মুনাফা করার প্রবণতা তৈরি হয়।

বাংলাদেশ থেকে বিদেশগামী কর্মীদের একটি বড় অংশেরই শিক্ষা ও দক্ষতার ঘাটতি বিদ্যমান। অভিবাসন-প্রক্রিয়ার জটিলতা ও প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে এবং একই সাথে সামাজিক যোগাযোগের কারণে দালালদের ওপর তাদের আস্থা ও নির্ভরতা রয়েছে। সরকার বা অন্য কোনো অংশীজনের সাবধান বাণী তারা গ্রাহ্য করে না। বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রচার ও প্রকাশেও ঘাটতি রয়েছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়– এ সম্পর্কে সঠিক তথ্য থাকা জরুরি। বর্তমানে ৪২টি জেলায় ডেমো কার্যালয় থেকে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ওপর তথ্য দেওয়া হয় এবং কয়েকটি বেসরকারি সংস্থার এ ধরনের তথ্য প্রচার-সংক্রান্ত কার্যক্রম রয়েছে। কিন্তু এসব কার্যক্রম খুব সীমিত পর্যায়ের এবং সরকারের পক্ষ থেকে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য, যেমন কোন দেশে কী ধরনের কাজ করা যায়, কোন কাজে কী ধরনের বেতন, কী ধরনের সুযোগ-সুবিধা রয়েছে ইত্যাদি সম্পর্কে প্রচার-প্রচারণার ঘাটতি রয়েছে। শ্রম অভিবাসন-প্রক্রিয়া সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রচার ও প্রকাশেও ঘাটতি রয়েছে।

শ্রম অভিবাসন-প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি ও অনিয়ম-সংক্রান্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আইন প্রয়োগে ঘাটতি লক্ষ করা যায়। প্রণয়নের পর থেকে মানব পাচারের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী ২০১৩' আইনের অধীনে মামলা না হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চ আদালত ২০১৫ সালের ৫ মার্চ সরকারকে ব্যাখ্যা করার জন্য রুল জারি করে। এ আইনের অধীনে আটটি মামলা দায়ের করা হলেও এখন পর্যন্ত কোনো বিচার সম্পন্ন হয়নি। অন্যদিকে মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২ প্রণয়নের পর থেকে এখন পর্যন্ত দুই শতাধিক মামলা হলেও এর মধ্যে একটি মামলাও এখনো বিচারের জন্য প্রস্তুত হয়নি।

আবার বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ে অভিবাসী কর্মীদের কাছ থেকে রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে প্রাপ্ত অভিযোগের একটি বড় অংশই একদিকে নিষ্পত্তি হয় না বলে দেখা যায়, আবার অন্যদিকে নিষ্পত্তি হওয়া অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতারিতদের ক্ষতিপূরণ পুরোটা আদায় করা হয় না। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৩৮০টি অভিযোগের মধ্যে ৮৯টি (২৩ দশমিক ৪২ শতাংশ) অভিযোগের নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং প্রতারণার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর কাছ থেকে মোট ৮ লাখ ৯০ হাজার টাকা অর্থাৎ মাথাপিছু গড়ে ১০ হাজার টাকা আদায় করে অভিযোগকারীদের প্রদান করা হয়।

চিত্র ৪ : সুশাসনের নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ

নির্দেশক	উপনির্দেশক	সমস্যা
স্বচ্ছতা	• অভিবাসন-সংক্রান্ত তথ্যের সহজলভ্যতা • অভিবাসন-প্রক্রিয়া-সংক্রান্ত তথ্যের প্রকাশ	• অভিবাসন সম্পর্কে (ব্যয়, শর্ত, প্রক্রিয়া) প্রয়োজনীয় তথ্য সহজলভ্য নয় • অভিবাসন-সংক্রান্ত তথ্য সহজবোধ্যভাবে প্রকাশিত নয় • অভিবাসনের প্রকৃত ব্যয়ের দালিলিক প্রমাণ থাকে না
জবাবদিহি	• শ্রম অভিবাসন কার্যক্রমের শক্তিশালী তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ • অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় কাজের বিভাজন • সব অংশীজনের জবাবদিহি	• তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে ঘাটতি • একাধিক প্রতিষ্ঠানের একই ধরনের কাজ সম্পাদন • সব অংশীজনের জবাবদিহি নিশ্চিত না করা
সক্ষমতা ও কার্যকারিতা	• অভিবাসন ব্যবস্থাপনার জন্য সক্ষম ও কার্যকর কাঠামো • মসৃণ ও দ্রুত অভিবাসন-প্রক্রিয়া শ্রম অভিবাসনের স্বল্প ব্যয়	• জড়িত অংশীজনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি • জটিল, দীর্ঘ প্রক্রিয়া • অনানুষ্ঠানিক ব্যক্তিনির্ভর প্রক্রিয়া • উচ্চ ব্যয়সম্পন্ন প্রক্রিয়া
আইনের শাসন	• প্রয়োজনীয় আইনি ও নীতি কাঠামো • আইনের সুষ্ঠু ও ন্যায্য প্রয়োগ	• আইনি সীমাবদ্ধতা • আইনের প্রয়োগে সীমাবদ্ধতা • অভিবাসন-প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি ও অনিয়ম বিদ্যমান • ন্যায্য ও সঠিক ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা যায় না

৭. সার্বিক পর্যবেক্ষণ

গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যাচ্ছে শ্রম অভিবাসন-প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আইনি কাঠামোতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেমন অভিযোগ উত্থাপন, কর্মী বাছাই, ক্ষতিপূরণ আদায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা রয়েছে। এ ছাড়া আইনের প্রয়োগে কিছু সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান থাকার কারণে প্রত্যাশিত পর্যায়ে এখনো প্রয়োগ হচ্ছে না। অন্যদিকে শ্রম অভিবাসন-প্রক্রিয়া তদারকি ও নিয়ন্ত্রণে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে।

বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসন-প্রক্রিয়া দীর্ঘ, জটিল, অনিশ্চিত এবং এখনো প্রায় ঢাকাকেন্দ্রিক, যা এ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি ও অনিয়মের ঝুঁকি তৈরি করে। এ প্রক্রিয়া অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যক্তি ও প্রক্রিয়ানির্ভর, ফলে অভিবাসী কর্মীদের প্রতারিত ও বঞ্চিত হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়া

প্রতারিত হওয়ার পর প্রয়োজনীয় দালিলিক প্রমাণের অভাবে প্রাপ্য ও প্রকৃত ক্ষতিপূরণ পায় না। তথ্যের উন্মুক্ততার ক্ষেত্রেও ঘাটতি বিদ্যমান, যে কারণে গন্তব্য দেশে কর্মপরিবেশ, বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা, ভিসার মূল্য/ অভিবাসন ব্যয়ের খাত সম্পর্কে তথ্য অভিবাসী কর্মীর পক্ষে সহজে জানা সম্ভব হয় না এবং এর জন্য ওই কর্মী বেশি নির্ভর করেন দালালদের ওপর।

বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসন-প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতি বিদ্যমান। ভিসা প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে। এর সাথে অনিয়ন্ত্রিত ভিসা বাণিজ্যের ফলে অভিবাসন ব্যয় আরও বেড়ে যায় এবং অভিবাসী কর্মীর ওপর এই ব্যয়ভার পড়ে। ফলে প্রত্যাশিত পর্যায়ে অভিবাসনের সুফল পাওয়া যায় না। শ্রম অভিবাসনের উচ্চ ব্যয়ের কারণে কাজের জন্য অবৈধ পথে বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং বিদেশে অবৈধ হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।

চিত্র ৫ : একনজরে শ্রম অভিবাসন-প্রক্রিয়ায় সুশাসনের ঘাটতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাব

কারণ	ফলাফল	প্রভাব
• আইনি ও প্রায়োগিক সীমাবদ্ধতা • জটিল ও দীর্ঘ অভিবাসন-প্রক্রিয়া • প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি-অর্থ, জনবল • বিকেন্দ্রীকরণ, বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির ঘাটতি • অভিবাসী কর্মীর শিক্ষা, দক্ষতা ও সচেতনতার ঘাটতি • তথ্যসংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা • প্রকৃত ব্যয়-সংক্রান্ত দালিলিক প্রমাণের ঘাটতি	• অবৈধভাবে ভিসা বিক্রি • ভিসা কেনার জন্য অবৈধভাবে অর্থ পাচার • নিয়োগদাতার তথ্য যাচাই না করে ও অর্থের বিনিময়ে সত্যায়ন • বিকেন্দ্রীকরণ, বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির ঘাটতি • অভিবাসী কর্মীর শিক্ষা, দক্ষতা ও সচেতনতার ঘাটতি • তথ্যসংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা • প্রকৃত ব্যয়-সংক্রান্ত দালিলিক প্রমাণের ঘাটতি	• আইনি ও প্রায়োগিক সীমাবদ্ধতা • জটিল ও দীর্ঘ অভিবাসন-প্রক্রিয়া • প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি-অর্থ, জনবল • বিকেন্দ্রীকরণ, বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির ঘাটতি • অভিবাসী কর্মীর শিক্ষা, দক্ষতা ও সচেতনতার ঘাটতি • তথ্যসংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা • প্রকৃত ব্যয়-সংক্রান্ত দালিলিক প্রমাণের ঘাটতি

৬. সুপারিশ

গবেষণার পর্যবেক্ষণ ও ফলাফল থেকে শ্রম অভিবাসন-প্রক্রিয়ায় সুশাসন ও কার্যকর জবাবদিহির পরিবেশ সৃষ্টির জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশ প্রস্তাব করা হলো।

১. 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসন আইন ২০১৩'-এর নিম্নলিখিত সংস্কার করতে হবে :

- কর্মী বাছাই, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ, ক্ষতিপূরণ প্রদান ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট ধারাগুলো বাধ্যতামূলক করতে হবে;
- 'অন্য যেকোনো আইনে যা-ই থাকুক না কেন, শ্রম অভিবাসন-সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এই আইন অগ্রাধিকার পাবে।' এমন ধারা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

২. ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগৃহীত একক ভিসার জন্য বহির্গমন ছাড়পত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে বিএমইটি কর্তৃক ওয়ান স্টপ সেবা কার্যকর করতে হবে।

৩. বাংলাদেশ থেকে যেসব দেশে বেশি কর্মী যায়, সেসব দেশে কর্মসংস্থান তদারকির ক্ষেত্রে প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন শ্রম উইংয়ের সক্ষমতা (বাজেট, জনবল) ও দক্ষতা বাড়াতে হবে।

৪. দালালদের জবাবদিহির আওতায় আনার জন্য তাদের রিক্রুটিং এজেন্টদের সাব-এজেন্ট বা নিবন্ধিত প্রতিনিধি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার বিধান করতে হবে।

৫. সরকারনির্ধারিত অভিবাসন ব্যয়ের ন্যূনতম পাঁচ গুণ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৬. দলীয় ভিসা প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নেওয়ার ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে।

৭. অভিবাসী কর্মীর ছবি ও ফিঙ্গার প্রিন্ট নেওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তথ্য বিনিময়ে কার্যকর সমন্বয় করতে হবে।

৮. সব গন্তব্য দেশের ভিসা অনলাইন চেকিংয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিতে সরকারের কূটনৈতিক পদক্ষেপ জোরদার করতে হবে।

৯. সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীদের সচেতনতা বাড়ানোর জন্য–

- শ্রম অভিবাসনের বিভিন্ন বিষয়, যেমন বিদেশে কাজের ধরন, সরকারনির্ধারিত অভিবাসনের ব্যয়, অভিবাসনের বৈধ প্রক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য সহজলভ্য করতে হবে;
- তৃণমূল পর্যায়ে শ্রম অভিবাসন-সংক্রান্ত প্রচার-প্রচারণা (রেডিও, টেলিভিশনে সম্প্রচার, তথ্যমেলা, পথনাটক) বাড়াতে হবে;
- মন্ত্রণালয়, বিএমইটি, বোয়েসেল ও বায়রার ওয়েবসাইটে অভিবাসীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এমন তথ্য (যেমন বিদেশে কাজের ধরন, সরকারনির্ধারিত অভিবাসনের ব্যয়, অভিবাসনের বৈধ প্রক্রিয়া) সহজভাবে পরিবেশন করতে হবে।

তথ্যসূত্র

রামরু, 'বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসনের গতি-প্রকৃতি ২০১৬ : সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রবন্ধ, ২৮ ডিসেম্বর ২০১৬।

IOM, 2015, 'Migration Governance Framework', IOM Council 106th Session.

McKinsey Global Institute, 2016, People on the Move: Global Migrations's Impact and Opportunity, http://www.mckinsey.com/global-themes/employent-and-growth/-goal-migrations-impact-and-opportunity

S. A. Purvez, S. B. Islam, M. M. Islam, 2016, Irregular Labour Migration from Bangladesh: Crises and Ways Forward, Manusher Jonno Foundation (MJF), Dhaka, Bangladesh.

Syeda Rozana Rashid, ASM Ali Ashraf, 2016, 'Asian Boat People and the Challenges of Migration Governance: A Source Country Perspective', Middle East Institute.http://www.mei.edu/content/map/asian-boat-peole-and-challenges-migration-governance-source-country-perspective (7 February 2017)

The Economist Intelligence Unit. 2016. Measuring well-governed migration: The 2016 Migration Governance Index, The Economist Intelligence Unit, London.

পাসপোর্ট সেবায় সুশাসন : চ্যালেঞ্জ ও করণীয়*

মো. শাহনূর রহমান

১. প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

পাসপোর্ট সেবাকে একটি জনগুরুত্বপূর্ণ সেবা খাত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই সেবা জনশক্তি রপ্তানি, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, চিকিৎসা ও বিদেশ ভ্রমণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। বিগত বছরগুলোতে আমাদের দেশে মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে জনশক্তি রপ্তানি, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, উন্নত দেশগুলোতে অভিবাসন, শিক্ষা, চিকিৎসা ও ভ্রমণের জন্য পাসপোর্টের চাহিদা অনেক বেড়েছে। পাসপোর্ট সেবায় আবেদনকারীদের নির্দিষ্ট অঙ্কের ফি প্রদান করতে হয়। ফলে এ সেবার মাধ্যমে সরকার প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রাজস্ব আহরণ করে থাকে। পাসপোর্ট খাত থেকে সরকার ২০১০-১১ হতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে গড়ে বছরপ্রতি ১ হাজার ১০০ কোটি টাকার রাজস্ব আহরণ করেছে।

পাসপোর্ট সেবায় নির্দিষ্ট অঙ্কের ফি ছাড়াও বিভিন্ন অনিয়ম, হয়রানি ও দুর্নীতির কারণে আবেদনকারীদের বিভিন্ন পর্যায়ে অতিরিক্ত ব্যয় বহনে বাধ্য হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) কর্তৃক ২০০৬ সালের পাসপোর্ট সেবা-সংক্রান্ত গবেষণায় এ সেবায় প্রক্রিয়াগত জটিলতা, সেবার মান, অবকাঠামো ও জনবল সমস্যা, দালালের দৌরাত্ম্য, পুলিশি তদন্তে অনিয়ম ও দুর্নীতি এ খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অন্যতম প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত হয়। এ ছাড়া টিআইবি কর্তৃক ২০১৪-১৫ সালে পরিচালিত 'সেবা খাতে দুর্নীতি : জাতীয় খানা জরিপ-২০১৫' শীর্ষক জরিপে পাসপোর্ট সেবা সর্বোচ্চ দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত হয়। যেখানে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সেবা খাতের মধ্যে পাসপোর্ট সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে ৭৭ দশমিক ৭ শতাংশ খানা অনিয়ম, হয়রানি ও দুর্নীতির শিকার হয় এবং তাদের ৭৬ দশমিক ১ শতাংশ খানাকে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ প্রদান করতে হয়েছে।

পাসপোর্ট সেবা জনমুখী ও সহজীকরণে বিগত সময়ে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে (২০১০-১৫) বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এসব পদক্ষেপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : পাসপোর্ট সেবার বিকেন্দ্রীকরণ– ৬৪টি জেলায় পাসপোর্ট অফিস স্থাপন, মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট ব্যবস্থা প্রবর্তন, অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণের ব্যবস্থা, সরকারি ব্যাংকের পাশাপাশি বেসরকারি ব্যাংককে ফি জমাদানে অন্তর্ভুক্তকরণ উল্লেখযোগ্য। উল্লিখিত পদক্ষেপগুলোর ফলে পাসপোর্ট সেবা খাতে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটলেও এখনো পাসপোর্ট সেবায় নানাবিধ সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান এবং এ-সম্পর্কিত প্রতিবেদন বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। টিআইবি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা

---

*২০১৭ সালের ২১ আগস্ট টিআইবির সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

ও জবাবদিহি বৃদ্ধিতে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের চাহিদার ভিত্তিতে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ ধারাবাহিকতায় টিআইবির 'সেবা খাতে দুর্নীতি : জাতীয় খানা জরিপ-২০১৫' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশের পর টিআইবি এবং ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মধ্যে পাসপোর্ট সেবার মান উন্নয়ন, অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধবিষয়ক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় উভয়ের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে পাসপোর্ট সেবায় বিদ্যমান সমস্যা ও সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য বর্তমান গবেষণাটি হাতে নেওয়া হয়। টিআইবি আশা করে বর্তমান গবেষণাটি এ সেবার মান উন্নয়ন, সংস্কার কার্যক্রমগুলো টেকসইকরণ ও দুর্নীতি প্রতিরোধে ভূমিকা রাখবে।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

পাসপোর্ট সেবায় সুশাসন নিশ্চিতকরণে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা ও সেগুলো থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রদান করা এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য। এ ছাড়া সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে :

- পাসপোর্ট সেবার বিভিন্ন ধাপে বিদ্যমান সমস্যা পর্যালোচনার পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ নিরূপণ করা এবং
- পাসপোর্ট সেবায় অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা চিহ্নিত করা।

এই গবেষণায় পাসপোর্ট প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন ধাপে যেমন : আবেদনপত্র উত্তোলন, আবেদনপত্র পূরণ, ব্যাংকে ফি জমাদান, আবেদনপত্র জমাদান ও প্রি-এনরোলমেন্ট, বায়ো-এনরোলমেন্ট, ডকুমেন্ট স্ক্যানিং, পুলিশ প্রতিবেদন, আবেদন ফি যাচাই, আবেদনপত্র অনুমোদন, পাসপোর্ট মুদ্রণ ও আঞ্চলিক অফিসে প্রেরণ এবং পাসপোর্ট বিতরণে ভূমিকা অনুযায়ী ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, সেবাগ্রহীতা, ব্যাংক, এসবি পুলিশ এবং দালালের ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া পাসপোর্ট সেবায় আলোচনার ক্ষেত্রে সুশাসনের বিভিন্ন নির্দেশকের (সক্ষমতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, সংবেদনশীলতা ও শুদ্ধাচার) ওপর ভিত্তি করে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ গবেষণায় প্রাপ্ত অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সব কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং অংশীজনের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, তবে এটি পাসপোর্ট সেবায় চলমান সমস্যা, সীমাবদ্ধতা এবং অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়।

৩. গবেষণাপদ্ধতি

এটি একটি মিশ্র (গুণগত ও পরিমাণগত) গবেষণা। গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি হিসেবে সেবাগ্রহীতা জরিপ, মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, নিবিড় সাক্ষাৎকার, দলগত আলোচনা, কেস স্টাডি এবং পর্যবেক্ষণ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের উৎসগুলো হলো—সেবাগ্রহীতা, পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী (কেন্দ্রীয়, বিভাগীয় ও আঞ্চলিক কার্যালয়), এমআরপি প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, পুলিশ কর্মকর্তা-কর্মচারী (স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ), সাংবাদিক, দালাল ও নিরাপত্তা প্রহরী/আনসার। পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে পাসপোর্ট সেবাবিষয়ক প্রবন্ধ, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন, গণমাধ্যমে

প্রকাশিত সংবাদ বিশ্লেষণ ও সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই গবেষণা কার্যক্রমটি সেপ্টেম্বর ২০১৬ থেকে মে ২০১৭ সময়ের মধ্যে পরিচালিত হয়। এর মধ্যে সেবাগ্রহীতা জরিপটি ৮ নভেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর ২০১৬ সময়ের মধ্যে পরিচালিত হয়েছে।

সেবাগ্রহীতা জরিপে বহু স্তরায়িত নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে জরিপকালীন দেশের ৬৭টি পাসপোর্ট অফিসের মধ্যে বিভাগ অনুপাতে দৈবচয়নের ভিত্তিতে ২৬টি পাসপোর্ট অফিস নির্বাচন করা হয়। এরপর নির্বাচিত প্রতিটি অফিসের মাসিক ২০টি কর্মদিবসের মধ্যে ৫টি কর্মদিবস দৈবচয়িতভাবে নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত কর্মদিবসগুলোতে প্রতিটি অফিস থেকে এক্সিট পোল (Exit Poll) পদ্ধতির স্বীকৃত ধাপ অনুসরণে জেলা ও বিভাগভিত্তিক ৪০-৭০ জন সেবাগ্রহীতার ওপর জরিপ পরিচালনা করা হয়। চূড়ান্তভাবে উল্লিখিত দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নির্বাচিত মোট ১ হাজার ৪৫৩ জন সেবাগ্রহীতার ওপর জরিপটি পরিচালিত হয়। জরিপের ক্ষেত্রে একটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয়েছে।

৪. গবেষণার ফলাফল

৪.১ পাসপোর্ট সেবার বিভিন্ন ধাপে সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ

একটি পাসপোর্ট প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি ধাপ বা পর্যায় রয়েছে। এগুলো হলো আবেদনপত্র উত্তোলন, আবেদনপত্র পূরণ, ব্যাংকে ফি জমাদান, আবেদনপত্র জমাদান ও প্রি-এনরোলমেন্ট, বায়ো-এনরোলমেন্ট, ডকুমেন্ট স্ক্যানিং, পুলিশ প্রতিবেদন, আবেদন ফি যাচাই, আবেদনপত্র অনুমোদন, পাসপোর্ট মুদ্রণ ও আঞ্চলিক অফিসে মুদ্রণকৃত পাসপোর্ট প্রেরণ এবং পাসপোট বিতরণ। এই ধাপগুলোতে কাজের ধরন বা ভূমিকা অনুযায়ী সেবাগ্রহীতা, পাসপোর্ট অফিস, ব্যাংক এবং এসবি পুলিশের ভূমিকা রয়েছে। নিচে পাসপোর্ট প্রক্রিয়াকরণের এসব ধাপে সমস্যা, সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ আলোচনা করা হলো।

৪.১.১ আবেদনপত্র সংগ্রহ

জরিপকৃত সেবাগ্রহীতাদের ৫৪ শতাংশ আনুষ্ঠানিক উৎস (যেমন : ৩৬ শতাংশ পাসপোর্ট অফিস, ১০ শতাংশ সরাসরি ওয়েবসাইট ও ৮ শতাংশ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার) থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করেছে। অপরদিকে ৪৬ শতাংশ অনানুষ্ঠানিক উৎস (যেমন : ২৫ শতাংশ ফটোকপির দোকান, ১৯ শতাংশ দালাল ও ২ শতাংশ আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব) থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করেছে। নিয়মানুযায়ী পাসপোর্ট অফিস থেকে আবেদনকারীদের দুই কপি আবেদনপত্র বিনা মূল্যে সরবরাহ করার বিধান রয়েছে। কিন্তু পাসপোর্ট অফিসগুলো সাধারণত দুটির পরিবর্তে একটি আবেদনপত্র সরবরাহ করে থাকে এবং অপরটি ফটোকপি করে নেওয়ার পরামর্শ দেয়। এর ফলে অনানুষ্ঠানিক উৎস থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে গিয়ে আবেদনকারীদের একাংশের দালালের সাথে যোগাযোগের একটি ঝুঁকি তৈরি হয়। অপরদিকে আবেদনপত্র সংগ্রহে আনুষ্ঠানিক উৎসের মধ্যে ওয়েবসাইট ও ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) এখনো জনপ্রিয় না হওয়ায় এসব উৎস থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহের হার তুলনামূলক কম।

৪.১.২ ব্যাংকে পাসপোর্ট ফি জমাদান ও ব্যাংক ফি যাচাই

আবেদনকারী কর্তৃক নিজে ব্যাংকে পাসপোর্ট ফি জমাদানে শিথিলতা ও সচেতনতার অভাব পাসপোর্ট সেবায় একটি সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়। এ ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের একাংশ নিজে পাসপোর্ট ফি জমা না দিয়ে দালাল বা অপরিচিত ব্যক্তির সাহায্য নেওয়ার প্রবণতা লক্ষণীয়। আবেদন ফি নিজে জমা না দেওয়ায় অনেক সময় আবেদনের সপক্ষে ব্যাংকে জমাকৃত টাকার রসিদের সাথে আবেদনপত্রের নামের পার্থক্য বা নামের বানান ভুল হয়ে থাকে। এর ফলে পাসপোর্ট অফিস কর্তৃক ব্যাংক স্ক্রল যাচাইয়ে জটিলতা তৈরি হয়। আবার সোনালী ব্যাংকের কোনো কোনো শাখা থেকে প্রতিদিনের ফি জমাদানের স্ক্রলশিট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না পাঠানোর কারণে আঞ্চলিক অফিসগুলোতে পাসপোর্ট প্রক্রিয়াকরণ বিলম্বিত হয়ে থাকে। এ ছাড়া সোনালী ব্যাংকের পাশাপাশি অনলাইনে ৫টি বেসরকারি ব্যাংকে ফি জমাদানের সুযোগ থাকলেও তা ব্যবহারে আবেদনকারীদের সচেতনতার ঘাটতি রয়েছে। এ কারণে সরকারি ব্যাংকের কিছু শাখায়, বিশেষত পাসপোর্ট অফিসগুলোর নিকটবর্তী শাখায় আবেদনকারীদের অতিরিক্ত ভিড় হয়ে থাকে।

৪.১.৩ আবেদনপত্র পূরণ

অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণে সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। আবেদনকারীদের একাংশের মতে, অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ ব্যবহারবান্ধব নয়। এ ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের অভিজ্ঞতা মতে, অনলাইন আবেদনে সংশ্লিষ্ট লিংক সব সময় কাজ না করা, ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ভিন্ন ভিন্ন লিংকে থাকা এবং লিংকগুলোতে পর্যাপ্ত তথ্যের ঘাটতি, নির্দেশনাবলির কিছু অংশ বাংলায় এবং কিছু অংশ ইংরেজিতে থাকা, অনলাইনে 'পেশা' ঘরটিতে কিছু ক্ষেত্রে সম্ভাব্য শ্রেণিবিন্যাসের অনুপস্থিতি উল্লেখযোগ্য। অপরদিকে অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ সত্ত্বেও সত্যায়ন ও প্রত্যয়নের প্রয়োজনে পাসপোর্ট অফিসে প্রিন্ট কপি জমা দেওয়ার বিধান এবং হাতে লিখে আবেদনের ক্ষেত্রে দুই কপি আবেদনপত্র পূরণ এবং দুটি কপিতেই সত্যায়ন ও প্রত্যয়নের বিধান আবেদনকারীদের কাছে একটি ঝামেলাযুক্ত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে আবেদনপত্র একটি পূরণ করে অপরটি যে ফটোকপি করা যায়, এ বিষয়ে আবেদনপত্রের হার্ডকপিতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনার অভাব রয়েছে। সেবাগ্রহীতা জরিপে আবেদনকারীদের একটি বড় অংশ (৮৬ শতাংশ) হাতে লিখে আবেদনপত্র পূরণ করেছে, ১৪ শতাংশ অনলাইনে পূরণ করেছে। অপরদিকে অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ না করার কারণ হিসেবে আবেদনকারীরা একাধিক উত্তর প্রদান করেছেন। এ ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের ৪৭ শতাংশ অনলাইনে আবেদন করা যায় তা জানে না, ৩১ শতাংশ অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ ঝামেলাপূর্ণ মনে করে, ৩০ শতাংশ অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতি সম্পর্কে না জানা, ৬ শতাংশ ইন্টারনেট সুবিধা না থাকা এবং ২ শতাংশ অতিরিক্ত খরচ এড়ানোর কথা উল্লেখ করেছে।

৪.১.৪ আবেদনপত্র সত্যায়ন ও প্রত্যয়ন

পাসপোর্ট আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণে বিদ্যমান সত্যায়ন ও প্রত্যয়ন ব্যবস্থা আবেদনকারীদের জন্য একটি হয়রানির বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়া সত্যায়ন ও প্রত্যয়ন ব্যবস্থা সেবায় অনিয়ম ও দুর্নীতিকে উৎসাহিত করছে। সাধারণত গ্রাম থেকে আসা আবেদনকারীদের অনেকেরই শহর এলাকায় পরিচিত সত্যায়নকারী থাকে না। এর ফলে তাদের সত্যায়ন ও প্রত্যয়নের প্রয়োজনে

দালালের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। আবার সত্যায়নের ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের দালালের ওপর নির্ভরশীলতার কারণে সত্যায়নকারীদের একাংশ তাদের সত্যায়ন ক্ষমতাকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করে থাকে।

৪.১.৫ আবেদনপত্র জমাদান ও পাসপোর্ট অফিস কর্তৃক যাচাই-বাছাই

আবেদনপত্র জমাদানে দীর্ঘ লাইন ও জমাদানের ক্ষেত্রে পাসপোর্ট অফিসগুলোর কর্মচারীদের একাংশ কর্তৃক আবেদনকারীদের হয়রানি সুষ্ঠুভাবে আবেদনপত্র জমাদান প্রক্রিয়া ব্যাহত করে। যেসব অফিসে পাসপোর্ট ইস্যুর হার বেশি, সেখানে মূলত জমাদানের ক্ষেত্রে দীর্ঘ লাইন সমস্যাটি প্রকট আকার ধারণ করে থাকে। পাসপোর্ট অফিস কর্তৃক আবেদনপত্র যাচাই-বাছাইকালীন অফিসগুলোর কর্মচারীদের একাংশ কর্তৃক সাধারণ সেবাগ্রহীতাদের হয়রানি করার অভিযোগ রয়েছে। যেমন জমাদান কাউন্টার থেকে বিভিন্ন ধরনের অযাচিত ভুল ধরা, কী ধরনের ভুল হয়েছে তা না জানিয়ে নতুন আবেদনপত্র পূরণের পরামর্শ দেওয়া, নতুন করে আবেদনপত্র পূরণ করে জমা দেওয়ার পর আবার নতুন করে ভুল ধরা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৪.১.৬ প্রি-এনরোলমেন্ট ও বায়ো-এনরোলমেন্ট

পাসপোর্ট সেবায় আবেদনকারীদের প্রি-এনরোলমেন্ট ও বায়ো-এনরোলমেন্টে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা একটি সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়। এ ক্ষেত্রে পাসপোর্ট অফিসগুলোর একাংশের পর্যাপ্ত ওয়ার্ক স্টেশন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী অপারেটরের অভাব লক্ষণীয়। আইসিএওর গাইডলাইন অনুযায়ী একজন অপারেটরের পক্ষে এক দিনে সর্বোচ্চ ৪০টি প্রি-এনরোলমেন্ট ও বায়ো-এনরোলমেন্ট করা সম্ভব বলে মনে করা হয়। কিন্তু পাসপোর্ট অফিসগুলোর একাংশের কাজের চাপে প্রতিদিন গড়ে ৪০টির স্থলে ক্ষেত্রবিশেষে একজন অপারেটরকে দ্বিগুণ বা তিন গুণ পর্যন্ত এনরোলমেন্ট করতে হয়। এর ফলে মাত্রাতিরিক্ত কাজের চাপে অপারেটরদের স্বাভাবিক কাজে ব্যাঘাত ঘটে এবং প্রি-এনরোলমেন্টে প্রদর্শিত তথ্যাবলি অপারেটর কর্তৃক পুনরায় যাচাই করা সম্ভব হয় না।

৪.১.৭ ডকুমেন্ট স্ক্যানিং

ডকুমেন্ট স্ক্যানিংয়ে পাসপোর্ট অফিসগুলোর একাংশের সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা লক্ষণীয়। যেসব অফিসে অতিরিক্ত আবেদনপত্র জমা হয়, সেসব জায়গায় আবেদনপত্র জমার বিপরীতে স্ক্যানিং শাখায় পর্যাপ্ত অপারেটরের ঘাটতি এবং স্ক্যানারের স্বল্পতা রয়েছে। এর ফলে সময়মতো ডকুমেন্ট স্ক্যান করে সিস্টেমে আপলোডে বিলম্ব হয়ে থাকে।

৪.১.৮ পুলিশ প্রতিবেদন

পাসপোর্ট সেবায় নতুন পাসপোর্টে আবেদনে পুলিশ প্রতিবেদন ব্যবস্থা সাধারণ আবেদনকারীদের হয়রানি ও দুর্নীতির শিকার হওয়ার একটি অন্যতম মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেবাগ্রহীতা জরিপে, নতুন পাসপোর্ট আবেদনে সেবাগ্রহীতাদের ৭৬ দশমিক ২ শতাংশ পুলিশি তদন্তে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে এবং ৭৫ দশমিক ৩ শতাংশকে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে। অপরদিকে পুলিশ প্রতিবেদন প্রণয়নে এসবি পুলিশ কর্তৃক আবেদনকারীদের হয়রানি করার

অভিযোগ রয়েছে। যেমন : আবেদনপত্রে অযথা ত্রুটি খুঁজে বের করার চেষ্টা, আবেদনকারীদের জঙ্গি কার্যক্রম বা অন্য রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ততার ভয় দেখানো, বাড়িতে না এসে চায়ের দোকান বা থানায় ডেকে পাঠানো, নিয়মবহির্ভূত অর্থ বা ঘুষ দাবি করা এবং ক্ষেত্রবিশেষে তা বিকাশের মাধ্যমে পাঠাতে বলা ইত্যাদি। পাসপোর্ট অফিস ও এসবি অফিসের মধ্যে পুলিশ প্রতিবেদন-সংক্রান্ত তথ্যাদি আদান-প্রদানে সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। এ ক্ষেত্রে পাসপোর্ট অফিস থেকে অনলাইনে আবেদনকারীর তথ্যাদি পাঠানো হলেও এসবি অফিসগুলোর একাংশ থেকে প্রতিবেদন অনলাইনে প্রেরণের ঘাটতি রয়েছে। আবার কিছু এসবি অফিস থেকে অনলাইনে প্রেরণ করা হলেও তা দেরি করে পাঠানো হয়। এর ফলে পাসপোর্ট প্রক্রিয়াকরণ বিলম্বিত হয়ে থাকে। অপরদিকে এসবি পুলিশ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মতে, প্রতিবেদন অনলাইনে পাঠানোর ক্ষেত্রে তারা কিছু কারিগরি সমস্যার সম্মুখীন হন। যেমন অনলাইনে সংশ্লিষ্ট লিংক সব সময় কাজ না করা, অনলাইনে পাঠানোর জন্য এমআরপি প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত যন্ত্রাংশ বিকল থাকা এবং এগুলোর কারিগরি সমস্যা সমাধানে পাসপোর্ট অফিসের সময়মতো সাড়াদানের ঘাটতি উল্লেখযোগ্য। অপরদিকে পুলিশ প্রতিবেদন-সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা নিরসনে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের সাথে আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসগুলোর প্রতি ৩ মাস পরপর সমন্বয় সভা করার নিয়ম থাকলেও বাস্তব ক্ষেত্রে এটি করা হয় না।

৪.১.৯ মুদ্রণকৃত পাসপোর্ট আঞ্চলিক অফিসে প্রেরণ

মুদ্রণকৃত পাসপোর্ট আঞ্চলিক অফিসগুলোর একাংশে প্রেরণের ক্ষেত্রে বিলম্ব লক্ষণীয়। অনেক সময় অর্থ সাশ্রয় করতে গিয়ে এ ধরনের বিলম্ব তৈরি হয়। আঞ্চলিক অফিসগুলোর মধ্যে যেসব অফিসের পাসপোর্টের চাহিদা কম, তাদের গড়ে প্রতিদিন ৪-৫টি পাসপোর্ট মুদ্রণ হয়। প্রতিদিনের মুদ্রিত পাসপোর্ট প্রতিদিন পাঠানোর নিয়ম থাকলেও খরচের কথা বিবেচনা করে তা না পাঠিয়ে কয়েক দিনের পাসপোর্ট একসাথে জমিয়ে প্রেরণ করা হয়। এর কারণ হিসেবে পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষ ১০০টি পাসপোর্ট ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যাগের মূল্য, প্রেরণ খরচ সাশ্রয়ী হয় না বলে দাবি করে। অপরদিকে সরকারি ডাকব্যবস্থার পদ্ধতিগত জটিলতার কারণেও দেশের অভ্যন্তরে কিছু দূরবর্তী অফিসে পাসপোর্ট প্রেরণে বিলম্ব হয়ে থাকে।

৪.১.১০ পাসপোর্ট বিতরণ

জরিপে ২৭ শতাংশ সেবাগ্রহীতার বিতরণ স্লিপের নির্ধারিত তারিখে পাসপোর্ট পেতে বিলম্ব হয়েছে এবং তাদের গড়ে ১২ দিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। এ ছাড়া তাদের অপেক্ষার সময় বিশ্লেষণে দেখা যায়, তাদের ৪৪ দশমিক ৮ শতাংশ সাত দিন পর্যন্ত, ২৫ দশমিক ৪ শতাংশ ৮ থকে ১৪ দিন পর্যন্ত, ১৪ দশমিক ৫ শতাংশ ১৫ থেকে ২১ দিন পর্যন্ত, ১০ দশমিক ৯ শতাংশ ২২ থেকে ৩০ দিন পর্যন্ত এবং ৪ দশমিক ৪ শতাংশকে ৩১ দিন তদূর্ধ্ব সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে। অপরদিকে অপেক্ষার কারণ হিসেবে তাদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী ৩৭ দশমিক ৩ শতাংশ উল্লেখ করেছে, 'কর্তৃপক্ষ বলেছে ঢাকা থেকে পাসপোর্ট আসেনি', ১৩ দশমিক ৭ শতাংশ 'পুলিশি তদন্ত রিপোর্ট না আসা' উল্লেখ করেছেন, ২ দশমিক ৩ শতাংশ 'সার্ভারের সমস্যা' উল্লেখ করেছেন এবং ৫৭ শতাংশ 'বিলম্বের কারণ জানেন না' উল্লেখ করেছেন।

৪.২ পাসপোর্ট সেবায় দালালের দৌরাত্ম্য

পাসপোর্ট সেবায় মধ্যস্থতাকারী হিসেবে একশ্রেণির ব্যক্তি কাজ করে থাকে, যারা স্থানীয়ভাবে দালাল হিসেবে পরিচিত। পাসপোর্ট অফিসগুলোর প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই দালালরা পাসপোর্ট সেবার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছে। এই গবেষণায় জরিপের আওতাভুক্ত প্রায় সব পাসপোর্ট অফিসেই (অফিস অভ্যন্তরে অথবা অফিসের বাইরে) দালালের উপস্থিতি লক্ষণীয়। দালালরা সাধারণত পাসপোর্টের প্রার্থীদের ঝামেলামুক্ত, ভোগান্তিহীন ও দ্রুততার সাথে পাসপোর্ট প্রদান করার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। পাসপোর্ট অফিসের সাথে সম্পৃক্ত দালালের একাংশ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং স্থানীয় প্রভাবশালীদের ছত্রচ্ছায়ায় তাদের দৌরাত্ম্য বজায় রাখে। তারা এসবি পুলিশ এবং পাসপোর্ট অফিসের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। পাসপোর্ট আবেদনকারীদের কাছ থেকে তারা যে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করে, তার একটি অংশ পাসপোর্ট অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও এসবি পুলিশের একাংশকে প্রদান করে। একটি পাসপোর্ট অফিসকে কেন্দ্র করে দালালদের মধ্যে এলাকাভিত্তিক যোগাযোগ বা নেটওয়ার্ক থাকে। এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আবেদনকারীদের একাংশ দালালের কাছে আসে। এ ছাড়া পাসপোর্ট অফিসের কর্মচারীদের একাংশ স্থানীয় হওয়ার কারণে তাদের মাধ্যমেও কিছু সেবাগ্রহীতা সহযোগিতার জন্য তাদের কাছে আসেন বলে দালালরা উল্লেখ করেছে।

সেবাগ্রহীতাদের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী কিছু পাসপোর্ট অফিসে দালালের সহযোগিতা ছাড়া আবেদনপত্র জমাদানে হয়রানি ও ভোগান্তির শিকার হতে হয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে আবেদনপত্র জমা না নিয়ে দালালের মাধ্যমে আসার জন্য সরাসরি বলা হয়। জরিপকৃত সেবাগ্রহীতাদের ৪১ দশমিক ৭ শতাংশ দালাল বা অন্যের সহযোগিতা নিয়েছেন এবং তাদের ৮০ শতাংশ দালালের সহযোগিতা নেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। আবেদনকারীদের দালালের সহায়তা নেওয়ার ক্ষেত্রে ভিন্নতা লক্ষণীয়। দালালের সহায়তা নেওয়ার ক্ষেত্রে ৮২ শতাংশ পুরো কাজটি সম্পন্ন করতে চুক্তি করেছেন এবং ১৮ শতাংশ আংশিক চুক্তি করেছেন। অপরদিকে আবেদনকারীদের মধ্যে যারা দালালের সহযোগিতা নিয়েছেন তার কারণ ব্যক্তিবিশেষে ভিন্নতর। যারা সহযোগিতা নিয়েছেন তাদের ৬১ দশমিক ৪ শতাংশ বিভিন্ন ঝামেলা ও ভোগান্তি, যেমন দীর্ঘ লাইন, একাধিকবার আসা ইত্যাদি এড়িয়ে চলার জন্য, ৫১ দশমিক ৩ শতাংশ পাসপোর্ট সেবার নিয়মকানুন সম্পর্কে না জানার কারণে, ২১ দশমিক ৬ শতাংশ দালালের সহযোগিতা ছাড়া আবেদনপত্র জমা দিলে কর্তৃপক্ষ জমা নেয় না, ৬ দশমিক ১ শতাংশ নির্ধারিত সময়ের আগে পাসপোর্ট পাওয়ার জন্য, ৫ দশমিক ৭ শতাংশ পুলিশি তদন্তে হয়রানি এড়ানোর জন্য এবং ৫ দশমিক ৯ শতাংশ সময়ের অভাবে সহযোগিতা গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছেন।

দালালরা নির্দিষ্ট সময়ের আগে পাসপোর্ট প্রদানে আবেদনকারীদের সহায়তা করতে পারে বলে দাবি করলেও এ গবেষণায় দেখা যায়, দালালের সহযোগিতা গ্রহণ ও সময়মতো পাসপোর্ট পাওয়ার মধ্যে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্ক নেই। জরিপকৃত সেবাগ্রহীতার মধ্যে যারা দালালের সহযোগিতা নিয়েছেন, তাদের ৭৫ দশমিক ১ শতাংশ সময়মতো পাসপোর্ট পেয়েছেন। অপরদিকে যারা দালালের সহযোগিতা নেননি, তাদের ৭২ দশমিক ২ শতাংশ সময়মতো পাসপোর্ট পেয়েছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে দালালের সহযোগিতা গ্রহণ করলে যে একজন আবেদনকারী পাসপোর্ট সময়মতো পেয়ে থাকেন, এ কথা বলা যায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আবেদনকারীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ দালালের সহযোগিতা নিয়েছেন।

৪.৩ পাসপোর্ট সেবায় অনিয়ম, হয়রানি ও দুর্নীতি

জরিপের অন্তর্ভুক্ত সেবাগ্রহীতাদের ৫৫ দশমিক ২ শতাংশ পাসপোর্ট সেবায় (আবেদনপত্র উত্তোলন, আবেদনপত্র জমাদান ও প্রি-এনরোলমেন্ট, বায়ো-এনরোলমেন্ট, পাসপোর্ট বিতরণ এবং দালালের সাথে চুক্তি) অনিয়ম, হয়রানি ও দুর্নীতির শিকার হয়েছেন। অনিয়ম, হয়রানি ও দুর্নীতির ধরন বিশ্লেষণে দেখা যায় সেবাগ্রহীতাদের ৩৫ দশমিক ৩ শতাংশ নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়া, ২৭ শতাংশ সময়ক্ষেপণ, ২ দশমিক ৩ শতাংশ দায়িত্ব পালনে অবহেলা এবং শূন্য দশমিক ১ শতাংশ প্রতারণার শিকার হয়েছেন। পাসপোর্ট অফিসের সেবায় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার গড় পরিমাণ ২ হাজার ২২১ টাকা। এ ছাড়া পাসপোর্ট সেবায় শুধু পুলিশি তদন্তে (নতুন পাসপোর্ট আবেদনে) সেবাগ্রহীতাদের ৭৬ দশমিক ২ শতাংশ অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছেন এবং ৭৫ দশমিক ৩ শতাংশকে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে। ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ হিসেবে গড়ে ৭৯৭ টাকা দিতে হয়েছে।

৪.৪ পাসপোর্ট অফিসের প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ

৪.৪.১ কাজের চাপ ও প্রয়োজন অনুযায়ী জনবলের ঘাটতি

পাসপোর্ট সেবায় কাজের চাপ বৃদ্ধির সাথে জনবল বৃদ্ধির অপ্রতুলতা লক্ষণীয়। জেলা পর্যায়ে পাসপোর্ট অফিসের বিকেন্দ্রীকরণ এবং এমআরপি ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে আগের তুলনায় কাজ বহুলাংশে বৃদ্ধি পেলেও এর সাথে সংগতি রেখে জনবল বৃদ্ধি করা হয়নি। বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে জনবল রয়েছে ১ হাজার ১৮৪ জন কিন্তু পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রাক্কলন অনুযায়ী বিদ্যমান জনবলের বাইরে আরও ৪ হাজার ৭৪৮ জন জনবল প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বরাবর ২০১৬ সালে জনবলের একটি সাংগঠনিক কাঠামো প্রস্তাব করা হয়েছে, যা যাচাই-বাছাই পর্যায়ে রয়েছে। অপরদিকে বিদ্যমান জনবল কাঠামোর বিভিন্ন পর্যায়ে বর্তমানে ৯ শতাংশ পদ শূন্য রয়েছে। এর মধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ থেকে ১০০ ভাগ পদোন্নতির মাধ্যমে শূন্য পদ পূরণের নিয়ম থাকলেও প্রশাসনিক জটিলতার কারণে তা সম্ভব হয়নি। জনবল ঘাটতির কারণে ৪টি বিভাগীয় অফিসে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও খুলনা) পরিচালকের পদ থাকলেও তা পূরণ করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে শুধু ঢাকা বিভাগীয় অফিসে একজন পরিচালক কর্মরত আছেন। অপরদিকে টেকনিক্যাল পদগুলোতে (বিশেষত সাব-অ্যাসিসট্যান্ট মেইন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, সাব-অ্যাসিসট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, কম্পিউটার অপারেটর ইত্যাদি) চাহিদার তুলনায় জনবলের ঘাটতির কারণে মেইনটেন্যান্স কার্যক্রম, সাপোর্ট সেন্টার, ডেটা সেন্টার, নেটওয়ার্কিং সেন্টার, সিআই শাখাসহ বিভিন্ন শাখায় স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়।

৪.৪.২ অবকাঠামো ও লজিস্টিকস সাপোর্টের ঘাটতি

পাসপোর্ট অফিসগুলোর একাংশের (বিশেষত ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ ইত্যাদি) পাসপোর্টের চাহিদানুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক কার্যালয় বা শাখা অফিস না থাকায় অফিসগুলোর পক্ষে আবেদনকারীদের সুষ্ঠু সেবাদান কঠিন হয়ে পড়ে। অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে এসব অফিসে দীর্ঘ লাইন তৈরি হয় এবং সেবাগ্রহীতারা বিভিন্ন ধরনের বিড়ম্বনা ও হয়রানির

শিকার হন। এ ছাড়া পাসপোর্ট অফিসগুলোর একাংশের অবকাঠামোগত সমস্যা বিদ্যমান। বর্তমানে আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসগুলোর মধ্যে ৩৪টি ভাড়া করা ভবনে অবস্থিত। এ অফিসগুলোর মধ্যে কিছু অফিস (যেমন যাত্রাবাড়ী পাসপোর্ট অফিস) সংকীর্ণ আবাসিক বাড়িতে পরিচালিত হওয়ায় সেবাদানে সমস্যা তৈরি হয়। অপরদিকে কেন্দ্রীয় এবং বিভাগীয় অফিস কর্তৃক আঞ্চলিক অফিসগুলো তদারকিতে যানবাহনের অভাব রয়েছে। বর্তমানে অধিদপ্তরের ১০টি যানবাহনের মধ্যে ৪টি অকেজো হয়ে পড়ে আছে। অধিদপ্তর থেকে প্রতিটি আঞ্চলিক অফিসের জন্য একটি করপোরেট মোবাইল নম্বর প্রদান করা হয়েছে কিন্তু মোবাইল ফোনের খরচ বাবদ বরাদ্দ রাখা হয়নি। এ ক্ষেত্রে এ ব্যয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে বহন করতে হয়।

৪.৪.৩ অফিস তদারকিতে ঘাটতি

আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস তদারকির ক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষণীয়। অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী জেলা পর্যায়ের আঞ্চলিক অফিস বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিসগুলোর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হওয়ার শর্ত থাকলেও তা জনবল ঘাটতির কারণে সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। অপরদিকে কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে আঞ্চলিক অফিসগুলো তদারকিতে ঘাটতি রয়েছে। কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে কর্মরত পরিচালক/উপপরিচালকদের সপ্তাহে অন্তত একটি অফিস পরিদর্শনের নিয়ম থাকলেও কর্মকর্তাদের কাজের চাপে তা প্রতিপালন সম্ভব হয় না। এর ফলে বিভিন্ন সময়ে অধিদপ্তর থেকে সেবা-সংক্রান্ত বিভিন্ন নির্দেশনা আঞ্চলিক অফিসগুলোতে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না, তা অধিদপ্তরের পক্ষে নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। সার্বিকভাবে আঞ্চলিক অফিসগুলোর পরিবীক্ষণ ও জবাবদিহি ব্যবস্থা দুর্বল হয়।

৪.৪.৪ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের ঘাটতি

পাসপোর্ট সেবায় বর্তমানে প্রশাসনিক জ্ঞানের পাশাপাশি প্রযুক্তি, দক্ষতা, আইসিটি ও ইলেকট্রনিক জ্ঞানের সম্পর্ক রয়েছে। এ কারণে এই সেবার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উল্লিখিত পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা অপরিহার্য। আঞ্চলিক অফিসগুলোর শীর্ষ কর্মকর্তাদের একাংশের পাসপোর্ট বিষয়ে পেশাগত জ্ঞান ও পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতার ঘাটতি রয়েছে। সাধারণত আঞ্চলিক অফিসগুলোর শীর্ষ কর্মকর্তা হিসেবে একজন সহকারী পরিচালককে পদায়ন করা হয়, যিনি একজন কনিষ্ঠ কর্মকর্তা হিসেবে এই অধিদপ্তরে যোগদান করেন। নতুন যোগদানের পর সহকারী পরিচালকদের জন্য বনিয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। এর ফলে তাদের সেবা-সংক্রান্ত বিভিন্ন আইনি বিষয়, পাবলিক ফাংশন ডিলিংস ইত্যাদিতে সৃষ্ট সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধানে পেশাদারত্বের সাথে সেবা প্রদানে বাধার সম্মুখীন হতে হয়।

৪.৪.৫ সেবা-সংক্রান্ত তথ্য প্রদানে সীমাবদ্ধতা ও নীতিমালা প্রয়োগে চর্চার ঘাটতি

পাসপোর্ট সেবা-সংক্রান্ত তথ্য প্রদানে প্রায় সব পাসপোর্ট অফিসে তথ্য ও অনুসন্ধান কেন্দ্র, তথ্য প্রদান ও অভিযোগ গ্রহণে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও যোগাযোগের মাধ্যম, ফেসবুক পেজে অভিযোগ ও সমস্যা সম্পর্কে মন্তব্য করার সুযোগ তৈরি, সেবাগ্রহীতাদের অভিযোগ নিরসনে গণশুনানির ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকলেও এগুলোর কার্যকর বাস্তবায়নে পাসপোর্ট অফিসগুলোর

একাংশের চর্চার ঘাটতি লক্ষণীয়। এ ক্ষেত্রে তথ্য প্রদান ও অভিযোগ গ্রহণে রেজিস্টার নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ না করা, তথ্য প্রদান ও অভিযোগ গ্রহণে কর্মচারীদের একাংশের সংবেদনশীলতা ও সদিচ্ছার ঘাটতি, আঞ্চলিক অফিসগুলোয় গণশুনানির কার্যকর বাস্তবায়নে কর্মচারীদের একাংশের সদিচ্ছার ঘাটতি উল্লেখযোগ্য।

৪.৫ সার্বিক পর্যবেক্ষণ

টিআইবির 'সেবা খাতে দুর্নীতি : জাতীয় খানা জরিপ-২০১৫' শীর্ষক জরিপে পাসপোর্ট সেবা শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার পর পাসপোর্ট সেবাকে জনমুখী ও সহজীকরণে সাম্প্রতিককালে (২০১৬-২০১৭) অধিদপ্তর কর্তৃক বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয়ভাবে গৃহীত উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে : সেবাগ্রহীতাদের অভিযোগ নিরসনে বিভাগীয় ও আঞ্চলিক অফিসে গণশুনানির ব্যবস্থা, অনলাইনে ফি জমাদানে ৫টি বেসরকারি ব্যাংককে অন্তর্ভুক্তকরণ, পাসপোর্ট বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে 'পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহ' উদ্‌যাপন, বিদেশে বাংলাদেশ মিশনে দ্রুততম সময়ে পাসপোর্ট পাঠাতে কুরিয়ার সার্ভিসের প্রচলন, উন্নত সেবাপ্রদানে উৎসাহিত করার জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা-কর্মচারী' পুরস্কারের ব্যবস্থা, সেবাগ্রহীতাদের সুপারিশ ও সন্তুষ্টি জানাতে 'ক্লায়েন্ট সাটিসফেকশন রেজিস্টার' চালু করা উল্লেখযোগ্য। অপরদিকে পাসপোর্ট সেবায় সেবাগ্রহীতা পর্যায়ে বিভাগীয় ও আঞ্চলিক অফিসগুলোর একাংশের গৃহীত উদ্যোগ হলো :

- হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে সেবা প্রদান
- নারী ও শিশুদের জন্য পৃথক বায়ো-এনরোলমেন্টের ব্যবস্থা
- অভিযোগ নিরসনে অভিযোগ বাক্স স্থাপন
- ফেসবুক আইডি খোলা এবং ফেসবুক পেজের মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণ ও তা নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া চালুকরণ
- ব্রেস্টফিডিং কর্নার
- অসুস্থ, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য পৃথক কাউন্টার এবং হুইলচেয়ারের ব্যবস্থা
- আবেদনকারীর Automated Fingerprint ID System (AFIS), Demography, Re-issue investigation, ফি জমাদান ও পুলিশ প্রতিবেদন বিষয়ে সমস্যা বা বিরূপ প্রতিবেদন জানাতে এসএমএসের ব্যবস্থা
- সেবা-সংক্রান্ত তথ্য নির্দেশিকা, কক্ষের নম্বরসংবলিত নির্দেশনা এবং দালালের হয়রানি বিষয়ে সতর্কতার নোটিশ।

উল্লিখিত পদক্ষেপ অনেক ক্ষেত্রেই টিআইবির 'সেবা খাতে দুর্নীতি : জাতীয় খানা জরিপ-২০১৫' শীর্ষক জরিপের পাসপোর্ট সেবার ওপর প্রকাশিত পলিসি ব্রিফের সুপারিশমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এসব পদক্ষেপের ফলে পাসপোর্ট সেবায় আগের তুলনায় অনিয়ম ও দুর্নীতি হ্রাস পেয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে উল্লিখিত জরিপে পাসপোর্ট সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে ৭৭ দশমিক

৭ শতাংশ খানা অনিয়ম, হয়রানি ও দুর্নীতির শিকার হয় এবং তাদের ৭৬ দশমিক ১ শতাংশ খানাকে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ প্রদান করেন। বর্তমান গবেষণায় জরিপকৃত সেবাগ্রহীতাদের ৫৫ দশমিক ২ শতাংশ অনিয়ম, হয়রানি ও দুর্নীতির শিকার হয়েছেন এবং সেবাগ্রহীতাদের ৩৫ দশমিক ৩ শতাংশকে নিয়মবহির্ভূত অর্থ প্রদান করতে হয়েছে।

এতদসত্ত্বেও এ সেবার বিভিন্ন ধাপে এখনো বেশ কিছু সমস্যা, সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। যেমন : অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ সহজবোধ্য ও ব্যবহারবান্ধব না হওয়া, আবেদনপত্র সত্যায়ন ও প্রত্যয়নের বিধান এবং পুলিশ প্রতিবদেনে এসবি পুলিশ কর্তৃক সেবাগ্রহীতাদের হয়রানি ও দুর্নীতি উল্লেখযোগ্য। জরিপে নতুন পাসপোর্ট আবেদনে সেবাগ্রহীতাদের ৭৬ দশমিক ২ শতাংশ পুলিশি তদন্তে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছেন এবং তাদের ৭৫ দশমিক ৩ শতাংশকে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত দিতে হয়েছে।

পাসপোর্ট সেবাকে জনমুখী ও হয়রানিমুক্ত করার ক্ষেত্রে অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন নির্দেশনার কার্যকর বাস্তবায়নে পাসপোর্ট অফিসগুলোর একাংশের চর্চার ঘাটতি বিদ্যমান। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে পাসপোর্ট সেবা-সংক্রান্ত তথ্য প্রদানে বিভিন্ন ব্যবস্থা প্রায় সব পাসপোর্ট অফিসে বিদ্যমান থাকলেও এগুলোর কার্যকর প্রয়োগে ঘাটতি রয়েছে। এ ছাড়া পাসপোর্ট সেবায় অনলাইনে আবেদনপত্র সংগ্রহ ও পূরণে জটিলতা ও নানাবিধ চ্যালেঞ্জ থাকায় এখনো এটি জনপ্রিয় করা সম্ভব হয়নি এবং এ ক্ষেত্রে পাসপোর্ট অফিসের প্রচার-প্রচারণার ঘাটতি লক্ষণীয়। এর ফলে সেবাগ্রহীতাদের একটি অংশের দালালের সহায়তা গ্রহণের প্রবণতা লক্ষণীয়। অপরদিকে দালালের সাথে পাসপোর্ট অফিসের কর্মচারীদের একাংশ ও এসবি পুলিশের একাংশের যোগসাজশের ফলে পাসপোর্ট সেবায় অনিয়ম ও দুর্নীতি সংঘটিত হয়। অপরদিকে পাসপোর্ট সেবায় পুলিশ প্রতিবেদন ব্যবস্থা সাধারণ সেবাগ্রহীতাদের দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হওয়ার একটি অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা প্রকারান্তরে এ সেবার ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করছে। পাসপোর্ট সেবার বিভিন্ন ধাপে এসব সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা ছাড়াও পাসপোর্ট অফিসগুলোর কিছু প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন পাসপোর্টের ক্রমবর্ধমান চাহিদার বিপরীতে প্রয়োজনীয় জনবল, অবকাঠামো ও লজিস্টিকসের ঘাটতি, পাসপোর্ট সেবার সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে সমন্বয়ের ঘাটতি, আঞ্চলিক অফিসগুলো তদারকিতে ঘাটতি, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের ঘাটতি এবং অবকাঠামো ও লজিস্টিকস সাপোর্টের ঘাটতি উল্লেখযোগ্য। এসব প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার কারণে পাসপোর্ট অফিসগুলো কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদানে ব্যর্থ হয়।

এ গবেষণায় পাসপোর্ট সেবায় সুশাসন বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নির্দেশকের মধ্যে সক্ষমতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, সংবেদনশীলতা এবং শুদ্ধাচারকে বিবেচনায় আনা হয়েছে। নিচে উল্লিখিত সুশাসনের নির্দেশকের ভিত্তিতে বিদ্যমান পাসপোর্ট সেবায় সুশাসনের ঘাটতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাব দেখানো হলো :

চিত্র ১ : পাসপোর্ট সেবায় সুশাসনের ঘাটতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাব

কারণ	ফলাফল	প্রভাব
•প্রয়োজনীয় জনবল, অবকাঠামো, লজিস্টিকসের ঘাটতি •কর্মচারীদের দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের ঘাটতি •আবেদনপত্র পূরণ ব্যবহারবান্ধব না হওয়া, সত্যায়ন ও প্রত্যয়নের বিধান •সেবা-সংক্রান্ত তথ্যের ঘাটতি আঞ্চলিক অফিস তদারকির ঘাটতি অংশীজনের মধ্যে সমেন্বয়ের ঘাটতি •কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশের দুর্নীতির অভিযোগ আমলে এনে কার্যকর জবাবদিহি ব্যবস্থা গড়ে তোলার ঘাটতি •পুলিশ ভেরিফিকেশনে জবাবদিহি ও পেশাদারত্বের ঘাটতি	• সেবাগ্রহীতাদের হয়রানি – পাসপোর্ট অফিসগুলোতে অতিরিক্ত ভিড় ও দীর্ঘ লাইন • পাসপোর্ট পেতে বিলম্ব • অনলাইন আবেদনে নিরুৎসাহিত হওয়া • আবেদনকারীদের দালালের ওপর নির্ভরশীলতা • পুলিশ ভেরিফিকেশনে হয়রানি ও দুর্নীতি • কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশের দালালদের সাথে যোগসাজশে অনিয়ম ও দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়া	• সেবাগ্রহীতাদের আর্থিক ক্ষতি • পাসপোর্ট সেবার ওপর আস্থার ঘাটতি • অভিবাসন, চিকিৎসা, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিদেশভ্রমণ বাধাগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি

৫. সুপারিশমালা

এ গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের পাসপোর্ট সেবার মান উন্নত, টেকসইকরণ এবং দুর্নীতি ও অনিয়মরোধে নিচের সুপারিশ প্রণয়ন করছে :

স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ

১. পাসপোর্টের আবেদনপত্র সহজবোধ্য ও অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ আরও ব্যবহারবান্ধব করতে হবে। পাসপোর্ট ফি জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকের পাশাপাশি মোবাইল ব্যাংকিং অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

২. পাসপোর্টের আবেদনপত্র পূরণের নিয়মাবলি এবং সেবাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তথ্য নির্দেশিকা ও সর্বাধিক জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ও উত্তর আকারে অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে এবং আগ্রহী জনগণকে বিনা মূল্যে বিতরণ করতে হবে। ইউডিসিগুলোতে পাসপোর্ট সেবা-সংক্রান্ত প্রচারণা বাড়াতে হবে।

৩. আবেদনপত্র সত্যায়ন ও প্রত্যয়নের বিধান বাতিল করতে হবে।

৪. বিদ্যমান পুলিশ প্রতিবেদন-সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের সাথে মাসিক ভিত্তিতে সমন্বয় সভার আয়োজন নিশ্চিত করতে হবে।

৫. আবেদনকারীদের পাসপোর্ট বিতরণে ব্যর্থ হলে তা নির্ধারিত তারিখের আগে যৌক্তিক কারণসহ এসএমএসের মাধ্যমে অবহিত করতে হবে।

৬. পাসপোর্ট অফিস ও এসবি পুলিশের যেসব অসাধু কর্মচারীর যোগসাজশে দালালচক্র তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখছে, তাদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে। দালালের সহযোগিতা নেওয়ার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাতে হবে।

৭. পাসপোর্ট অফিসের কর্মচারীদের অফিস সময়ে নির্ধারিত পোশাকের ব্যবস্থা এবং পরিচয়পত্র ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৮. পাসপোর্ট অফিসের সেবার মান যাচাই ও সেবার মান উন্নতিকল্পে একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর সেবার মান মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে নাগরিক সংগঠনগুলোকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ

৯. সারা দেশে চাহিদার সাথে সংগতি রেখে পাসপোর্ট কার্যালয়গুলোতে জনবল, অবকাঠামো ও লজিস্টিকসের সরবরাহ ও এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। যেসব এলাকায় পাসপোর্টের চাহিদা বেশি, সেসব এলাকায় প্রয়োজন অনুযায়ী পাসপোর্ট কার্যালয়ের শাখা অফিস বাড়াতে হবে।

১০. পাসপোর্ট ইস্যুর ক্ষেত্রে পুলিশ ভেরিফিকেশনের বিধান বাতিল করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সব নাগরিকের জন্য 'বায়োমেট্রিক ডেটা ব্যাংক' তৈরির পাশাপাশি স্মার্টকার্ড তৈরি ও বিতরণ অবিলম্বে সম্পন্ন করতে হবে এবং অপরাধীদের তথ্য-সংক্রান্ত 'অপরাধী তথ্যভান্ডার' আধুনিক ও যুগোপযোগী করার পাশাপাশি এ তথ্যভান্ডারের সাথে পাসপোর্ট অফিস ও ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের সংযোগ স্থাপন করতে হবে।

১১. পাসপোর্ট আবেদনে প্রি-এনরোলমেন্ট ও বায়ো-এনরোলমেন্টের তথ্যাদি ব্যবহারে জাতীয় পরিচয়পত্রে (স্মার্টকার্ড) সংরক্ষিত তথ্য ব্যবহার পর্যায়ক্রমে শুরু করতে হবে।

১২. পাসপোর্টের মেয়াদ ৫ বছরের পরিবর্তে ১০ বছর করতে হবে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়*

মোরশেদা আক্তার

১. প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষায় পাঠ্যপুস্তক-সংক্রান্ত কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এনসিটিবির কার্যক্রমের মধ্যে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষাক্রম ও সিলেবাস নিরীক্ষণ ও সংস্কার, পাঠ্যপুস্তকের কার্যকারিতা যাচাই এবং মূল্যায়ন, পাঠ্যপুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের ব্যবস্থা করা, শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনা মূল্যে বই বিতরণ, প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের বিনা মূল্যের পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য শিখন-শেখানো সামগ্রী মুদ্রণ, বাঁধাই, পরিবহন ও উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সরবরাহ করা উল্লেখযোগ্য। এনসিটিবি ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে সারা দেশে ৪ কোটি ২৬ লাখ ৩৫ হাজার ৯২৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে বিনা মূল্যে ৩৬ কোটি ২১ লাখ ৮২ হাজার ২৪৫টি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করে; এর জন্য মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ১ হাজার ৯১ কোটি টাকা। ২০১৭ সাল পর্যন্ত এনসিটিবি কর্তৃক মোট ২৫ কোটি ৪৩ লাখ ১ হাজার ১২৮টি বই মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে। প্রকাশনার সংখ্যা বিবেচনায় এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রকাশনা সংস্থাগুলোর একটি।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিভিন্ন কারণে এনসিটিবির কার্যক্রম প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে বানান ও তথ্যগত ভুল, মানহীন বই, নির্দিষ্ট স্বার্থগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণ প্রভৃতি বিষয়ে এনসিটিবির পুস্তক রচনা ও প্রকাশনা নিয়ে গণমাধ্যমসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে। তবে বহুল আলোচিত হলেও কীভাবে ও কোন পর্যায় থেকে এসব ভুল ও অনিয়ম হচ্ছে, এ প্রক্রিয়ায় কারা জড়িত, সরকারের পক্ষ থেকে কী ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে কাঠামোবদ্ধ গবেষণার ঘাটতি রয়েছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) যে পাঁচটি সেবা খাতকে প্রাধান্য দিয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় অনুসন্ধানে গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে, তার মধ্যে শিক্ষা খাত অন্যতম। এই পরিপ্রেক্ষিতে এনসিটিবির পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনায় সুশাসনের ঘাটতির কারণ অনুসন্ধানে এ গবেষণা কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

*২০১৭ সালের ১৩ নভেম্বর টিআইবির সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার উদ্দেশ্য এনসিটিবির পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং এসব চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রদান করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে :

- এনসিটিবির পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা-সংক্রান্ত আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পর্যালোচনা করা;
- এনসিটিবির পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন, পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা ও সরবরাহ প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করা;
- এনসিটিবির পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন, পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনায় অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন ও কারণ চিহ্নিত করা এবং
- পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনায় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রদান করা।

৩. গবেষণার পদ্ধতি ও সময়কাল

এটি একটি গুণবাচক গবেষণা, যেখানে পদ্ধতি হিসেবে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ব্যবহার করা হয়েছে। এনসিটিবির কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন কমিটির সদস্য, পাণ্ডুলিপি লেখক, সংশ্লিষ্ট সম্পাদক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ, তদারকি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, দাতা সংস্থার প্রতিনিধি এবং গণমাধ্যমকর্মীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিবেদন, বিভিন্ন প্রকাশনা ও প্রতিবেদন, সংবাদপত্র ও অন্যান্য গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ পর্যালোচনা করা হয়েছে। গবেষণা সম্পন্ন হওয়ার পর এনসিটিবির কর্মকর্তাদের সাথে দুটি মতবিনিময় সভায় গবেষণার উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করা হয় এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতে প্রতিবেদন হালনাগাদ করা হয়। ২০১৬ সালের অক্টোবর থেকে ২০১৭ সালের অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪. পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা-সংক্রান্ত নীতি ও আইন পর্যালোচনা

বাংলাদেশে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক-সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ১৯৮৩ সালের অক্টোবরে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অধ্যাদেশ ১৯৮৩ প্রণয়ন করা হয়। পরে ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে অধ্যাদেশটি সংশোধন করে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (সংশোধন) আইন ২০১০ নামে প্রণীত হয়। এ আইনে (১) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড গঠন, চেয়ারম্যান, সদস্যদের নিয়োগ, বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়া; (২) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কার্যক্রম এবং (৩) বিভিন্ন কমিটি গঠনের নিয়ম– সদস্যদের সংখ্যা, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কমিটি গঠন-প্রক্রিয়া উল্লেখ করা হয়েছে।

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা-সংক্রান্ত আইন ও নীতি পর্যালোচনা করে নিচের সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করা যায় :

- শিক্ষাক্রম ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের কোনো নীতিমালা নেই।
- পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণবিষয়ক দিকনির্দেশনার ঘাটতি বিদ্যমান।
- এখন পর্যন্ত 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অধ্যাদেশ ১৯৮৩'-এর কোনো বিধিমালা প্রণীত হয়নি, নির্বাহী আদেশের ভিত্তিতে এনসিটিবির কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
- বর্তমান আইনে জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটির (এনসিসিসি) এবং শিক্ষাক্রম কমিটির (কারিকুলাম কমিটি) কোনো উল্লেখ করা হয়নি, যদিও শিক্ষাক্রম তৈরি ও পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন এসব কমিটি করে থাকে। এসব কমিটি মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী আদেশে গঠন করা হয়।
- সিলেবাস কমিটি ও টেক্সট বুক কমিটির সদস্যদের মেয়াদের উল্লেখ করা হয়নি। উল্লেখ্য, নতুন কমিটি গঠিত না হওয়া পর্যন্ত পুরোনো কমিটি কাজ করে থাকে।
- আইনের বিভিন্ন ধারার সুযোগে এনসিটিবির ওপর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের ঝুঁকি রয়েছে।

৩. এনসিটিবির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও কার্যক্রম

এনসিটিবি একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত একজন চেয়ারম্যান ও চারজন সদস্যের সমন্বয়ে এ প্রতিষ্ঠানের বোর্ড গঠিত হয় এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলি অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এনসিটিবি সদস্য শিক্ষাক্রমের (মাধ্যমিক) অধীনে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমের কার্যাবলি তত্ত্বাবধান, তদারকি ও বাস্তবায়নের দিকনির্দেশনা প্রদান, সদস্য শিক্ষাক্রমের (প্রাথমিক) অধীনে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমের কার্যাবলি তত্ত্বাবধান, তদারকি ও বাস্তবায়নের দিকনির্দেশনা প্রদান, সদস্যের (পাঠ্যপুস্তক) অধীনে পাঠ্যবই উৎপাদন, বিতরণ, কাগজ ক্রয় ও সম্পাদনা কার্যক্রম তত্ত্বাবধান, তদারকি ও বাস্তবায়নের দিকনির্দেশনা প্রদান এবং সদস্যের (অর্থ) অধীনে বোর্ডের আর্থিক বিষয়াদি পরিচালিত হয়। এ ছাড়া সরকার দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত সচিব বোর্ডের প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদনাসহ চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যের কার্যক্রমে সার্বিক সহায়তা প্রদান করেন।

চিত্র ১ : এনসিটিবির পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন-প্রক্রিয়া ও এ প্রক্রিয়ায় সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ পর্যায়

৬. পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন-প্রক্রিয়ায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

৬.১ বিভিন্ন কমিটি গঠন

জাতীয় শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অধ্যাদেশ ১৯৮৩ অনুযায়ী বোর্ডের সুপারিশক্রমে বিভিন্ন কমিটির (যেমন এনসিসিসি, টেকনিক্যাল কমিটি, ভেটিং কমিটি, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কমিটি, লেখক কমিটি) সদস্যদের মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে চূড়ান্ত করে সরকার। বিষয়টি সরকারি এখতিয়ারভুক্ত হওয়ার দরুন কমিটির সদস্য নির্বাচনে দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কমিটি গঠনের সময় যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও দলীয় রাজনৈতিক বিবেচনায় কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা বা কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

৬.২ বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন

এনসিটিবি শিক্ষাক্রমের রূপরেখা তৈরি, শিক্ষাক্রম অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যক্রম তৈরি এবং স্তর ও বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন করে থাকে, যেখানে অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ, শিক্ষা গবেষক, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অংশগ্রহণ করেন। অভিযোগ রয়েছে, এসব কর্মশালায় ব্যক্তিগত পছন্দ ও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী নির্বাচন করা হয়। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ সদস্যের মতামত গ্রহণ করা হয় না। যেমন শিক্ষাক্রম বিস্তরণের প্রশিক্ষণে প্রতিটি বিষয়ের জন্য এককেটি দলে ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থী থাকার কথা থাকলেও তা দেখা যায় না। প্রশিক্ষণের বিষয়ে সঠিক সময়ে প্রশিক্ষণার্থীদের অবহিত না করা, প্রশিক্ষণের সব বিষয়ের জন্য পর্যাপ্ত সময় বরাদ্দ না রাখারও অভিযোগ রয়েছে।

৬.৩ লেখক দলে সদস্য নিয়োগ

সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে পাঠ্যভুক্ত বিষয়ের বিশেষজ্ঞ, জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ, অভিজ্ঞ শ্রেণিশিক্ষক এবং এনসিটিবির পাঠ্যক্রম বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে পাঁচ থেকে সাতজনের লেখক দল গঠন করা হয়। তবে এই প্রক্রিয়ায় স্বজনপ্রীতি, ব্যক্তিগত পছন্দ এবং মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে অদক্ষ সদস্য নির্বাচনের অভিযোগ রয়েছে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট সদস্যের পাঠ্যক্রমের বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকা, লেখক দলে সব সদস্যের অবদান সমান না থাকা এবং লেখক দলে সব সদস্যের কাজ করার বা বিষয় বোঝার দক্ষতা সমান না থাকার অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া লেখক দলে এমন লেখকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যাদের কাজ বা অবদান সম্পর্কে অন্যদের কোনো ধারণা থাকে না।

৬.৪ লেখা নির্বাচন ও শব্দ চয়ন

পাঠ্যবইয়ে ক্ষমতাসীন দলের মতাদর্শী ধারার ভাষা ব্যবহার করার প্রবণতা এবং ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর প্রভাব লক্ষ করা যায়। বিগত বর্তমান জোটের ক্ষমতায় আসার আগের সময়ে পাঠ্যবইয়ে (সমাজ পাঠ) 'বাঙ্গালী' শব্দ ব্যবহার করা হতো না, বরং 'এ দেশের মানুষ' লেখা হতো। সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে বর্তমান বইগুলোতে 'বাঙ্গালী' শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ছাড়া ওই সময়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে ছাগল পালন কর্মসূচিকে গুরুত্বসহকারে পাঠ্যভুক্ত করা হয়। এ ছাড়া সম্প্রতি একটি ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক মতাদর্শী গোষ্ঠীর

দাবি ছিল মাদ্রাসার পাঠ্যবইয়ে 'হিন্দু, খ্রিষ্টান বা বিদেশী বলে মনে হয়' এমন নামের পরিবর্তে 'সুন্দর ইসলামি নাম' ব্যবহার, পাঠ্যবই থেকে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে যেকোনো ধরনের সংলাপ প্রত্যাহার এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের চারটি পাঠ্যবই থেকে ১১টি 'অনৈসলামিক' কবিতা, বিভিন্ন হিন্দু নাম ও কাহিনি ও মেয়েদের শারীরিক উন্নতির অধ্যায় থেকে 'মাসিক' শব্দ বাদ দেওয়া। ২০১৬ সালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঁচটি পাঠ্যবই থেকে ১৬টি লেখা বাদ দেওয়া হয়, যার মধ্যে উল্লিখিত গোষ্ঠীর দাবি অনুযায়ী ১১টি কবিতাই বাদ দেওয়া হয়েছে বলে দেখা যায়। মাদ্রাসার ইংরেজি পাঠ্যবই থেকে হিন্দু, খ্রিষ্টান বা বিদেশি বলে মনে হওয়া সব ধরনের নাম বাদ দিয়ে সেখানে ইসলামি নাম দেওয়া, ছেলেমেয়ের সংলাপ প্রত্যাহার, মাথায় কাপড় ছাড়া মেয়েদের ছবিগুলো সম্পাদনা করা হয়েছে। এনসিটিবির চেয়ারম্যান, যিনি একজন হিন্দুধর্মাবলম্বী, তাঁর নাম মাদ্রাসার বইগুলোতে উহ্য রাখা হয়েছে।

৬.৫ বিষয় বিশেষজ্ঞ নিয়োগ

প্রতিটি স্তরের পাঠ্যপুস্তক সম্পাদনা ও পরিমার্জনের জন্য একজন করে বিষয় বিশেষজ্ঞ নিয়োগের নিয়ম থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দেওয়া হয় না এবং এক বিষয়ের বিশেষজ্ঞকে অন্য বিষয়ে দায়িত্ব পালন করতে দেওয়া হয়। বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও প্রেষণে আসা কর্মকর্তাদের বিশেষজ্ঞ হিসেবে পদায়ন দেওয়া হয় এবং এক বিষয়ের বিশেষজ্ঞকে অন্য বিষয়ে দায়িত্ব পালন করতে হয়। যেমন অর্থনীতির শিক্ষককে বাংলা, প্রাণিবিদ্যা বিষয়ের শিক্ষককে খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার বিশেষজ্ঞ হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে। হিসাববিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষককে দেওয়া হয়েছে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বই সম্পাদনার দায়িত্ব। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ভান্ডার কর্মকর্তা বা আর্টিস্টকেও একাধিক বইয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে ঢাকায় অবস্থানের উদ্দেশ্যে এ পদে বদলি নেওয়ার জন্য প্রভাব বিস্তার করা হয়। কোনো কোনো বিষয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিশেষজ্ঞ, যেমন দর্শন বিষয়ের কারিকুলাম তৈরি করা না হলেও কর্মরত এনসিটিবির নিজস্ব ৬৪ জনের মধ্যে দর্শন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ রয়েছেন সাতজন।

৬.৬ লেখক-সম্পাদক সমন্বয়

লেখক দল বই রচনা, পরিমার্জন বা পরিবর্ধন করার পর এনসিটিবির সম্পাদনা বিভাগে জমা দিয়ে থাকেন। একাধিক তথ্যদাতার মতে, সম্পাদক নিজের মতো করে সম্পাদনা করেন। সম্পাদনার সময় লেখক-সম্পাদক একসাথে বসে লেখার উদ্দেশ্য ও বিষয় সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে সম্পাদনা করার নিয়ম থাকলেও এ কাজটি না করার অভিযোগ রয়েছে। এনসিটিবি এ কাজটি সময় স্বল্পতার অজুহাতে করে না বলে অভিযোগ রয়েছে।

৬.৭ সম্পাদনা

বই রচনার পর প্রধান সম্পাদকের প্রতিটি বই পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখার দায়িত্ব থাকলেও ব্যক্তিগত ব্যস্ততার কারণে দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগ রয়েছে। সম্পাদনার দায়িত্বপ্রাপ্ত দল দায়িত্ব পালন না করে অফিস সময়ে ইন্টারনেটে শেয়ার ব্যবসা, বক্তিগত আলাপ, ব্যক্তিগত এনজিও ব্যবসা ও মুদ্রণকাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন বলে অভিযোগ রয়েছে। বর্তমান শিক্ষা বছরে তৃতীয় শ্রেণির বাংলা

বইয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞের দায়িত্বে অবহেলার কারণে কবিতার লাইন বিভ্রাটসহ অন্যান্য তথ্যগত ও বানান ভুল হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এক বিষয়ের বিশেষজ্ঞ অন্য বিষয়ের দায়িত্ব পালনের ফলে পাঠ্যবইয়ে ভুলসহ নানা অসংগতি লক্ষ করা যায়। ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে ষষ্ঠ শ্রেণির ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বইয়ে ৫৮টি ভুল শোধরানো হলেও ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে আবার ২০টি ভুল হতে দেখা যায়।

৬.৮ প্রুফ রিডার নিয়োগ

স্বজনপ্রীতি ও তদবিরের মাধ্যমে দক্ষতাসম্পন্ন নয় এমন সদস্যকে প্রুফ রিডার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় বলে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে এনসিটিবি ও মন্ত্রণালয় উভয়েরই একাংশ সংশ্লিষ্ট বলে অভিযোগ রয়েছে।

৬.৯ ট্রাই-আউট পদ্ধতি ব্যবহার

এনসিটিবির অন্যতম কাজ হচ্ছে কারিকুলাম তৈরি হওয়ার এক বছর পর রচিত পাঠ্যবইয়ের ওপর মাঠপর্যায় থেকে মতামত নেওয়া যা ট্রাই-আউট পদ্ধতি নামে অভিহিত। অভিযোগ রয়েছে, পাঠ্যক্রম বিভাগ এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত মতামত যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করে না। মাঠপর্যায়ের তথ্য ব্যবহার করে পাঠ্যপুস্তকে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হয় না।

৬.১০ পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ

এনসিটিবির পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের পরিকল্পনা ও সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা নেই। এনসিটিবির সদস্যের (পাঠ্যক্রম) অধীন সম্পাদনা শাখায় পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের নিয়ম থাকলেও পাঠ্যবইয়ের পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ করা হয় না। এ বিষয়ে এনসিটিবির পরিকল্পনারও ঘাটতি রয়েছে।

৬.১১ লেখা পরিবর্তন

কারিকুলাম অনুসরণ না করে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে লেখা পরিবর্তন করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। লেখকদের অজ্ঞাতে পাঠ্যবইয়ে লেখা সংযোজন-বিয়োজন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে লেখা পরিবর্তনে সম্পাদকদের বাধ্য করা হয়। এ ছাড়া ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে নবম-দশম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যবইয়ে শিক্ষা বিভাগের একজন ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তার কবিতা যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৭. পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা ও সরবরাহ-প্রক্রিয়া

প্রথমে এনসিটিবির মুদ্রণ-সংক্রান্ত দিকনির্দেশনা সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনটি পৃথক দরপত্র কমিটি (প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কাগজ) গঠন ও অনুমোদন করা হয়। প্রাথমিক স্তরের জন্য এনসিটিবি কর্তৃক কমিটির নামের তালিকা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ ও অনুমোদন করার পর অধিদপ্তর নামের তালিকা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে এবং সেখান থেকে অনুমোদন করা হয়। পরবর্তী সময়ে এই তালিকা বিশ্বব্যাংক যাচাই-বাছাই করে অনুমোদন করে। এরপর এনসিটিবি দরপত্র-সংক্রান্ত সব কার্যক্রম যেমন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, উন্মুক্তকরণ কমিটি গঠন,

মূল্যায়ন কমিটি গঠন প্রভৃতি সম্পন্ন করে। অন্যদিকে মাধ্যমিক ও কাগজ কেনার ক্ষেত্রে এনসিটিবি নামের তালিকা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠায় এবং সেখান থেকে অনুমোদন করা হয়। এরপর এনসিটিবি দরপত্র-সংক্রান্ত সব কার্যক্রম যেমন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, উন্মুক্তকরণ কমিটি গঠন, মূল্যায়ন কমিটি গঠন প্রভৃতি সম্পন্ন করে।

দরপত্র কমিটি গঠনের সাথে সাথে মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের জন্য এনসিটিবি তদারকি প্রতিষ্ঠান নিয়োগ দেয়, যা পরবর্তী সময়ে দরপত্র-সংক্রান্ত কার্যক্রম ও মুদ্রণ কার্যক্রম তদারকি করে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের জন্য পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ অনুযায়ী সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) বিভাগ উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান করার ব্যবস্থা করে। পাঠ্যক্রম বিভাগ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে মাঠপর্যায় থেকে বার্ষিক বইয়ের চাহিদা সংগ্রহ করে কাগজসহ ও কাগজ ছাড়া দুই ধরনের দরপত্র আহ্বান করে। এনসিটিবি অংশগ্রহণকারী মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের দাখিলকৃত অবকাঠামো, কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করার জন্য সাত সদস্যবিশিষ্ট মূল্যায়ন কমিটি তালিকা তৈরি করে এনসিটিবির বোর্ড সভায় পেশ করে এবং চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যাদেশ দেওয়া হয় এবং মুদ্রণ কার্যক্রম শুরু হয়। মুদ্রণ শেষ হওয়ার পর মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানগুলো জেলা/ উপজেলা পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তক পাঠায়। মুদ্রণ চলাকালীন এনসিটিবি ও তদারকি প্রতিষ্ঠান মুদ্রণ কার্যক্রম এবং সরবরাহ তদারকি করে (চিত্র ২ দ্রষ্টব্য)।

চিত্র ২ : পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা ও সরবরাহ-প্রক্রিয়া

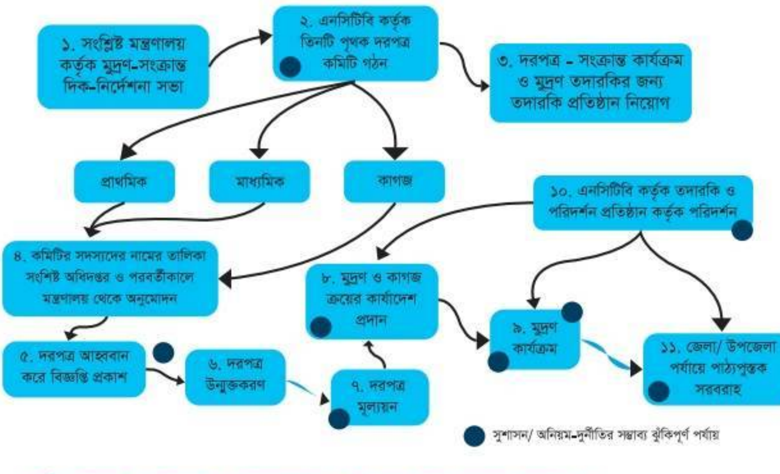

৮. পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা ও সরবরাহ-প্রক্রিয়ায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

৮.১ দরপত্র আহ্বান

দরপত্র আহ্বানের আগে প্রাক্কলিত দর দরপত্র কমিটির সদস্য ছাড়া অন্য কারও জানার নিয়ম না থাকলেও এনসিটিবির দরপত্র কমিটির একাংশ পছন্দের মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানকে আগেই দর জানিয়ে

দিয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে দরপত্র দাখিল করে বলেও জানা যায়।

৮.২ পাঠ্যপুস্তক উৎপাদন ও বিতরণ-সংক্রান্ত কাজের সম্মানী

দাপ্তরিক বা সরকারি আদেশ না থাকা সত্ত্বেও পাঠ্যপুস্তক উৎপাদন ও বিতরণ-সংক্রান্ত বিভিন্ন নিয়মিত কাজ, যেমন নির্দেশিকা তৈরি, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, দরপত্র বাক্স খোলা, সিএস তৈরি এবং দরপত্র কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কার্যাদেশ প্রদান, প্রতি লটের কাগজের হিসাব, কাগজ বরাদ্দপত্র জারি, কার্যাদেশ অনুযায়ী কোন দরদাতা কোন উপজেলায় বই সরবরাহ করবে, তার তালিকা তৈরি ইত্যাদির জন্য প্রভাবশালী উর্ধ্বতন কর্মকর্তার প্রভাব ও এনসিটিবি কর্মচারী নেতৃত্বের একাংশের সহযোগিতায় বিতরণ শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ১ হাজার টাকা থেকে শুরু করে ৩ হাজার টাকা পর্যন্ত সম্মানী নেয় বলে জানা যায়। এ খাতে ২০১৭ সালে ২৭ লাখ ৬০ হাজার ৫০০ টাকা ও ২০১৬ সালে ৫ লাখ ৮০ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এনসিটিবির সর্বশেষ মহাহিসাব নিরীক্ষকের (সিএজি) নিরীক্ষায় এ বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করা হলেও এখনো তা নিষ্পত্তি হয়নি।

৮.৩ মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান নির্বাচন

দরপত্র আহ্বানের পর এনসিটিবির কোনো কোনো কর্মকর্তার বেনামে মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের মালিক হিসেবে দরপত্রে অংশগ্রহণ ও কার্যাদেশ প্রাপ্তির অভিযোগ রয়েছে। একই ব্যক্তির বিভিন্ন মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের নামে দরপত্রে অংশগ্রহণ এবং কার্যাদেশ প্রাপ্তিরও অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া নিয়মবহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয় বলে কোনো কোনো তথ্যদাতা জানিয়েছেন। টেকনিক্যাল কমিটির দ্বারা অযোগ্য ঘোষিত হলেও উর্ধ্বতন পর্যায় থেকে চাপ প্রয়োগ করা হয়। নিজস্ব মুদ্রণ যন্ত্র, বাঁধাই, লেমিনেটিং ব্যবস্থা, কাটিং যন্ত্র ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মী না থাকা সত্ত্বেও দরপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানা যায়। দরপত্রে উল্লিখিত শর্ত পূরণ না করা সত্ত্বেও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। এ ছাড়া শর্ত সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রয়োগ করা হয় না; বরং ভালো সম্পর্কের ভিত্তিতে কাজ দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

৮.৪ সাব-কন্ট্রাক্টে কাজ দেওয়া

১৯৭৩ সালের মুদ্রণ আইন অনুযায়ী মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান মুদ্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে না বলে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও কার্যাদেশ প্রাপ্তির পর অনেক প্রতিষ্ঠান কাজের বেশির ভাগই সাব-কন্ট্রাক্টে দিয়ে থাকে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। এসব কাজের মধ্যে রয়েছে মুদ্রণ, বাঁধাই ও লেমিনেশন। এনসিটিবির কর্মকর্তাদের একাংশের বিধিবহির্ভূত আর্থিক সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানগুলো বছরের পর বছর ধরে এ ধরনের কার্যক্রম চালিয়ে আসছে।

৮.৫ কাগজ ক্রয়

এনসিটিবি মাধ্যমিক স্তরে বিনা মূল্যে (৬৫টি) বই প্রদানের জন্য পিপিআরের শর্ত অনুযায়ী উন্মুক্ত আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে কাগজ ক্রয় করে। দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী কাগজ ক্রয় করা

হলেও অভিযোগ রয়েছে, এনসিটিবি বিএসটিআই সনদবিহীন কাগজের মিলগুলোর কাছ থেকে নিয়মবহির্ভূত আর্থিক সুবিধা গ্রহণের বিনিময়ে সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যাদেশ প্রদান করছে। বিএসটিআইয়ের পরামর্শ সত্ত্বেও সিএম (সার্টিফিকেশন মার্কস স্কিম) লাইসেন্স বাধ্যতামূলক করা হয়নি। পর্যাপ্ত কাগজ উৎপাদনের সক্ষমতার ঘাটতি সত্ত্বেও নির্বাচিত হওয়া, সময়মতো কাগজ সরবরাহ করতে না পারা, চুক্তিবদ্ধ মাপ অনুযায়ী কাগজ সরবরাহ না করা এবং সিএম লাইসেন্সবিহীন মিলগুলো নিয়মবহির্ভূত আর্থিক সুবিধা ও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে কাজ পাচ্ছে বলে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া একাধিক কাগজ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান মানসম্মত কাগজ সরবরাহ করতে না পারার অভিযোগে কালো তালিকাভুক্ত হলেও পরবর্তী বছরেই কাজ প্রাপ্তির অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া গত ৩-৪ বছর আগে কালো তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে ২০১৬ উৎপাদন বর্ষে কাজ দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের অভিযোগ আমলে নেওয়া হয় না।

৮.৬ মান নিয়ন্ত্রণ

অভিযোগ আছে যে দায়িত্বপ্রাপ্ত তদারকি প্রতিষ্ঠান সার্বক্ষণিক উপস্থিত না থেকেও উপস্থিতির প্রতিবেদন দেয় এবং মুদ্রণকাজে মান অনুযায়ী কাগজ ও কালি ব্যবহার না করা, মুদ্রণকাজের জন্য নির্ধারিত সময়ে মুদ্রণ না করা হলেও আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে সন্তোষজনক প্রতিবেদন প্রদান করে। একাধিক তথ্যদাতার মতে, কোনো কোনো মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান তদারকির ভয়ে দিনের বেলা ভালো কাগজে বই ছাপে আর রাতের বেলা খারাপ কাগজ ব্যবহার করে এবং এই বইগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়।

৮.৭ পাঠ্যবই সরবরাহ

কার্যাদেশ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে পাঠ্যবই ছাপিয়ে প্রতিটি উপজেলায় সরবরাহ করার কথা থাকলেও কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান বেশ কয়েকটি জেলায় নির্ধারিত সময়ে পাঠ্যবই সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয় বলে দেখা যায়। তবে সময়মতো সরবরাহ করা না হলেও নিয়োগকৃত পরিদর্শন ও তদারকি প্রতিষ্ঠান পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের প্রতিবেদনে সঠিক সময়ে বই পৌঁছেছে বলে প্রতিবেদন দেয়।

৯. সার্বিক পর্যবেক্ষণ

গবেষণায় দেখা যাচ্ছে এনসিটিবির কার্যক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান, যার প্রতিফলন বিভিন্ন কমিটি গঠন থেকে শুরু করে পাঠ্যবইয়ে লেখা নির্বাচনের মতো বিষয় পর্যন্ত বিস্তৃত। এর ফলে কার্যত এনসিটিবি তার কার্যক্রমের জন্য সরকারের ওপর নির্ভরশীল। দেখা যাচ্ছে এনসিটিবির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন প্রক্রিয়া অস্বচ্ছ, যথাযথ নয় এবং দলীয় রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত প্রভাব বিদ্যমান। গবেষণায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ করা যায় তা হলো, পাঠ্যবই লেখার মতো 'বিশেষায়িত' বিষয়কে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না; অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত বিশেষজ্ঞদের এই প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।

সক্ষমতা ও পেশাগত দক্ষতার ঘাটতির কারণে প্রতিবছর বিপুলসংখ্যক বই বছরের প্রথম দিন সারা দেশের ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌঁছে দেওয়ার বড় চ্যালেঞ্জ এনসিটিবিকে মোকাবিলা করতে

হয়। এনসিটিবিতে বিশেষজ্ঞ ও জনবলের ঘাটতির সাথে সাথে কারিগরি দক্ষতার ঘাটতিও রয়েছে। এ ছাড়া মন্ত্রণালয়-এনসিটিবি ও লেখক-সম্পাদক সমন্বয়ে ঘাটতি রয়েছে। পরিদর্শন ও তদারকিতে ঘাটতির কারণে সময়মতো পাঠ্যবই সরবরাহ করা হয় না এবং মানসম্মত বই সরবরাহ করা হয় না বলে গবেষণায় লক্ষ করা যায়।

অপরদিকে পাঠ্যবই প্রকাশনা প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি ও অনিয়ম বিদ্যমান। এনসিটিবি বিভিন্ন রকম প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে দায়িত্ব পালন করার কারণে প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম হচ্ছে না। একইভাবে এনসিটিবি কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যথাযথ জবাবদিহি নিশ্চিত করতে না পারায় তারা বিভিন্ন রকম অনিয়ম-দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ছেন। সর্বোপরি এনসিটিবি প্রতিষ্ঠানের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাহত হচ্ছে।

১০. সুপারিশ

এনসিটিবির পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা প্রক্রিয়ায় সুশাসন ও কার্যকর জবাবদিহির পরিবেশ সৃষ্টির জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশ প্রস্তাব করা হলো :

আইনি ও নীতি সংস্কার

১. এনসিটিবিকে স্বাধীন কমিশন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যা পাঠ্যবই রচনা, সংকলন, সম্পাদনা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে নীতি প্রণয়নে কাজ করবে।

২. ওই কমিশন গঠনের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে খ্যাতিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে, যারা তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে এই কমিশন গঠনের বিষয়ে সুপারিশ করবেন।

৩. স্বাধীন কমিশন গঠন হওয়ার আগপর্যন্ত কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অধ্যাদেশ ১৯৮৩ সংশোধন করতে হবে, যেখানে নিচের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে :

- এনসিটিবির কার্যক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব হ্রাস করতে হবে;
- এনসিসিসি ও কারিকুলাম কমিটির গঠন, মেয়াদ, কার্যক্রম, যোগ্যতা সুনির্দিষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- সিলেবাস ও টেক্সট বুক কমিটির সদস্যদের যোগ্যতা ও মেয়াদ নির্ধারণ করতে হবে;

  পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণবিষয়ক দিকনির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

৪. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অধ্যাদেশ ১৯৮৩-এর বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

৫. শিক্ষাক্রম ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা-সংক্রান্ত সুপারিশ

৬. বর্তমান পাঠ্যক্রম প্রকাশ/ উন্মুক্ত করতে হবে ও নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে

৭. শিক্ষাবিষয়ক ও শিক্ষাক্রমের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের এনসিটিবির বোর্ডে (বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের জন্য) সদস্য হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে।

৮. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অনুযায়ী এনসিটিবির কর্মীদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন করতে হবে এবং ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৯. বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে যথাযথ যোগ্য ব্যক্তিদের এনসিটিবিতে পদায়ন করতে হবে।

১০. সব তদন্ত প্রতিবেদন (প্রণয়ন ও প্রকাশনাসহ) ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা-সংক্রান্ত সুপারিশ

১১. প্রতিটি পাঠ্যবইয়ের জন্য সম্পাদক, সংকলক ও লেখকের সাথে এনসিটিবির চুক্তির প্রবর্তন করতে হবে। চুক্তিতে কর্মপরিধি, সম্মানীর পরিমাণ, কাজের মেয়াদ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

১২. পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের জন্য বিষয়ভিত্তিক বিষেশজ্ঞ এবং পাঠ্যবই লেখায় দক্ষতাসম্পন্ন লেখকদের নিয়োগ দিতে হবে।

১৩. পাঠ্যবইয়ের লেখকদের সম্মানী সুনির্দিষ্ট মাপকাঠির ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে।

১৪. পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনার প্রতিটি ধাপ যথাযথভাবে নথিভুক্ত করতে হবে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ করতে হবে।

১৫. পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের জন্য ই-টেন্ডারিং প্রচলন করতে হবে।

১৬. মুদ্রণ তদারকির সাথে জড়িত এনসিটিবির কর্মকর্তাদের কারিগরি দক্ষতা বাড়াতে হবে।

বাংলাদেশে শিক্ষা খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধিতে উন্মুক্ত স্কুল তথ্যের ব্যবহার : ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ও সরকারি স্কুলের অভিজ্ঞতা*

দিপু রায় ও আবু সাঈদ মো. জুয়েল মিয়া

১. প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুলের তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে সরকারি ও সুশীল সমাজের প্রতিষ্ঠান তথা নাগরিক উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম লক্ষ করা যায়। তবে ধরন, উদ্দেশ্য, সম্পন্ন করার কৌশল, সংশ্লিষ্ট অংশীজনসহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে এসব উদ্যোগের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে স্কুল মনিটরিং বোর্ড, মা সমাবেশ, অভিভাবক সমাবেশ, সিটিজেন চার্টার ইত্যাদি। অন্যদিকে, নাগরিক উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে উন্মুক্ত তথ্য বোর্ড, সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড, মা সমাবেশ, অভিভাবক সমাবেশ, স্যাটেলাইট তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক ইত্যাদি। নাগরিক উদ্যোগের অংশ হিসেবে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কয়েকটি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির উদ্যোগ (টিএআই) বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষার মানোন্নয়নে অবদান রাখছে। টিআইবির উদ্দেশ্য হচ্ছে লিফলেট বিতরণ, উন্মুক্ত তথ্য বোর্ড, তথ্য ডেস্ক, মা সমাবেশ ও অভিভাবক সমাবেশে মা ও অভিভাবকদের সাথে স্কুল কর্তৃপক্ষের পারস্পরিক আলোচনা, কর্তৃপক্ষের সাথে সভা ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের বিদ্যালয়-সম্পর্কিত সচেতন করা। এ উদ্দেশ্যে টিআইবি কিছু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে।

এই গবেষণায় প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির উদ্যোগ সম্পর্কে সরকারি ও নাগরিক উদ্যোগের মধ্যে তুলনা করার জন্য তিনটি অনুমানকে পরীক্ষা করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। এগুলো হলো– ১. উন্মুক্ত তথ্য প্রকাশের উদ্যোগ শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে শক্তিশালী টুল হিসেবে কাজ করে, ২. সেবাগ্রহীতাদের প্রয়োজন মেটানো, তাদের সম্পৃক্ত করা এবং এসব কাজের সঠিক ফলাফল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগ নাগরিক

---

* ইউনেসকো ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর এডুকেশনাল প্ল্যানিংয়ের (আইআইইপি) শিক্ষা খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত বিদ্যালয়ের উন্মুক্ত তথ্যের ওপর গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ। সূত্র : রায়, দিপু; আবু সাঈদ. মো. জুয়েল মিয়া, ২০১৮. ইউজিং ওপেন স্কুল ডেটা টু ইমপ্রুভ ট্রান্সপারেন্সি অ্যান্ড অ্যাকাউন্টাবিলিটি ইন বাংলাদেশ. সিরিজ : এথিকস অ্যান্ড করাপশন ইন এডুকেশন. প্যারিস : আইআইইপি-ইউনেসকো। এর অনলাইন লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার পর পাওয়া যাবে এই ঠিকানায় : http://etico.iiep.unesco.org/en/publications.

উদ্যোগের তুলনায় কম কার্যকর, ও ৩. সব সেবাগ্রহীতা উন্মুক্ত তথ্যের উদ্যোগ দ্বারা সমানভাবে উপকৃত হচ্ছে না। এসব অনুমান পরীক্ষা করার জন্য মোট ২০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে টিআইবির কার্যক্রম পরিচালিত রয়েছে এমন ১০টি এবং টিআইবির কার্যক্রম পরিচালিত নয় এমন ১০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য

- বাংলাদেশে প্রাথমকি শিক্ষা খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধিতে উন্মুক্ত স্কুল তথ্য কার্যক্রমের হালনাগাদ চিত্র তুলে ধরা;
- প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায় উন্মুক্ত স্কুল তথ্য কীভাবে অবদান রাখছে তা পর্যবেক্ষণ করা;
- ওই উদ্যোগ কার্যকর করার সীমাবদ্ধতা এবং জনগণের তথ্য জানার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রতিকূলতা চিহ্নিত করা এবং
- গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী বা নীতি-নির্ধারকদের জন্য কৌশলগত সুপারিশ প্রণয়ন করা।

৩. গবেষণার পদ্ধতি

এই গবেষণায় গুণগত এবং পরিমাণগত উভয় পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। আধা কাঠামোগত সাক্ষাৎকার, নিবিড় সাক্ষাৎকার, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি) ও জরিপের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। জরিপের তথ্য সংগ্রহের জন্য কাঠামোবদ্ধ ও আধা কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্র, নিবিড় সাক্ষাৎকার ও এফজিডির তথ্য সংগ্রহের জন্য চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়েছে। সরকারি ও টিআইবির উদ্যোগ কার্যকর করার সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে আধা কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রধান শিক্ষক, স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির (এসএমসি) সভাপতি এবং শিক্ষক-অভিভাবক সমিতির (পিটিএ) সদস্যদের কাছ থেকে নিবিড় সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নির্বাচিত বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষদের কাছ থেকে এফজিডি ও শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের কাছ থেকে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্র ব্যবহার করে জরিপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। স্ট্যাটিসটিকাল প্রোগ্রাম ফর সোশ্যাল সায়েন্স (এসপিএসএস) সফটওয়্যার ব্যবহার করে এই গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ গবেষণায় দুটি উদ্যোগের মধ্যে তুলনা, সুনির্দিষ্টভাবে দুটি উদ্যোগের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, জবাবদিহি মডেল, তথ্যের ব্যবহার, উপকারিতা, দুটি উদ্যোগের সীমাবদ্ধতা এবং উত্তরণের উপায় সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৪. গবেষণার উল্লেখযোগ্য ফলাফল

উন্মুক্ত স্কুল তথ্যের ভিত্তিতে তুলনা

টিআইবির কার্যক্রম পরিচালিত স্কুলগুলোর প্রায় সব প্রধান শিক্ষক (১০ জন), এসএমসি সদস্য (৯ জন) এবং পিটিএ সদস্যরাই তাদের বিদ্যালয়ের সাথে অন্য বিদ্যালয়ের তুলনা করার জন্য

উন্মুক্ত স্কুল তথ্য ব্যবহার করে থাকেন, যা টিআইবি কার্যক্রম পরিচালিত নয় এমন বিদ্যালয়গুলোতে কিছুটা কম লক্ষণীয়। জরিপে দেখা যায়, টিআইবি কার্যক্রম পরিচালিত স্কুলগুলোর ৭১ দশমিক ২ শতাংশ অভিভাবক উন্মুক্ত স্কুল তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তাদের স্কুলের সাথে অন্যান্য স্কুলের তুলনা করে থাকেন, যা টিআইবি কার্যক্রম পরিচালিত স্কুলের বাইরের স্কুলের ক্ষেত্রে অনেক কম, ৪৭ দশমিক ৩ শতাংশ। টিআইবি কার্যক্রম পরিচালিত স্কুলের প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক, পিটিএ সদস্য এবং এসএমসি সদস্যরা স্কুলের উন্নয়ন নিয়ে অধিক সচেতন হওয়ায় তারা বিভিন্ন মানদণ্ডের ভিত্তিতে তাদের বিদ্যালয়টিকে তুলনা করে থাকেন (নিচের সারণি ১ দেখুন)।

সারণি ১ : উন্মুক্ত স্কুল তথ্যের ভিত্তিতে অভিভাবক, প্রধান শিক্ষক, এসএমসি সদস্য এবং পিটিএ সদস্যদের বিদ্যালয়ের তুলনার চিত্র (একাধিক উত্তর প্রযোজ্য)

তুলনার ধরন	অভিভাবক (%)		প্রধান শিক্ষক (সংখ্যা)		এসএমসি (সংখ্যা)		পিটিএ (সংখ্যা)	
	টিআইবি (n=১২৫)	টিআইবির বাইরে (n=৩৫)	টিআইবি	টিআইবির বাইরে	টিআইবি	টিআইবির বাইরে	টিআইবি	টিআইবির বাইরে
স্কুলের এক বছরের অবস্থার সাথে অন্য বছরের তুলনা	৭৬.৪% (৬৮)	৬৭.৬% (২৩)	২	৫	৩	২	৩	
বিভিন্ন মানদণ্ডের অবস্থার ভিত্তিতে তুলনা	৭৪.২% (৬৮)	৭৩.৫% (২৫)	৬	৪	৭	৬	৬	১
একই ধরনের অন্যান্য স্কুলের সাথে তুলনা	৩৮.২% (৩৪)	৮.৮% (৩)	৫	৫	৫	২	৩	৫
একই জেলার অন্যান্য স্কুলের সাথে তুলনা	১০.২% (১০)	৫.৯% (২)	২	২	২	-	২	২
অন্যান্য তুলনা	-	-	১	-	৩	২	২	২

উৎস : জরিপের তথ্য

উভয় উদ্যোগের ক্ষেত্রে শিক্ষাসেবাবিষয়ক জবাবদিহিই প্রধান আলোচনার বিষয় হিসেবে পরিলক্ষিত

টিআইবির কার্যক্রম পরিচালিত স্কুল কিংবা তার বাইরের স্কুল উভয় ধরনের স্কুলের ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের শিক্ষাসংক্রান্ত জবাবদিহিই বেশি দেখা যায়। টিআইবি কার্যক্রমবিহীন স্কুলগুলোর সহকারী শিক্ষকদের মতে, শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার মান এবং পরীক্ষার ফলাফলই মা সমাবেশগুলোতে প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে থাকে। ফলে শিক্ষকরা অভিভাবকদের দায়িত্ব, যেমন বাচ্চার স্কুলের পোশাক, স্কুল ব্যাগ, তাদের বাড়ির কাজ দেখাশোনা এবং পরীক্ষার প্রস্তুতি সম্পর্কে সচেতনতামূলক আলোচনাই বেশি করে থাকে। জরিপে দেখা গেছে, অভিভাবকরা শিক্ষাসংশ্লিষ্ট কিছু সুনির্দিষ্ট তথ্য যেমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা, তাদের উপস্থিতি এবং তাদের পরীক্ষার ফলাফল বিষয়গুলোই বেশি উপযোগী বলে মনে করছেন। ব্যবস্থাপনা জবাবদিহিও

(Management Accountability) উভয় উদ্যোগের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। আর্থিক জবাবদিহি সরকারি প্রাথমিক স্কুলগুলোতে থাকলে তা কেবলমাত্র শিক্ষা অফিসগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। উভয় উদ্যোগের ক্ষেত্রেই অভিভাবক ও স্থানীয় সমাজের ব্যক্তিদের কাছে আর্থিক জবাবদিহির বিষয়টি থাকার বাধ্যবাধকতা নেই। তবে উন্মুক্ত স্কুল তথ্য জানার কারণে কমিউনিটির লোকজনের কাছে কিছুটা আর্থিক জবাবদিহি স্বাভাবিকভাবেই হয়ে থাকে।

চিত্র ১ : তথ্য জানার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে অভিভাবকদের মতামতের মাত্রা

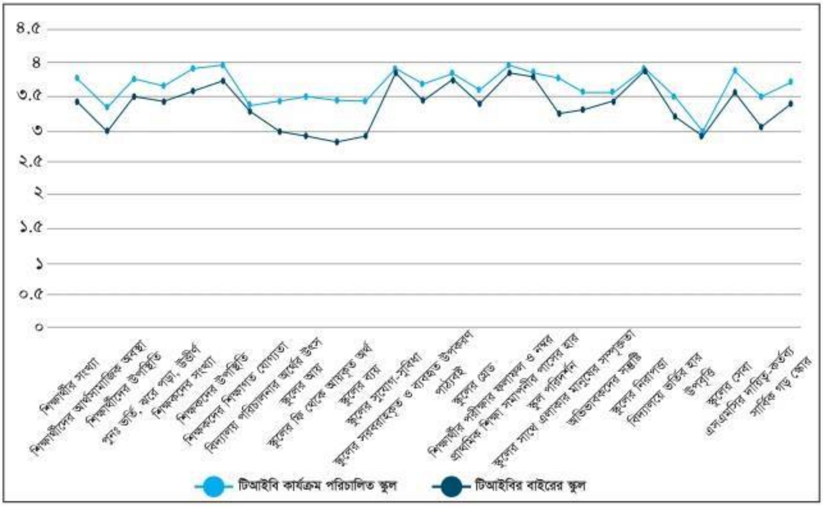

জন অংশগ্রহণমূলক জবাবদিহি মডেলের মতো বিভিন্ন ধরনের জবাবদিহি অভিভাবকদের মধ্যে মালিকানাবোধ তৈরি করে

টিআইবি কার্যক্রম পরিচালিত স্কুলগুলোতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য জন অংশগ্রহণমূলক জবাবদিহি মডেল অনুসরণ করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, টিআইবি কার্যক্রম পরিচালিত স্কুলগুলোতে অভিভাবকরা স্কুলে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে টিআইবি কার্যক্রম পরিচালিত নয় এমন স্কুল থেকে অনেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। টিআইবির কার্যক্রম পরিচালিত স্কুলগুলোতে অভিভাবকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার সীমাবদ্ধতাকে বিবেচনায় নিয়ে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। টিআইবির উদ্যোগে কিছু বিকল্প পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। যেমন- টিআইবি মা সমাবেশ অনুষ্ঠানে তথ্য ও পরামর্শ ডেস্কের মাধ্যমে তথ্য প্রদান করে এবং মা সমাবেশে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা করে থাকে। টিআইবি মা সমাবেশ ও অভিভাবক সমাবেশে অভিভাবকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের বিস্তৃত কর্মসূচির আয়োজন করে থাকে, যাতে তারা স্কুল কর্তৃপক্ষকে তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের জন্য জবাবদিহি করতে পারেন।

টিআইবির কার্যক্রম পচালিত স্কুলগুলোতে নিম্নগামী-বহিরাগত জবাবদিহি অভিভাবকদের ক্ষমতায়ন করেছে

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, টিআইবি পরিচালিত স্কুলগুলোতে অভিভাবকদের মুখ্য অংশীজন হিসেবে দেখা হয়। টিআইবি অভিভাবকদের সচেতনতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করে এবং মা সমাবেশ ও অভিভাবক সমাবেশে তাদের অংশগ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি করে, যাতে তারা শিক্ষকদের দায়িত্ব-কর্তব্য, স্কুলের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা; যেমন শ্রেণিকক্ষ, টয়লেট, শিক্ষকদের অনুপস্থিতি ইত্যাদি সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষকদের তথা সার্বিকভাবে স্কুল কর্তৃপক্ষকে জবাবদিহি করতে পারেন।

সারণি ২ : জবাবদিহি লাইনের তুলনা

অংশীজনের সম্পৃক্ততা	টিআইবি কার্যক্রম পরিচালিত স্কুল	টিআইবির বাইরের স্কুল
তথ্য সংগ্রহ	টিআইবি, স্কুল	স্কুল
ফরমেটিং	টিআইবি, ডিপিই	ডিপিই
তথ্য প্রদান	টিআইবি (কর্মকর্তা-কর্মচারী, ইয়েস, সিসিসি), স্কুল	ব্যানবেইজ, ডিপিই, ডিইও, ইউও, স্কুল
প্রশাসনিক পর্যায়ে ব্যবহার	স্কুল, ইউইও অফিস	স্কুল, ইউউও, পিইও, ডিপিই
কে কাকে জবাবদিহি করে	শিক্ষক এসএমসি ও অভিভাবকদের কাছে	শিক্ষক এসএমসি ও ইউইও-এর কাছে
জবাবদিহির ধরন	নিম্নগামী এবং বহিঃস্থ	উর্ধ্বগামী ও অভ্যন্তরীণ

৪.৫ উভয় ক্ষেত্রে উন্মুক্ত স্কুল তথ্যের দৃশ্যমান ব্যবহার

উভয় ক্ষেত্রে অভিভাবক ও সমাজের অন্যান্য লোকের তথ্য জানানোর সুস্পষ্ট উদাহরণ রয়েছে। চিত্র ২-এ দেখা যাচ্ছে যে উভয় উদ্যোগের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত স্কুল তথ্যের ব্যবহারের ক্ষেত্রে তেমন

চিত্র ২ : অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির মাত্রা বুঝতে উন্মুক্ত স্কুল তথ্যের ব্যবহার সম্পর্কে অভিভাবকদের মতামত (% অভিভাবক)

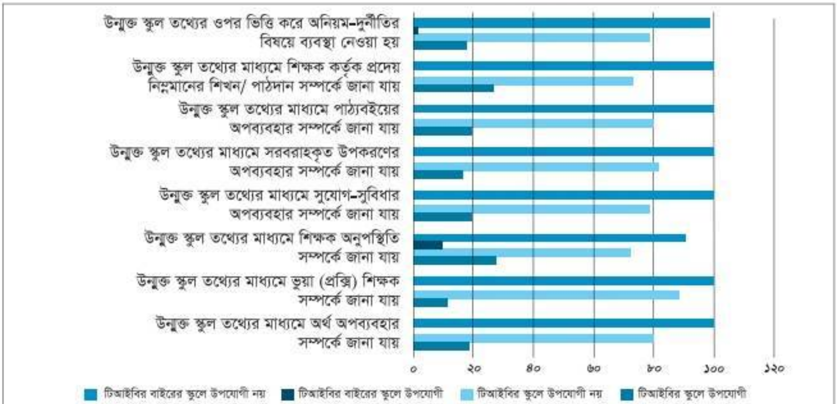

উৎস : মাঠ জরিপ তথ্য

মূল্যায়ন কমিটি গঠন প্রভৃতি সম্পন্ন করে। অন্যদিকে মাধ্যমিক ও কাগজ কেনার ক্ষেত্রে এনসিটিবি নামের তালিকা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠায় এবং সেখান থেকে অনুমোদন করা হয়। এরপর এনসিটিবি দরপত্র-সংক্রান্ত সব কার্যক্রম যেমন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, উন্মুক্তকরণ কমিটি গঠন, মূল্যায়ন কমিটি গঠন প্রভৃতি সম্পন্ন করে।

দরপত্র কমিটি গঠনের সাথে সাথে মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের জন্য এনসিটিবি তদারকি প্রতিষ্ঠান নিয়োগ দেয়, যা পরবর্তী সময়ে দরপত্র-সংক্রান্ত কার্যক্রম ও মুদ্রণ কার্যক্রম তদারকি করে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের জন্য পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ অনুযায়ী সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) বিভাগ উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান করার ব্যবস্থা করে। পাঠ্যক্রম বিভাগ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে মাঠপর্যায় থেকে বার্ষিক বইয়ের চাহিদা সংগ্রহ করে কাগজসহ ও কাগজ ছাড়া দুই ধরনের দরপত্র আহ্বান করে। এনসিটিবি অংশগ্রহণকারী মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের দাখিলকৃত অবকাঠামো, কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করার জন্য সাত সদস্যবিশিষ্ট মূল্যায়ন কমিটি তালিকা তৈরি করে এনসিটিবির বোর্ড সভায় পেশ করে এবং চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যাদেশ দেওয়া হয় এবং মুদ্রণ কার্যক্রম শুরু হয়। মুদ্রণ শেষ হওয়ার পর মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানগুলো জেলা/ উপজেলা পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তক পাঠায়। মুদ্রণ চলাকালীন এনসিটিবি ও তদারকি প্রতিষ্ঠান মুদ্রণ কার্যক্রম এবং সরবরাহ তদারকি করে (চিত্র ২ দ্রষ্টব্য)।

চিত্র ২ : পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা ও সরবরাহ-প্রক্রিয়া

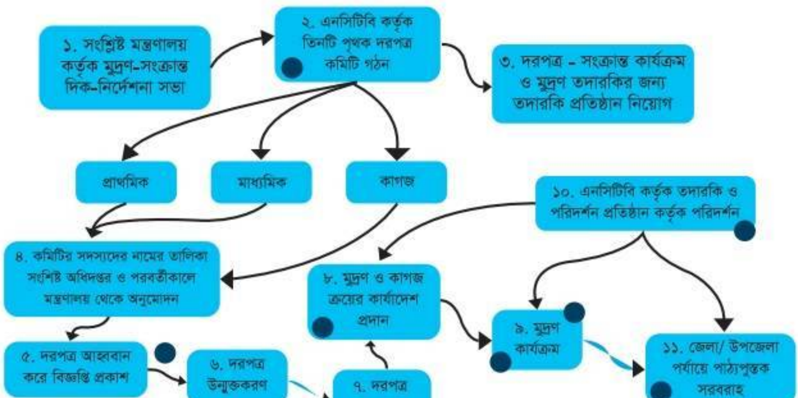

৮. পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা ও সরবরাহ-প্রক্রিয়ায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

৮.১ দরপত্র আহ্বান

দরপত্র আহ্বানের আগে প্রাক্কলিত দর দরপত্র কমিটির সদস্য ছাড়া অন্য কারও জানার নিয়ম না থাকলেও এনসিটিবির দরপত্র কমিটির একাংশ পছন্দের মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানকে আগেই দর জানিয়ে

পার্থক্য নেই। টিআইবি উদ্যোগের বাইরের স্কুলগুলোতে স্কুলের অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতি বিষয়ে তথ্য জানার ক্ষেত্রে উন্মুক্ত স্কুল তথ্য অভিভাবকদের জন্য তেমন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। টিআইবির কার্যক্রম পরিচালিত স্কুলের অভিভাবকরা বিদ্যালয়ের অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতি সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে উন্মুক্ত স্কুল তথ্য কিছুটা কার্যকর হলেও তা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। তবে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে উন্মুক্ত স্কুল তথ্যের কার্যকারিতায় উভয় উদ্যোগের মধ্যে তেমন তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য দেখা যায় না। বেশির ভাগ অভিভাবক আর্থিক বিষয়, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি সম্পর্কে তথ্য জানার থেকে তাদের সন্তানদের শিক্ষা ও স্কুলের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে তথ্য জানতে বেশি আগ্রহ অনুভব করে থাকেন।

টিআইবি কার্যক্রম পরিচালিত স্কুলের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত স্কুল তথ্যের ফলে সমাজে কিছু স্বল্পমেয়াদি প্রভাব গবেষণায় উঠে এসেছে। উল্লেখযোগ্য প্রভাব নিচে তুলে ধরা হলো।

সামাজিক উদ্যোগ : স্কুলে বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতি সম্পর্কে তথ্য প্রকাশের পরে সমাজের লোকজন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জরিপে দেখা গেছে, ১৭ দশমিক ৬ শতাংশ অভিভাবক জানান যে টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির তথ্য প্রকাশের পরে তারা কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

স্কুল কর্তৃপক্ষকে জবাবদিহি করার জন্য অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি : গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, টিআইবির কার্যক্রম পরিচালিত স্কুলে উন্মুক্ত স্কুল তথ্যের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অভিভাবক, এসএমসির সদস্য এবং পিটিএর সদস্যরা তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। এসএমসি ও পিটিএর সদস্যরা তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে আগের তুলনায় বেশি সক্রিয় হয়েছেন।

শিক্ষক ও এসএমসির সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পেয়েছে : গবেষণায় দেখা গেছে, টিআইবির কার্যক্রম পরিচালিত স্কুলে শিক্ষকরা তথ্য উন্মুক্ত করার প্রতি আগের তুলনায় বেশি সক্রিয় হয়েছেন। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের প্রতি শিক্ষকদের আচরণ আগের তুলনায় ভালো হয়েছে। তারা শিক্ষার্থীদের প্রতি আরো যত্নশীল হয়েছেন। টিআইবি কার্যক্রম পরিচালিত স্কুলের শিক্ষকরা জানান, টিআইবির কাজের ফলে শিক্ষকদের দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পেয়েছে, তারা আগের তুলনায় বেশি সময়ানুবর্তী হয়েছেন এবং ক্লাসে পাঠদানে সক্রিয় হয়েছেন।

টিআইবি কার্যক্রম পরিচালিত স্কুলে নিয়মিত মা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় : টিআইবির কার্যক্রম পরিচালিত স্কুলের শিক্ষকদের মতে, তারা টিআইবির সহায়তায় নিয়মিতভাবে মা সমাবেশের আয়োজন করেন এবং তাদের মতে, টিআইবি যে প্রশ্নোত্তর পর্ব ও উন্মুক্ত আলোচনা অভিভাবকদের মা সমাবেশ ও অভিভাবক সমাবেশে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করেছে। উল্লেখ্য, টিআইবির কার্যক্রম পরিচালিত নয় এমন স্কুলে নিয়মিত মা সমাবেশ হয় না।

ইতিবাচক চর্চার অনুকরণ : কয়েকজন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জানান যে তারা টিআইবির কার্যক্রম ও এর ভালো ফলাফল যেসব স্কুলে টিআইবির কার্যক্রম নেই, সেসব স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানান, যাতে তারা টিআইবির কার্যক্রমের মতো করে তারাও তাদের স্কুলে এসব ইতিবাচক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন।

৪.৬ উন্মুক্ত স্কুল তথ্য উদ্যোগের সফলতার উল্লেখযোগ্য কারণ

জরিপে দেখা গেছে, উন্মুক্ত স্কুল তথ্য উদ্যোগের সাফল্যের পেছনে বিভিন্ন কারণ রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে, উন্মুক্ত স্কুল তথ্যের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে তথ্যের অভিগম্যতাই প্রধান কারণ। টিআইবির কার্যক্রম পরিচালিত স্কুলের ৯৫ দশমিক ২ শতাংশ অভিভাবকের মতে, স্কুলের তথ্যের অভিগম্যতাই সবচেয়ে বেশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে সফলতার জন্য কাজ করছে, যা টিআইবি কার্যক্রমবিহীন স্কুলের ক্ষেত্রে ৪১ দশমিক ৯ শতাংশ। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে তথ্যের সহজবোধ্যতা, যা টিআইবি স্কুলগুলোতে ৮৪ দশমিক ৮ শতাংশ, যা টিআইবির বাইরের স্কুলগুলোতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ (৫৫ দশমিক ৪ শতাংশ) হিসেবে দেখা গেছে। এ ছাড়া সঠিক ও হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ ও উপস্থাপনার সক্ষমতা এবং তথ্যের ভিত্তিতে স্কুল, অভিভাবক ও সমাজের ব্যক্তিদের ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতাও উন্মুক্ত স্কুল তথ্যের সফলতার পেছনে কাজ করে বলে জরিপে তথ্য পাওয়া যায়।

সারণি ৩ : উন্মুক্ত স্কুল তথ্য উদ্যোগের চিহ্নিত সফলতার কারণ-সম্পর্কিত অভিভাবকদের মতামত (একাধিক উত্তর প্রযোজ্য)

সফলতার কারণ	টিআইবি স্কুল (সংখ্যা)	টিআইবির বাইরের স্কুল (সংখ্যা)
সঠিক ও হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ ও উপস্থাপনার সক্ষমতা	৭৪.৪% (৯৩)	৪৫.৯% (৩৪)
তথ্যের সহজবোধ্যতা	৮৪.৮% (১০৬)	৫৫.৪% (৪১)
তথ্যের সহজ প্রাপ্তি বা অভিগম্যতা	৯৫.২% (১১৯)	৪১.৯% (৩১)
তথ্যের ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা	২৬.৪% (৩৩)	৫.৪% (৪)
তথ্যের ভিত্তিতে অভিভাবক ও এলাকাবাসীর ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা	২৪.৮% (৩১)	৬.৮% (৫)
অন্যান্য	-	৮.১% (৬)

৫. উপসংহার

অভিভাবকসহ স্কুলের অংশীজনদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, টিআইবি কার্যক্রম পরিচালিত স্কুলের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত স্কুল তথ্য স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধিকরণ ও দুর্নীতির ঝুঁকি কমাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তবে গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে কোনো স্কুলের উদ্যোগের মাধ্যমেই স্কুল কর্তৃপক্ষ অভিভাবকদের কাছে আর্থিক-বিষয়ক তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ করে না; বরং স্কুলগুলো বেশির ভাগ সময় শিক্ষা এবং ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত বিষয়ে স্বল্পাকারে তথ্য প্রকাশ করার প্রতি বেশি আগ্রহী থাকে। অন্যদিকে জরিপে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, শিক্ষা ও ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত তথ্যগুলো প্রকাশের সময় কখনো কখনো পরোক্ষভাবে আর্থিক সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করে, যার মাধ্যমে অভিভাবকরা স্কুলের দুর্নীতির ঝুঁকি সম্পর্কে জানতে পারেন এবং তারা বিভিন্নভাবে ওই অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেন।

মাঠপর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে অভিভাবক, এসএমসির সদস্য, শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের স্কুল তথ্যের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করার জন্য সুশীল সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলো (সিএসও) কিছু অতিরিক্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে এবং এর মাধ্যমে তারা স্কুলগুলোতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি

প্রতিষ্ঠায় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। অভিভাবকরা যেন স্কুলের তথ্যগুলো সঠিকভাবে বুঝতে পারেন এবং তথ্যগুলো তাদের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছায়, সে বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে মা সমাবেশ, ভাঁজপত্র বিতরণ এবং তথ্য ডেস্ক ইত্যাদির মতো কিছু অতিরিক্ত উদ্যোগ সুশীল সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রহণ করে থাকে, যার মাধ্যমে অভিভাবকরা মা সমাবেশ ও অভিভাবক সমাবেশে উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। তবে এ ধরনের কার্যক্রম টিআইবি কার্যক্রমবিহীন স্কুলগুলোতে দেখা যায় না। সরকারি উদ্যোগে পরিচালিত স্কুলগুলোতে জবাবদিহির পথটি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বগামী এবং অভ্যন্তরীণ, যা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষা অফিসগুলোর মধ্যে এবং স্বল্পাকারে এসএমসির কাছে সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে সুশীল সমাজের প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে পরিচালিত স্কুলে জবাবদিহির পথটি হচ্ছে নিম্নমুখী এবং বাহ্যিক, যা বিশেষভাবে অভিভাবক তথা সামগ্রিকভাবে সমাজের ব্যক্তিবর্গ পর্যন্ত বিস্তৃত।

গবেষণায় আরো দেখা যায় যে শুধু সরকারি উদ্যোগে পরিচালিত স্কুলগুলোর ক্ষেত্রে দারিদ্র্যপীড়িত ও গ্রামীণ এলাকার অভিভাবকরা তুলনামূলক কম দারিদ্র্যপীড়িত ও শহর এলাকার অভিভাবকদের তুলনায় কম তথ্য পেয়ে থাকেন। অন্যদিকে সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে পরিচালিত স্কুলগুলোতে শহর-গ্রাম ও আর্থসামাজিক অবস্থার ভিন্নতার কারণে অভিভাবকদের স্কুলের তথ্য প্রাপ্তিতে কোনো ভিন্নতা লক্ষ করা যায়নি। এ ছাড়া সুশীল সমাজের কার্যক্রমে পরিচালিত স্কুলগুলোতে অভিভাবকদের চাহিদা অনুসারে তথ্য প্রদানের চেষ্টা করা হয়, যা তাদের সবাইকে সমানভাবে উপকার করে এবং তাদের ভেতরে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

৬. সুপারিশ

উপরোল্লিখিত উপসংহারের তথ্যগুলোই গবেষণায় প্রাপ্ত প্রাধান ফলাফল। উন্মুক্ত স্কুল তথ্যের উদ্যোগগুলো আরো জোরালো ও কার্যকর করার মাধ্যমে স্কুলে মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, শিক্ষা ব্যবস্থাপক, স্কুল কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকদের জন্য নিচের সুপারিশগুলো তুলে ধরা হলো :

সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের জন্য সুপারিশ

স্কুলের তথ্য প্রচারের জন্য আইনগত বাধ্যবাধকতা থাকতে হবে : প্রাথমিক শিক্ষা খাতে স্কুল তথ্য প্রচারের আইনগত বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করতে হবে এবং তা সব সরকারি প্রাথমিক স্কুলে কার্যকর করতে হবে।

বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে : মা সমাবেশ ও অভিভাবক সমাবেশসহ অন্যান্য প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিটি প্রাথমিক স্কুলে অর্থের বরাদ্দ দিতে হবে, যাতে স্কুলগুলো তথ্য প্রচারের জন্য কিছু বাড়তি এবং কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ ও কার্যকর করতে পারে।

পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা : যেসব স্কুল তথ্য প্রদান এবং স্কুলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায় তুলনামূলক ভালো ফলাফল প্রদর্শন করে, তাদের পুরস্কৃত করতে হবে। অন্যদিকে যেসব স্কুল প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান এবং স্কুলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায় সফলতা প্রদর্শন করতে পারছে না, তাদের আরো ভালো করার প্রতি উৎসাহিত করতে হবে। তথ্য প্রকাশ কার্যক্রমে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

শিক্ষকসহ শিক্ষা ব্যবস্থাপকদের জন্য সুপারিশ

কার্যকর তথ্য প্রকাশ বিষয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ : তথ্য উন্মুক্তকরণ নীতিমালা, কার্যকর মা সমাবেশ ও অভিভাবক সমাবেশ আয়োজন সম্পর্কে সব শিক্ষক, বিশেষ করে প্রধান শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত মডিউল তৈরি করতে হবে।

নিয়মিত মা ও অভিভাবক সমাবেশের অয়োজন : মা সমাবেশগুলোতে সর্বোচ্চ সংখ্যক অভিভাবকদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, স্কুল তথ্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানানো, উন্মুক্ত আলোচনার ব্যবস্থা করা, মাল্টিমিডিয়া ও বিভিন্ন ধরনের ছবির ব্যবহার এবং ইতিবাচক চর্চাগুলো বেশি করে প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। ৬. প্রয়োজনীয় তথ্য নির্বাচন করা এবং তা প্রকাশ করা : স্কুলের আয়-ব্যয়, শিক্ষকদের অনুপস্থিতি, পরিদর্শন, শিক্ষার্থীদের আর্থসামাজিক অবস্থা, সেবা প্রাপ্তির নিয়ম (ফিসহ ও ফি ছাড়া), উপবৃত্তি পাওয়ার যোগ্যতা এবং পরিমাণ, এসএমসির সদস্যদের দায়িত্ব-কর্তব্য, অভিভাবকদের সন্তুষ্টির মাত্রা, সমাজের ব্যক্তিদের সম্পৃক্ততা, ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য প্রকাশ করতে হবে। স্কুলের অবৈধ কার্যক্রম যেমন অর্থ আত্মসাৎ, অপচয় ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক তথ্য খুঁজে বের করার জন্য শিক্ষা অফিসগুলো সমাজের লোকজন এবং স্থানীয় সুশীল সমাজের সদস্যদের সম্পৃক্ত করতে পারে।

নিয়মিত মতবিনিময় সভা বা সংলাপ আয়োজন : স্কুলের উন্নয়নের উদ্দেশ্য এবং স্কুলের অনিয়ম বন্ধ করার বিষয়ে আলোচনা করার জন্য শিক্ষক, এসএমসির সদস্য, শিক্ষা কর্মকর্তা ও অভিভাবকদের মধ্যে নিয়মিত মতবিনিময় সভা বা সংলাপের আয়োজন করতে হবে।

প্রণোদনার ব্যবস্থা করা : স্কুল তথ্য প্রকাশ কার্যক্রমগুলো এমনভাবে পরিকল্পনা ও সংগঠিত হওয়া প্রয়োজন যেন স্কুল কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবক উভয়ই এ কাজের উপকারিতা অনুধাবন করে এর সাথে সম্পৃক্ত হতে আগ্রহী হন। অভিভাবকদের মা সমাবেশ ও অভিভাবক সমাবেশে উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করা উচিত। স্কুলগুলো উন্মুক্ত স্কুল তথ্য কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য সবচেয়ে সক্রিয় মায়েদের জন্য ছোট উপহারের ব্যবস্থা করতে পারে।

স্কুলের সক্ষমতা (performance) **পরিবীক্ষণে সমাজের ব্যক্তিদের সম্পৃক্তকরণ :** সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড (সিআরসি) পরিচালনা করতে হবে। ওই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের কাজে সমাজের লোকদের সম্পৃক্ত করতে হবে। স্কুলের কর্মক্ষমতা সম্পর্কে সমাজের লোকদের সন্তুষ্টির মাত্রা চিহ্নিত করার জন্য এলাকার যুবকদের সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। সিআরসির তথ্য অভিভাবকসহ সব অংশীজনের জানার ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষক, এসএমসির সদস্য এবং সমাজের কিছু সদস্যের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা : শিক্ষক, এসএমসির সদস্য এবং নির্দিষ্ট কিছু অভিভাবক যেমন টিআইবির সক্রিয় মা ফোরামের সদস্যদের উন্মুক্ত স্কুল তথ্যের পদ্ধতিগত ও বাস্তবিক ব্যবহার সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষা কর্মকর্তারা এসব প্রশিক্ষণের সমন্বয় করতে পারেন। এ ছাড়া অভিভাবকরা মা সমাবেশ ও অভিভাবক সমাবেশ আয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারেন।

উন্মুক্ত স্থানে তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা : সব অংশীজনের জন্য তথ্য প্রাপ্তি বা অভিগম্যতা নিশ্চিত করার জন্য মনিটরিং বোর্ড, সিটিজেন চার্টার এবং অন্যান্য তথ্য বোর্ড উন্মুক্ত স্থানে রাখার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

নিয়মিত হোম ভিজিট করা : নিয়মিত হোম ভিজিট করতে হবে। হোম ভিজিটের সময়ে অভিভাবকদের জন্য কিছু তথ্য দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে তারা মা সমাবেশ ও অভিভাবক সমাবেশে আসার উপযোগিতা সম্পর্কে জানতে পারেন।

টিআইবি মা সমাবেশ পরিদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ : টিআইবি কার্যক্রমবহির্ভূত স্কুলের শিক্ষকদের ইতিবাচক চর্চা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেওয়ার জন্য টিআইবি পরিচালিত মা সমাবেশ ও অভিভাবক সমাবেশ পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

তথ্য দেওয়ার জন্য আকর্ষণীয় মাধ্যম ব্যবহার : টিআইবির কার্যক্রমবহির্ভূত স্কুলগুলো তথ্য প্রচারের জন্য কিছু নতুন মাধ্যম ব্যবহার করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে তারা লিফলেট, ছবি, মাল্টিমিডিয়া, নাটক, লোকগান ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারে। এ ছাড়া নিরক্ষর অভিভাবকদের তথ্য প্রাপ্তির বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হবে।

তথ্যসূত্র

Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics. Bangladesh Education Statistics 2016. http://www.banbeis.gov.bd/. Last accessed on 01 February 2017

Bangladesh Bureau of Statistics. District Statistics. 2011. http://bbs.gov-.bd/site/page/2888a55d-d686-4736-bad0-54b70462afda/ জেলা পরিসংখ্যান Last accessed on 22 February 2017

Bangladesh Bureau of Statistics. The World Bank and the World Food Programme. Poverty Map of Bangladesh, 2010. https://www.wfp.org/sites/default/files/Pover-ty%20Map%202010_Key%20Findings_BBS%20WB%20WFP.pdf. Last accessed 16 August, 2017.

Bangladesh Information Commission. Annual Report 2014. https://drive.google.com/drive/-folders/0B-HTZo8zqZrpfldYOUMzN-VNCV09XeFd1ZmpZdVhDTllnZnFPOFpVYVpBZm5XRjB1VnRIcFk. Last accessed on 12th July 2017

David Figlio and Susanna Loeb, School Accountability. In Eric A. Hanushek, Stephen Machin, and Ludger Woessmann, editor: Handbooks in Economics, Vol. 3, The Netherlands: North-Holland, 2011, pp. 383–421.

General Economics Division. Bangladesh Planning Division. Government of the People's Republic of Bangladesh Millennium Development Goal. Bangladesh Progress Report, 2015. September 2015.

Goetz, A.M. and Jenkins, R. (2001) "Hybrid Forms of Accountability: Citizen Engagement in Institutions of Public Sector Oversight in India", Public Management Review 3(3): 363-383.

Hooge, E., T. Burns and H. Wilkoszewski (2012), "Looking Beyond the Numbers:

Stakeholders and Multiple School Accountability", OECD Education Working Papers, No. 85, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/5k91dl7ct6q6-en

Lindberg, S. (2009) "Accountability: The core concept and its subtypes", Working Paper 1, African Power and Politics Research Programme, Overseas Development Institute, London.

Ministry of Education. Bangladesh Government. National Education Policy, 2010. http://old.moedu.gov.bd/index.php?option=com_content&task=view&id=338&Itemid=416. Last accessed on 16 th August 2017

Ministry of Information, Bangladesh Government. Right to Information Act, 2009. http://moi.portal.gov.bd/site/files/761c4f51-7a2e-4465-9272-e76d052495f5/ আইন - ইংরেজি). Last accessed on 16th August 2017.

Ministry of Primary and Mass Education. Five year Achievement in Primary Education, 2009-2013, http://www.mopme.gov.bd/site/page/d-fce77b9-0665-40e1-b07a-7485a686b0ac/five year achievement. Last accessed on 11 February 2017

Monitoring and Evaluation Division. Directorate of Primary Education. Annual Primary School Census 2016. December 2016. http://dpe.portal.gov.bd/sites/default/files/files/dpe.portal.gov.bd/publications/b490814d_522e_4f81_b0a0_8f8727feab27/Final%20APSC%202016,%2029%20December%202016.pdf. Last accessed on 16th August 2017

The Constitution of the People's Republic of Bangladesh. Bangladesh Government. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/pdf_part.php?id=367. Last accessed 16th August 2017

The World Bank (2008), Governance, Management, and Accountability in Secondary Education in Sub Saharan Africa, World Bank Working Paper 127, Washington DC.

গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ ও নগর উন্নয়নে জবাবদিহি খুলনা সিটি করপোরেশন, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং যশোর পৌরসভার ওপর একটি কেস স্টাডি*

ড. মো. আশিক উর রহমান

বিকেন্দ্রীকরণের সাফল্য নির্ভর করে স্থানীয় সরকারের জবাবদিহির উন্নয়নের ওপর। জবাবদিহি রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত। বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে জবাবদিহির অর্থ হলো কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে স্থানীয় সরকার ও জনগণের সম্পর্ক। যেহেতু চর্চার ওপর ভিত্তি করে বিকেন্দ্রীকরণের সমস্যার রকমফের হয়ে থাকে, স্থানীয় সরকারের সমস্যা তৈরির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ কিছু কারণ রয়েছে (ঊর্ধ্বমুখী ও নিম্নমুখী উভয় প্রকার জবাবদিহির ক্ষেত্রে)। বিকেন্দ্রীকরণের অস্তিত্ব থাকার পরেও বাংলাদেশে নগর উন্নয়নের জন্য জবাবদিহির ইস্যুটা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। এই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য গবেষণায় নগর উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত জবাবদিহির ঊর্ধ্বমুখী ও নিম্নমুখী ইস্যুগুলো শনাক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশে নগর উন্নয়নের যে চর্চা তার জবাবদিহির উন্নয়নের পথে সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনার কোনো প্রভাব আছে কি না, তা এই গবেষণায় খতিয়ে দেখা হয়েছে।

এই গবেষণায় মিশ্র পদ্ধতির গবেষণা কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। নগর উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জবাবদিহি বাস্তবায়নের পথে বাছাইকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন করার উদ্দেশ্যে সমীক্ষাটি চালানো হয়েছে যশোর পৌরসভা, খুলনা নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও খুলনা সিটি করপোরেশনের ওপর। প্রকাশিত-অপ্রকাশিত গবেষণা তথ্য বিশ্লেষণ, খানা জরিপ, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা ও প্রধান তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ব্যবহার করে গবেষণার উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। পরিমাণগত উপাত্ত সংগ্রহের জন্য কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্র পদ্ধতি এবং এর পাশাপাশি গুণগত কিছু উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ফোকাস গ্রুপ আলোচনা ও প্রধান তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। খুলনা ও যশোর শহরের ২১৮ জন উত্তরদাতাকে সতর্কতার সাথে শনাক্ত করা হয়েছে, যারা এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত এলাকাগুলোর মোট জনসংখ্যাকে প্রতিনিধিত্ব করেন, যেখানে স্ট্যান্ডার্ড এর ৬ দশমিক ৫ শতাংশ ও কনফিডেন্স লেভেল ৯৩ দশমিক ৫ শতাংশ।

নগরের বাসিন্দাদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ কাঠামোর প্রতিনিধিত্ব করে খুলনা সিটি করপোরেশন। দেখা গেছে, খুলনা সিটি করপোরেশন রাস্তা নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা সেবায়

*২০১৭ সালের ২ মার্চ টিআইবির সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল আলোচনায় প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

কমিউনিটির কোনো ধরনের অংশগ্রহণ অনুমোদন করেনি। উত্তরদাতাদের প্রায় ৯৫ শতাংশ জানান যে তারা কখনো স্থানীয় রাস্তা নির্মাণ ও মেরামতের কাজে অংশগ্রহণ করেননি। রাস্তার ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ লিপিবদ্ধ করার কোনো পদ্ধতি খুলনা সিটি করপোরেশনে নেই। উত্তরদাতাদের ৯৫ শতাংশের বেশি একমত যে এ ধরনের সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে স্থানীয় ওয়ার্ড কমিশনার ও রাজনীতিকদের সাথে অনানুষ্ঠানিক দর-কষাকষিই প্রধান উপায়। অধিকাংশ (৫২ শতাংশ) উত্তরদাতা রাস্তা মেরামতের বিষয়ে খুলনা সিটি করপোরেশনের ওপর তাদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। অন্যদিকে অধিকাংশ (৬৪ শতাংশ) উত্তরদাতা এলাকার রাস্তার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে তাদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। ৯০ শতাংশ অধিবাসী মনে করেন, ময়লা-আবর্জনা সংগ্রহের বর্তমান যে ব্যবস্থাপনা তা তাদের প্রয়োজন পূরণ করে না। মাত্র ১০ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন যে তারা সিটি করপোরেশনের বাজেট শুনানিতে অংশগ্রহণ করেছেন, কিন্তু একইসাথে তারা জানান যে বাজেট শুনানির বিষয়টি অংশগ্রহণমূলক ছিল না। তারা সিটি করপোরেশনের বাজেট ও অন্যান্য বিষয়ের কিছু তথ্য কেবল পেয়ে থাকেন। সমীক্ষায় দেখা যায়, বিরাটসংখ্যক উত্তরদাতা সিটি করপোরেশনের ওপর সন্তুষ্ট নন, যার প্রধান কারণ সিটি করপোরেশন মানুষের অগ্রাধিকার বাস্তবায়নে ব্যর্থ। অনুরূপভাবে অনেক উত্তরদাতা জানান, তারা তাদের মতামত প্রকাশ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না। তারা এও মনে করেন, অসহায় মানুষদের অধিকার খর্ব হওয়া রোধ করার জন্য সিটি করপোরেশনের কোনো যথাযথ উদ্যোগ নেই। এ ছাড়া একটি ব্যাপকসংখ্যক অধিবাসী স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাদের অংশগ্রহণের বিষয়ে সচেতন নন বলে জানান।

খুলনা সিটি করপোরেশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ প্রশ্নে দেখা যায়, অধিকাংশ নাগরিক (৮৯ শতাংশ) জনশুনানি, জনসভা ও পিটিশনের মতো প্রত্যক্ষ পদ্ধতির চেয়ে স্থানীয় পর্যায়ে ওয়ার্ড কমিশনার, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা ও সিটি করপোরেশনের কর্মকর্তাদের সাথে ভালো যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। দেখা যায় বাড়ির মালিকরা তাদের কাজকর্ম সম্পন্ন করে নেওয়ার জন্য স্থানীয় ওয়ার্ড কমিশনারদের সাথে যোগাযোগের একটি অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, যাদের ব্যক্তিগত যোগাযোগ নেই তারা একজন মধ্যস্থতাকারীকে বেছে নেন, যার সাথে সিটি করপোরেশনের সম্পর্ক রয়েছে বা যিনি সিটি করপোরেশনের একজন কর্মী। অধিবাসীদের অংশগ্রহণ খুব কম। কারণ তারা মনে করেন শেষ পর্যন্ত এই অংশগ্রহণ কোনো কাজে লাগবে না, যেহেতু এর দ্বারা তারা স্থানীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে কোনোভাবে প্রভাবিত করতে পারবে না। একইভাবে ৬১ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, স্থানীয় সরকার-সংক্রান্ত সচেতনতা তাদের মধ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন ও স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণের প্রবণতা তৈরি করে। জরুরি প্রয়োজনীয়তাবোধ স্থানীয় শাসন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের প্রবণতার আরেকটি নির্দেশক। ৬০ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন যে নাগরিকেরা অংশগ্রহণ করতে তখনই সম্মত হন, যখন তারা দেখেন যে এই সিদ্ধান্ত দ্বারা তাদের নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অনেক উত্তরদাতা (২৫ শতাংশের বেশি) মনে করেন, অর্থনৈতিক অবস্থা অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অন্যতম একটি নির্দেশক।

ওপরের আলোচনা থেকে কেন খুলনা সিটি করপোরেশনে স্থানীয় অধিবাসীদের অংশীদারত্ব কম তা বোঝা যায়। গবেষণায় দেখা যায় একজন ব্যক্তির অংশগ্রহণের অনীহার কারণ হতে পারে সচেতনতার ঘাটতি, অংশগ্রহণের ফলাফল সম্পর্কে নিরুৎসাহিত দৃষ্টিভঙ্গি এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনা পদ্ধতিতে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রক্রিয়ার ঘাটতি। এর ফলে অংশগ্রহণ এড়ানোর প্রবণতা তৈরি হয়। তাই খুলনা সিটি করপোরেশনে জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি লাভ করেনি।

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কেডিএ) নাগরিক সেবা প্রদানের সাংগঠনিক ধরনকে প্রতিনিধিত্ব করে। খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ সরকারের গণপূর্ত ও গৃহায়ণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি আধা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। কেডিএর প্রধান কাজ (১) শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোর জন্য মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করা, (২) মাস্টারপ্ল্যান অনুসরণ করে শহরের উন্নয়ন করা ও (৩) শহরের উন্নয়নকে নিয়ন্ত্রণ করা। খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় বোঝা যায় এই প্রতিষ্ঠান জনগণের অংশগ্রহণের মূলনীতি ধারণ করে। পরিকল্পনা-সংক্রান্ত বিভিন্ন দলিলে যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ-প্রক্রিয়ায় জনগণের তিন স্তরে অংশগ্রহণের কথা পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে। এটি চাহিদা নিরূপণে মধ্যস্থতা, পরিকল্পনার মান নির্ধারণ ও নকশা প্রণয়নে অংশগ্রহণের ওপর জোর দিয়েছে। তবে প্রাথমিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র নির্বাচিত কিছু প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সাথে অধিপরামর্শ করা হয় বলে জানা যায়। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে পেশাজীবী সংগঠন, নাগরিক সমাজের সংগঠন, ব্যবসায়ী, গণমাধ্যম, রাজনৈতিক নেতা ও শিক্ষক। জমির মালিকদের জমি ব্যবহারের অনাপত্তিনামা (NOC) প্রস্তুত করার কাজে সহায়তা করার জন্য কেডিএতে কোনো ইউনিট নেই। তা ছাড়া জমির মালিকদের অভিযোগ উত্থাপনের জন্য সেখানে কোনো অভিযোগ প্রতিবিধান প্রক্রিয়াও নেই। এ কারণে পরিকল্পনা প্রণয়নের অনুমতি প্রদানের প্রক্রিয়াটি জবাবদিহিমূলক নয়। দেখা গেছে, ৮৬ দশমিক ৩ শতাংশ মানুষ এসব কাজ করিয়ে নেওয়ার জন্য কেডিএর কর্মকর্তা, স্থপতি প্রতিষ্ঠান বা কেডিএর বাইরের কোনো প্রতিনিধিকে টাকা দিচ্ছেন। এসব অনানুষ্ঠানিক মাধ্যমের মধ্যে কেডিএর কর্মকর্তাদের (৮১ দশমিক ৪ শতাংশ) এই টাকার অধিকাংশ পেয়ে থাকেন।

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ ১৯৬১-এর ধারা ২৩ অনুসারে কেডিএ তার সেবাগ্রহীতাদের ভবন নির্মাণের অনুমতি প্রদান করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেডিএর পক্ষ থেকে উন্মুক্ত স্থান (সেটব্যাক) রাখার নিয়ম ভঙ্গের বিষয়ে আপত্তি ওঠে (৩৫ দশমিক ৫ শতাংশ)। অন্যান্য আপত্তির মধ্যে রাস্তার প্রশস্তি, মাস্টারপ্ল্যান প্রস্তাবনার লঙ্ঘন, ভবনের নকশাজাত ত্রুটি, নামপত্তন ও সুখাধিকারের দলিল ইত্যাদি। অভিযোগ নিষ্পত্তি-প্রক্রিয়া ছাড়া এ ধরনের আপত্তি আরেক ধরনের দুর্নীতির উৎস। অভিযোগ দাখিলের প্রক্রিয়াটি জবাবদিহিমূলক না হওয়ার ফলে নাগরিকরা তাদের আপত্তি-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করে থাকেন অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার থেকে দেখা যায়, অভিযোগ দাখিলের প্রক্রিয়াটি জবাবদিহিমূলক নয় এবং প্রায়ই চেয়ারম্যান নিজেই আপত্তি উত্থাপন করেন। ভবন নির্মাণের অনুমতি প্রাপ্তির ওপর সন্তুষ্টি সূচকের ওপর উপরোল্লিখিত কারণগুলোর সরাসরি প্রভাব রয়েছে। এসব কারণেই নাগরিকরা তাদের ভবন নির্মাণের সময় নিয়মনীতি লঙ্ঘন করেন।

বাছাই করা এলাকায় জরিপে উত্তরদাতাদের ৯৮ শতাংশ কেডিএর পরিকল্পনা প্রণয়ন-প্রক্রিয়ায় জড়িত ছিলেন না বলে জানান। যারা অংশগ্রহণ করতে চান তাদের ৪৫ শতাংশ স্থানীয় ওয়ার্ড/কমিউনিটি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ-প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে চান, যদিও সিদ্ধান্ত গ্রহণ-প্রক্রিয়ায় এ ধরনের অংশগ্রহণের কোনো প্রক্রিয়া কেডিএর নেই। এই সমীক্ষা থেকে এটা পাওয়া যায় যে এ ধরনের গণশুনানি তাদেরই আকর্ষণ করে, যারা মনে করেন প্রস্তাবিত পরিকল্পনা দ্বারা তাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সুযোগ আছে (১৮ দশমিক ৪ শতাংশ)। এর বাইরে ২৩ শতাংশ অংশগ্রহণ করে থাকেন শুধু তথ্য সংগ্রহের জন্য। কাজেই জনগণের অংশগ্রহণের হার সক্রিয় নাগরিকত্বকে নির্দেশ করে না, যেটি কেডিএকে জনগণের কাছে আরও জবাবদিহিমূলক করে তুলতে পারত। এ গবেষণা থেকে পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং দ্বন্দ্ব নিরসনে কার্যকর উদ্যোগের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা প্রণয়নকারী সংস্থা হিসেবে কেডিএর সীমাবদ্ধতাও লক্ষ করা যায়। এ ছাড়া কেডিএর সিদ্ধান্ত দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতিকার পাওয়ার বিষয়ে কোনো প্রক্রিয়ার সুযোগ রাখা হয়নি। একইভাবে কেডিএর কার্যক্রমে জনগণের অভিযোগ বা পরামর্শ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কি না, তা জনগণকে জানানোর কোনো ব্যবস্থা নেই।

যশোর বাংলাদেশের অন্যতম পুরোনো পৌরসভা। ১৮৬৪ সালে এর প্রতিষ্ঠা হয়। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে নগর উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এটি বিকেন্দ্রীকরণের একটি উদাহরণ। যশোর পৌরসভা স্থানীয় সরকার আইন ২০০৯-এ উল্লিখিত কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দেখা গেছে, যশোর পৌরসভা রাস্তাঘাট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে কমিউনিটি অংশগ্রহণকে অনুমোদন করে। রাস্তাঘাট নির্মাণের প্রক্রিয়ায় বা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে উত্তরদাতাদের ৭৪ শতাংশ অংশগ্রহণ করেছেন বলে জানান। তারা নিজেদের গরজেই সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে ও তাদের কমিউনিটির মাধ্যমে তাদের এলাকায় এ কাজে যুক্ত হয়েছেন। তারা সবাই স্বপ্রণোদিত হয়ে যশোর পৌরসভার রাস্তা নির্মাণ কার্যক্রম তদারকির মাধ্যমে নতুন রাস্তা তৈরি বা পুরোনো রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছেন। ওয়ার্ড পর্যায়ের সমন্বয় কমিটি (ডব্লিউএলসিসি) ও শহর পর্যায়ের সমন্বয় কমিটির (টিএলসিসি) শক্তিশালী উপস্থিতির জন্য এটি সম্ভব হয়েছে। দেখা গেছে যশোর পৌরসভায় রাস্তাঘাট নির্মাণ ও মেরামতের বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপনের জন্য একটি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি রয়েছে এবং উত্তরদাতাদের ৩৪ শতাংশ এসব সেবা নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন। তারা সাধারণত অভিযোগ করার ছয় মাসের মধ্যে সাড়া পেয়েছেন বলে জানান।

বিভিন্ন ধরনের নগর উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, যেমন অবকাঠামো পরিকল্পনা, দৈনন্দিন সেবা মনিটরিং, পৌরসভার বাজেট অনুমোদন ইত্যাদি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত যশোর পৌরসভার সভায় নেওয়া হয়। পৌরসভার এসব সভায় অধিবাসীদের উপস্থিতি একটি অনন্য দৃষ্টান্ত। ধারাবাহিকভাবে এসব সভা অনুষ্ঠিত হয় যার সিদ্ধান্ত ভোটের ভিত্তিতে গৃহীত হয়। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন-২০০৯ অনুসারে পৌরসভার সভায় অংশগ্রহণের বিষয়টি কোনো ধরনের ব্যক্তির জন্যই নিষিদ্ধ নয়, ফলে সেখানে নির্বাচিত, মনোনীত ও সাবেক কর্মকর্তা এবং স্থানীয় সরকারের সাথে সম্পর্কিত অন্য যেকোনো নিয়োজিত কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তাসহ যে কেউ অংশগ্রহণ করতে পারেন। এ ছাড়া প্রতিটি সভা জনগণের জন্য উন্মুক্ত। যশোর পৌরসভা স্থানীয় সরকারের গণশুনানি, কাউন্সিল মিটিং, শহর পর্যায়ের সমন্বয় সভা ও পৌরসভার সম্মেলনের মতো সব অনুষ্ঠানে তার

নাগরিকদের অংশগ্রহণের সুযোগ রেখেছে। যশোর পৌরসভার সুশাসন কাঠামোয় ওয়ার্ড পর্যায়ের সমন্বয় কমিটি ও শহর পর্যায়ের সমন্বয় কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। দেখা গেছে, ৪৮ শতাংশ উত্তরদাতা পৌরসভার বাজেটের গণশুনানিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ভবন নির্মাণের আগে যেকোনো প্লটের মালিককে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন-২০০৯ অনুসারে অনুমতির জন্য আবেদন করতে হয়। জরিপে দেখা যায় যে ৫০টি পরিবার (৮৮ শতাংশ) সরাসরি প্ল্যান পাসের জন্য আবেদন করেছিল, কিন্তু অপ্রয়োজনীয় সময়ক্ষেপণ এড়ানোর জন্য ৫৪ শতাংশ ঘুষ (স্পিড মানি) দিয়েছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা এই ঘুষ দিয়েছে যশোর পৌরসভার কর্মকর্তাদের। ভবন নির্মাণের অনুমতির জন্য যশোর পৌরসভার কর্তৃপক্ষ আপত্তি দেয়। ৩৬ শতাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় সেখানে সেটব্যাক নিয়ম লঙ্ঘিত হয়েছে। অন্যান্য আপত্তির মধ্যে রয়েছে নকশার ত্রুটি ও নামপত্তনের সমস্যা। উত্তরদাতাদের তরফ থেকেও এ ধরনের আপত্তি স্বীকার করা হয়েছে। ৭৬ শতাংশ উত্তরদাতা আপত্তি নিয়ে সন্তুষ্ট, যেখানে মাত্র ১০ শতাংশ আপত্তি-সংক্রান্ত অভিযোগ করেছিলেন। আপত্তি নিষ্পত্তিতে ভবনের নকশার পরিমার্জন একটি সাধারণ প্রক্রিয়া, যেখানে ৯০ শতাংশ উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে তারা নকশায় প্রয়োজনীয় সংশোধন করার পর অনুমোদন লাভ করেছেন। অভিযোগ জানানোর প্রক্রিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তারা জানান যে স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলরের সাথে নেটওয়ার্কিংই এ সমস্যা থেকে তাদের বাঁচায়। দেখা গেছে, অভিযোগ প্রতিবিধান প্রক্রিয়া যশোর পৌরসভায় কাজ করছে। এ থেকে যশোর পৌরসভায় কমিউনিটির অংশগ্রহণ কেন এত বেশি তা বোঝা যায়। যশোর পৌরসভায় রয়েছে প্রকল্প বাস্তবায়নে কমিউনিটির সমন্বয়, অভিযোগ প্রতিবিধান প্রক্রিয়া হিসেবে স্বাধীন অভিযোগ সেল, অংশগ্রহণমূলক বাজেটিং প্রক্রিয়া, প্রতিদিনের স্থায়ী কমিটি মিটিং, টিএলসিসি ও ডব্লিউএলসিসি সভা। এসব কারণে যশোর পৌরসভার শাসনকাঠামোতে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের অংশগ্রহণ রয়েছে।

স্বচ্ছ ও গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ-প্রক্রিয়ায় দেখা গেছে, খুলনা সিটি করপোরেশনের আনুষ্ঠানিক কাঠামোর বিকেন্দ্রীকরণ থাকার পরও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। নগর উন্নয়ন-সংক্রান্ত কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ-প্রক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিবেচনা করলে খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চিত্র সংকটাপন্ন। যেহেতু এ সংস্থাটি সাংগঠনিক প্রতিনিধিদল ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রতিনিধিত্ব করছে, এটি নাগরিকের অংশগ্রহণ ও মতামতকে গুরুত্ব দিতে অনাগ্রহী। যশোর পৌরসভার ক্ষেত্রে নাগরিকরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ-প্রক্রিয়ায় ওয়ার্ড পর্যায়ের সমন্বয় কমিটি ও শহর পর্যায়ের সমন্বয় কমিটির মধ্য দিয়ে অংশগ্রহণ করছেন। দেখা যায় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন-২০০৯-এ টিএলসিসি ও ডব্লিউএলসিসির বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ থাকলেও স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) আইন-২০০৯-এ এ বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। কাজেই এ গবেষণা খুলনা সিটি করপোরেশনে গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) আইন-২০০৯-এ টিএলসিসি ও ডব্লিউএলসিসি বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করছে। তবে অংশগ্রহণের কার্যকারিতার বিষয়ে নাগরিকের সংশয়বাদী মনোভাব ও সরকারি প্রক্রিয়া সম্পর্কে সীমিত জ্ঞান থাকার বিষয়টিও পরিলক্ষিত হয়েছে। কাজেই এ গবেষণার আরেকটি সুপারিশ হচ্ছে প্রতিষ্ঠানগুলোকে (ক) স্থানীয় সরকারের নীতি, কর্মসূচি, সেবা ও

উদ্যোগ সম্পর্কে জনগণকে জানানো, (খ) আরও কার্যকরভাবে জনগণের কথা শোনা এবং (গ) জনগণের চাহিদা মেটানো ও স্থানীয় সরকারের কার্যক্রমে তাদের মতামতের প্রতিফলন ঘটানোর জন্য যোগাযোগ কৌশল ও পুনরাবৃত্তি প্রক্রিয়ার উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

জবাবদিহি নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে এই সমীক্ষা শনাক্ত করেছে যে নাগরিকের রয়েছে একটাই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, 'কোন সেবার জন্য আমি কাকে বলব।' কাজেই একটি প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহিমূলক করার জন্য প্রক্রিয়াগত স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা একটি বড় কাজ। খুলনা সিটি করপোরেশনের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, অধিকাংশ উত্তরদাতা কোনো ধরনের আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জানাননি; বরং নগর উন্নয়ন-সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য তারা কেবল ওয়ার্ড কমিশনার ও সিটি করপোরেশনের কর্মকর্তাদের অনানুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছিলেন। উত্তরদাতাদের একটি বড় অংশ বিশ্বাস করেন যে অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার চেয়ে বেশি কার্যকর। কোনো কোনো উত্তরদাতা জানান যে অভিযোগ উত্থাপনের জন্য আনুষ্ঠানিক কোনো প্রক্রিয়া নেই। খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে দেখা যায়, সেখানে সীমিত আকারে বিচারপ্রক্রিয়া বিদ্যমান; এখানে তথ্যানুসন্ধানী সেবাগ্রহীতাদের কোনো সেবার জন্য এই প্রক্রিয়ায় প্রবেশাধিকার নেই। এসব উত্তরদাতা অভ্যর্থনা ডেস্ক থেকে মৌখিকভাবে তথ্য পান। অভ্যর্থনা ডেস্কের কর্মীরা তথ্যানুসন্ধানীদের কেবল দেখিয়ে দেন কোন বিভাগ থেকে তারা নির্দিষ্ট সেবা পেতে পারেন। এর ফলে চাহিদা অনুযায়ী মানসম্মত সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে এটাই নাগরিকদের প্রতিবন্ধকতা এবং এর অর্থ হচ্ছে খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের তথ্যে নাগরিকদের অধিকারের ক্ষেত্রে সচেতনতা সীমিত। কাজেই এই গবেষণা সুপারিশ করছে, সাধারণ নাগরিকদের অভিযোগ শোনা এবং বিশেষভাবে সেবাগ্রহীতাদের অভিযোগ শোনার জন্য আলাদা একটি কেন্দ্রীয় শাখা থাকতে হবে, যেখানে অভিযোগ প্রতিবিধান প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন ও উন্নয়ন করার জন্য একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা নিয়োজিত থাকবেন।

গবেষণায় দেখা গেছে, স্থানীয় পরিসরে কাঠামোগত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের সমস্যা রয়েছে। খুলনা নগরে অবস্থিত সরকারি কর্তৃপক্ষগুলোর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা যায় এমন কোনো প্রতিষ্ঠিত আইনি প্রক্রিয়া নেই। যশোর শহরের ক্ষেত্রে দেখা গেছে স্থানীয় পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর প্রকল্প ও বাজেট-সংক্রান্ত বিষয়ে নির্ভরশীলতা বিভিন্ন ধরনের নগর উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার সম্ভাবনাকে সীমিত করে দেয়। খুলনা শহরে স্থানীয় সরকার হিসেবে সিটি করপোরেশন ও পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ হিসেবে খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব রয়েছে। দেখা গেছে, স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) আইন-২০০৯ [ধারা ৪৯(১৫)] অনুসারে যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে খুলনা সিটি করপোরেশনের অন্য প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের দাওয়াত দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে সিটি করপোরেশনে উপস্থিত হওয়া ও কোনো সভায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। ফলে খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে অংশগ্রহণ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মর্জির ওপর নির্ভর করে। বিষয়টি বিবেচনা করে এই গবেষণা সুপারিশ করছে যে নাগরিক সমাজ, বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়ের প্রতিনিধি, বেসরকারি ও কমিউনিটি সংগঠনের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করে একটা সমন্বয় বোর্ড গঠন করতে হবে।

উপসংহারে বলা যায়, বিকেন্দ্রীকরণকৃত স্থানীয় সরকার (খুলনা সিটি করপোরেশন ও যশোর পৌরসভা) কাঠামো অবিকেন্দ্রীকৃত স্থানীয় সরকার (খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) কাঠামোর চেয়ে বেশি ভালো। এ গবেষণা যেসব প্রতিষ্ঠান উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত তাদের মধ্যে নাগরিক সমাজের অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করে। গবেষণায় দেখা যায় বিকেন্দ্রীকরণ থেকে জবাবদিহির জন্য পরিচালিত ব্যবস্থাপনা আপনা-আপনি গড়ে ওঠার আশা করা যায় না, একে উদ্দেশ্যমূলকভাবে কাঠামোবদ্ধ করতে হয়। কাজেই বলা যায়, যেখানে একটি একক বিকেন্দ্রীকৃত প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সেখানে ঊর্ধ্বমুখী জবাবদিহির কোনো সমস্যা নেই। সংগঠনের সামর্থ্যের সাথে সম্পর্কিত নিম্নমুখী জবাবদিহির ক্ষেত্রে নাগরিকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নতুন কৌশলের প্রয়োজন রয়েছে, যা যশোর পৌরসভার ক্ষেত্রে প্রতিফলিত। অন্যদিকে সিটি করপোরেশনের ক্ষেত্রে যেখানে দুটি বিকেন্দ্রীকৃত প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সেখানে আরও বড় পরিসরে ঊর্ধ্বমুখী ও নিম্নমুখী জবাবদিহির সমস্যা রয়েছে। কাজেই এই গবেষণা খুলনা সিটি করপোরেশন ও খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে আরও ভালো সমন্বয় কাঠামোর সুপারিশ করছে।

তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন : অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ (এপ্রিল ২০১৬-মার্চ ২০১৭)*

নাজমুল হুদা মিনা

১. ভূমিকা

টিআইবির (অক্টোবর ২০১৩) গবেষণায় তৈরি পোশাক খাতে দুর্ঘটনা ও কমপ্লায়েন্স ঘাটতির অন্যতম কারণ হিসেবে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, দায়িত্বে অবহেলা, রাজনৈতিক প্রভাব, পারস্পরিক যোগসাজশে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতিকে চিহ্নিত করা হয় এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২৫ দফা সুপারিশ পেশ করা হয়। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য টিআইবি ধারাবাহিকভাবে তিনটি ফলোআপ গবেষণা পরিচালনা করে, যেখানে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ হিসেবে ৬৩টি বিষয়ে ১০২টি উদ্যোগ পর্যালোচনা করা হয়।

তৃতীয় ফলোআপ (২০১৬) গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়, রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পরবর্তী তিন বছরে সরকার ও বিভিন্ন অংশীজন ধারাবাহিকভাবে এসব উদ্যোগের ৪২টি উদ্যোগ বাস্তবায়ন সম্পন্ন করেছে, ৩৬টি উদ্যোগ বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে এবং ২৪টি উদ্যোগ বাস্তবায়ন ধীর বা স্থবির অবস্থায় রয়েছে। বাস্তবায়ন সম্পন্ন উদ্যোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– ন্যূনতম মজুরি বোর্ড কর্তৃক মজুরি বৃদ্ধি, তৈরি পোশাক খাতের জন্য আলাদা কল্যাণ তহবিল গঠন, শ্রম বিধিমালা ২০১৫ প্রণয়ন, রাজউকের কার্যক্রম পরিচালনায় ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ ও রাজউক কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে পরিদপ্তর থেকে অধিদপ্তরে রূপান্তর এবং প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ, পরিদর্শক পদে ন্যূনতম যোগ্যতা বৃদ্ধি, কলকারখানা প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত অভিযোগ প্রদানে হটলাইন স্থাপন, কারখানা নিবন্ধনে অনলাইন ব্যবস্থাপনার প্রচলন, ফায়ার সার্ভিসের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় ইন্সপেক্টর নিয়োগ, মালিক কর্তৃক জরুরি ফোন নম্বরসহ পরিচয়পত্র প্রদান, অতিরিক্ত কর্মঘণ্টার বেতন মাসিক বেতনের সাথে দেওয়ার প্রচলন প্রভৃতি।

অপরদিকে, যেসব উদ্যোগ বাস্তবায়ন হয়নি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– সাবকন্ট্রাক্ট ফ্যাক্টরি পরিচালনার জন্য নীতিমালা তৈরি না করা, কারখানায় শ্রমিক দুর্ঘটনার জন্য মালিক কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদানের পরিমাণ বৃদ্ধি না করা, রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় দোষীদের বিরুদ্ধে বিচারকার্য সম্পন্ন না করা, অংশীদারত্বমূলক ভবন ও অনিরাপদ ভবন থেকে স্থানান্তরে পোশাকশিল্পের জন্য আলাদা পোশাকপল্লি স্থাপন না করা, ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন-প্রক্রিয়া সহজতর না করা,

---

*এপ্রিল ২০১৭-তে টিআইবির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত কার্যপত্র।

বিজিএমইএর ইউডি প্রদানের এখতিয়ার বন্ধ না করা, শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিরোধ নিস্পত্তিতে আলাদা সেল গঠন না করা, পোশাক কারখানা-অধ্যুষিত এলাকায় পরিকল্পিত অগ্নিনির্বাপক স্টেশন তৈরি না করা, শিল্প ও বাণিজ্যিক ভবনের জন্য 'বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্প ছাড়পত্র' এবং 'ব্যবহার সনদ' গ্রহণ বাধ্যতামূলক না করা, অগ্নিনির্বাপক ও প্রতিরোধ আইন-২০০৩-এর বিধিমালা সংশোধন না করা প্রভৃতি। বর্তমান কার্যপত্রে টিআইবির তৃতীয় ফলোআপ গবেষণা (এপ্রিল, ২০১৬) পরবর্তী গত এক বছরে (মে ২০১৬-এপ্রিল ২০১৭) তৈরি পোশাক খাতে বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ এবং বিদ্যমান চ্যালেঞ্জের একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২. উদ্দেশ্য

এ কার্যপত্রের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে–

রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী সময়ে গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গত এক বছরের (মে ২০১৬-এপ্রিল ২০১৭) অগ্রগতি পর্যালোচনা করা। এর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে–

- সরকার ও অন্যান্য অংশীজন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ পর্যালোচনা করা এবং
- গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ নিরূপণ ও তা থেকে উত্তরণে সুপারিশ প্রণয়ন করা।

৩. পর্যালোচনা পদ্ধতি ও তথ্য উৎস

বর্তমান কার্যপত্রে তৈরি পোশাক খাতে গত এক বছরে গৃহীত উদ্যোগ এবং বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ত্বরিত পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস থেকে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের ওয়েবসাইট, সরকারি প্রতিবেদন, আদালতের নির্দেশনা, গবেষণা প্রতিবেদন এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত খবর ও প্রবন্ধ পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য মার্চ ২০১৭-এপ্রিল ২০১৭ সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে।

৪. কার্যপত্রভুক্ত অংশীজন

সরকার ও সরকারি সংস্থা–

শ্রম ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কলকারখানা প্রতিষ্ঠান ও পরিদর্শন অধিদপ্তর; ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর; রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক); শ্রম পরিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার এবং বেসরকারি মালিক সংগঠন (বিজিএমইএ), শ্রমিক সংগঠন ও বায়ার (আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠান), কারখানার মালিক ও শ্রমিক কর্তৃক তৈরি পোশাক খাতে শ্রমিক অধিকার, কাঠামোগত নিরাপত্তা, কমপ্লায়েন্স ও পোশাক খাতের উন্নয়নে গৃহীত উদ্যোগ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি এ কার্যপত্রের আওতাভুক্ত।

৫. সীমাবদ্ধতা

এ কার্যপত্র গত এক বছরে তৈরি পোশাক খাতে শ্রমিক অধিকার এবং নিরাপত্তা ও কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ ও তা বাস্তবায়নে সুশাসনের অগ্রগতি সম্পর্কে একটি সার্বিক ধারণা প্রদান করে। তৈরি পোশাক খাতের সাথে জড়িত সব বিষয় ও অংশীজনকে এ কার্যপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি।

৬. গত এক বছরে সরকারি অংশীজন কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ

গত এক বছরে সরকার কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হচ্ছে –

- ইপিজেড শ্রম আইন-২০১৬ চূড়ান্ত অনুমোদনের আগে পর্যালোচনার জন্য সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটিতে প্রেরণ।
- তৈরি পোশাকশিল্পকে বস্ত্রশিল্পের আওতায় রেখে খসড়া বস্ত্র আইন-২০১৭ মন্ত্রিসভায় নীতিগত অনুমোদন।[২৬]
- তৈরি পোশাকশিল্পের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সরকার, মালিক ও কর্মী সংগঠনের সমন্বয়ে ত্রিপক্ষীয় কাউন্সিল গঠন।[২৭]
- রপ্তানিমুখী শিল্পের শ্রমিকদের জন্য গঠিত কেন্দ্রীয় শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে অর্থ সংগ্রহ কার্যক্রম শুরু।[২৮]
- শ্রমিক কল্যাণ তহবিল ও দুর্ঘটনাজনিত বিমার সমন্বয়ে প্রত্যেক শ্রমিকের দুর্ঘটনার জন্য ৫ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণের বিধান করা।[২৯]
- তৈরি পোশাকশিল্পের কারখানা ভবন সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণসহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অংশগ্রহণের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর মাধ্যমে ২৫টি ব্যাংক ও ১০টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে পার্টিসিপেটিং ফিন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন (পিএফআই) হিসেবে নির্বাচিত করা হয়, যারা বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে স্বল্প সুদে ঋণ নিয়ে তা পোশাক কারখানার ভবন সংস্কারে সরবরাহ করবে। 'জাইকা'র আরবান বিল্ডিং সেফটি প্রজেক্টের অধীনে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ৬ শতাংশ সুদে ঋণ বিতরণ করবে।[৩০]
- সরকার কর্তৃক পোশাকশিল্পের কর্মীদের চাকরি-পরবর্তী অবসরভাতা প্রদানের পরিকল্পনার বিষয়টি বিবেচনাধীন।[৩১]

---

[২৬] http://www.prothom-alo.com/economy-garments

[২৭] http://www.ittefaq.com.bd/print-edition/trade/2017/03/10/181137.html

[২৮] জুলাই ২০১৬ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত তহবিলে প্রায় ২৬ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে।
সূত্র : http://www.banglanews24.com/national/news/bd/552871.details

[২৯] http://www.thedailystar.net/business/garment-workers-get-tk-5-lakh-accidents-1296655

[৩০] http://www.kalerkantho.com/home/printnews/463413/2017-02-14

[৩১] http://www.thefinancialexpress-bd.com/2016/08/07/41213/

- শ্রম পরিদপ্তর কর্তৃক গত এক বছরে ৬৭টি নতুন ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধন প্রদান (২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোট ৫৪০টি ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধন প্রদান)।[৩২]
- কলকারখানা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিদর্শন কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করার জন্য পরিপূর্ণ চেকলিস্ট প্রণয়ন।[৩৩]
- ডিজিটাল পরিদর্শন পদ্ধতির মাধ্যমে জবাবদিহি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অ্যাপস তৈরি।
- রেকর্ড কিপিং ম্যানুয়ালগুলো ডিজিটালাইজড করা, স্ট্যান্ডার্ড অপারেশন প্ল্যান (TNR) তৈরি।
- কোড অব ইথিকস প্রণয়ন এবং লাইসেন্স প্রদান সময়কাল ৯০ দিন থেকে কমিয়ে ৪৫ দিন ধার্য করা এবং এই প্রক্রিয়া সহজতর করার জন্য আঞ্চলিক কার্যালয়গুলোতে লাইসেন্স প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করা।
- কলকারখানা অধিদপ্তরের নেতৃত্বে জাতীয় উদ্যোগে পরিদর্শিত কারখানার সংস্কারকাজ পরিচালনার জন্য দুটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে এবং টাস্কফোর্সকে সহযোগিতার জন্য আরসিসি (রেমেডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেল)[৩৪] গঠন করা।
- পরিদর্শকদের জন্য নিয়মিত বনিয়াদি প্রশিক্ষণে অ্যান্টি করাপশন এবং ইন্টিগ্রিটি উন্নয়ন বিষয়ক ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

৭. বিজিএমইএ, আইএলও, অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

- বিজিএমইএ কর্তৃক সব কারখানার শ্রমিকের সমন্বিত ডেটাবেজে এক হাজার সাতশ কারখানার ১১ লাখ শ্রমিকের তথ্য সংযুক্ত করা।[৩৫]
- বিজিএমইএ কর্তৃক পোশাক খাতে দক্ষ জনবল তৈরির জন্য বাংলাদেশ সরকার, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) এবং সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কো-অপারেশনের (এসডিসি) সহযোগিতায় 'স্কিল ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট' প্রোগ্রামের আওতায় ২০১৮ সালের মধ্যে ২ লাখ ৬০ হাজার দক্ষ জনবল তৈরির বিষয়ে পদক্ষপ নেওয়া।[৩৬]

[৩২] "Strengthening Social Dialogue Mechanism Under Weak Enabling Environment: Case Of Rmg Sector"- presented by KG Moazzem, in a seminar organized by CPD on 23 April, 2017

[৩৩] চেকলিস্টে এক স্টার, দুই স্টার ও তিন স্টার পর্যায়ে বিভিন্ন মানদণ্ডে ভাগ করা হয়েছে। যেখানে তিন স্টার মানদণ্ড ১১টি বিষয় না থাকলে কারখানাগুলো কমপ্লায়েন্স অধিভুক্ত হবে না। তিন স্টার বিষয়ক মানদণ্ডের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– ডে কেয়ার থাকা, মাতৃত্বকালীন সুবিধা প্রদান করা, নিয়োগপত্র দেওয়া, পরিচয়পত্র প্রদান করা প্রভৃতি।

[৩৪] বায়ার সমন্বয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক পরিদর্শন সংস্থাগুলোর (অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স)- মেয়াদ শেষ হওয়ার পর মূলত আরসিসির মাধ্যমে সংস্কারমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ সেল কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের পরিদর্শক, ইলেকট্রিক্যাল ইন্সপেকশন বোর্ড, রাজউক, চউক ও বুয়েটের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত হবে।

[৩৫] http://www.dailyjanakantha.com/details/article/255711/

[৩৬] http://www.kalerkantho.com/home/printnews/268771/2015-09-15

- কারখানা পরিদর্শনে রানা প্লাজা দুর্ঘটনা-পরবর্তী বায়ার সংগঠন কর্তৃক গঠিত অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স কর্তৃক তাদের অধিভুক্ত সব কারখানায় পরিদর্শন সম্পন্ন করা হয়েছে। উভয় জোট কর্তৃক ২০২টি কারখানার সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিন্ন করা।[৩৭]
- অ্যালায়েন্স কর্তৃক ১ দশমিক ২ মিলিয়ন শ্রমিককে অগ্নিনিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।[৩৮]
- আইএলও কর্তৃক বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আলোচনা এবং বিভিন্ন সমস্যা সমাধানকল্পে ৫টি দেশের রাষ্ট্রদূত (আমেরিকা, কানাডা, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ব্রিটেন ও অন্যান্য ইউরোপিয়ান দেশের পর্যায়ভিত্তিক সদস্য) এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবের সমন্বয়ে '৫+৩ গ্রুপ' নামক একটি গ্রুপ তৈরি করা।[৩৯]
- অকুপেশনাল হেলথ অ্যান্ড সেফটি ট্রেনিং প্রোগ্রামের আওতায় ৫৮৫টি ফ্যাক্টরির ৮ লাখ শ্রমিকের প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে ।[৪০]

৮. বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ

রানা প্লাজা দুর্ঘটনা-পরবর্তী উপরোল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ সত্ত্বেও তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে যেসব চ্যালেঞ্জ এখনো বিদ্যমান তা নিচে তুলে ধরা হলো :

৮.১ আইনি সীমাবদ্ধতা, প্রয়োগের ঘাটতি ও আইনের অপপ্রয়োগ

রানা প্লাজা-পরবর্তী শ্রম আইন-২০০৬ সংশোধন, শ্রম বিধিমালা-২০১৫ প্রণয়ন এবং ইপিজেড শ্রম আইন-২০১৬ খসড়া অনুমোদন করা হয়। এসব আইনে কারখানার নিরাপত্তার বিষয়ে বিভিন্ন বিধান সংযুক্ত করা হলেও শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের বিধান কার্যত আরো কঠিন করা হয়েছে। কারখানা পর্যায়ে শ্রম আইন-২০০৬-এর বিভিন্ন ধারাগুলোর [২৩, ২৭, ১৮৯, ২(৬৫)] অপপ্রয়োগের অভিযোগ রয়েছে। এসব ধারার অপব্যবহার করে মূলত ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের চাকরিচ্যুত এবং শ্রমিকদের কোনো ধরনের সুবিধা প্রদান না করে চাকরি থেকে অব্যাহতি প্রদানের অভিযোগ রয়েছে। আবার ইপিজেড শ্রম আইন-২০১৬-এ ট্রেড ইউনিয়নের পরিবর্তে ওয়েলফেয়ার কমিটি গঠনের বিধান থাকলেও ৫১ শতাংশ শ্রমিকের ভোটের শর্তের কারণে এবং বেপজা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেওয়ার বাধ্যবাধকতার কারণে এই আইনের কাঙ্ক্ষিত

[৩৭] গণমাধ্যম এবং মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার হতে প্রাপ্ত তথ্য; বিস্তারিত দেখুন-http://www.prothom-alo.com/economy/article/1154471/

[৩৮] অ্যালায়েন্স কর্তৃক প্রকাশিত তৃতীয় বার্ষিক রিপোর্ট, ২০১৬; বিস্তারিত দেখুন-http://www.bangladeshworkersafety.org/en/403-alliance-for-bangladesh-worker-safety-third-annual-report

[৩৯] http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-asia/—ro-bangkok/—ilo-dhaka/documents/publication/wcms 474048.pdf

[৪০] প্রাগুক্ত

পর্যায়ে বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না। এই বিধান এ খাতে শ্রমিকদের যৌথ দর-কষাকষির অধিকার নিশ্চিতে বাধাস্বরূপ এবং আইএলও কনভেনশনের (২৯, ৮৭, ৯৮, ১০৫) সাথে সাংঘর্ষিক।

অপরদিকে, দীর্ঘ চার বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও রানা প্লাজা-পরবর্তী দায়েরকৃত মামলার বারবার সাক্ষ্য গ্রহণের তারিখ পরিবর্তনের মাধ্যমে মামলার দীর্ঘসূত্রতার কারণে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শাস্তি নিশ্চিত করা যাচ্ছে না।[৪১] কারখানা বন্ধে কলকারখানা অধিদপ্তরের শুধু নোটিশ প্রদানের ক্ষমতা থাকার কারণে কোনো অভিযুক্ত কারখানার বিরুদ্ধে তারা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে অধিদপ্তর বিজিএমইকে ইউডি প্রদান স্থগিত রাখার জন্য অনুরোধ করে থাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিজিএমইএ কর্তৃক অল্প সময় ইউডি বন্ধ রাখা হলেও পরবর্তী সময়ে তা আবারও প্রদান করা হয়। ফলে কারখানার শ্রমিক নিরাপত্তা ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। এ ছাড়া শ্রম আইন-২০০৬ অনুযায়ী কারখানাবিষয়ক কোনো মামলা ফৌজদারি কার্যবিধি অনুসারে দায়ের করার বিধান রহিত করা হয় এবং সব মামলা লেবার কোর্টে দায়ের করার বিধান করা হয়। কিন্তু সারা দেশে মাত্র ৫টি লেবার কোর্ট থাকার কারণে মামলাজট বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শ্রমিক তার আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

৮.২ কলকারখানা অধিদপ্তরের সীমাবদ্ধতা

আন্তর্জাতিক ক্রেতা সংগঠনের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সের কার্যক্রম সময়কাল ২০১৮ পর্যন্ত নির্দিষ্ট; এর পরবর্তী সময়ে এসব কারখানা পরিদর্শনের জন্য সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পরিকল্পনা করছে। পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনায় কলকারখানা অধিদপ্তরের পৃষ্ঠপোষকতায় রেমিডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেল (আরসিসি) গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কলকারখানা অধিদপ্তরের পরিদর্শকের সংখ্যা রানা প্লাজা-পরবর্তী ৫৭৫-এ উন্নীত করা হয়, যার মধ্যে বর্তমানে ৩১০ জন কর্মরত আছে। কিন্তু তৈরি পোশাক খাতসহ প্রায় ৮০ লাখ ইউনিটের জন্য এ সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। এ ছাড়া তাদের দক্ষতারও ঘাটতি বিদ্যমান। সামগ্রিক পরিদর্শন কার্যক্রমে আগে থেকে সরকারি সংস্থার অংশগ্রহণ নিশ্চিত না করার কারণে, এসব পরিদর্শনে ক্রেতা-চাহিদা সম্পর্কে তারা দক্ষতা তৈরি করতে পারেনি। ফলে পরবর্তী সময়ে এ খাতে কমপ্লায়েন্স বিষয়ে ক্রেতা-চাহিদা নিশ্চিতকরণ ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে।

৮.৩ পরিদর্শিত কারখানার সংস্কার কার্যক্রম

ইউরোপীয় ক্রেতাদের জোট অ্যাকর্ড ও উত্তর আমেরিকার ক্রেতাদের জোট অ্যালায়েন্সের সদস্য কারখানাগুলোর যথাক্রমে ৭৭ ও ৭৫ শতাংশ সংস্কারকাজ শেষ হলেও জাতীয় ত্রিপক্ষীয় কর্মপরিকল্পনার (এনটিপিএ) অধীনে থাকা ১ হাজার ৫৪৯টি কারখানার ভবনের কাঠামোগত ত্রুটি সংস্কারকাজে অগ্রগতি সামান্য। এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ ত্রুটি সংশোধন হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।[৪২]

---

[৪১] https://www.jagonews24.com/law-courts/news/250486/

[৪২] http://www.prothom-alo.com/economy/article/1154471

সম্প্রতি প্রকাশিত একটি গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী, একটি কারখানার সংস্কার করার জন্য গড়ে ৫ কোটি টাকা প্রয়োজন।[৪৩] অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সভুক্ত কারখানার বেশির ভাগ বিভিন্ন বড় ক্রেতা সংস্থার পণ্য তৈরি করে এবং প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা পরিচালনা করে। তথাপি অনেক কারখানা এসব সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য আর্থিকভাবে সচ্ছল নয়। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতার আশ্বাস থাকলেও তারা এসব সহযোগিতা পরিপূর্ণভাবে পাচ্ছে না বলে অভিযোগ রয়েছে।

৮.৪ সেফটি কমিটি

শ্রম বিধিমালা-২০১৫ অনুযায়ী গেজেট প্রকাশিত হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে প্রতিটি কারখানায় সেফটি কমিটি গঠনের বিধান রয়েছে। কিন্তু এ পর্যন্ত ১৯ মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও আন্তর্জাতিক পরিদর্শন সংস্থা কর্তৃক পরিদর্শিত কিছু কারখানা ছাড়া প্রায় সব কারখানায় এ ধরনের কমিটি গঠিত না হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। বাধ্যতামূলকভাবে সেফটি কমিটি গঠনের বিধান পরিবীক্ষণে কলকারখানা প্রতিষ্ঠান ও পরিদর্শন অধিদপ্তরের কোনো ধরনের পরিবীক্ষণ মেকানিজমের অভাব পরিলক্ষিত হয়। শুধু মালিকদের এ বিষয়ে উৎসাহিত করার প্রক্রিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকার প্রবণতা লক্ষণীয়। অপরদিকে, কারখানাগুলোয় ট্রেড ইউনিয়ন না থাকার কারণে আগের শ্রমিক অংশগ্রহণ কমিটির মতো অকার্যকর হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে।

৮.৫ উৎপাদন টার্গেট বৃদ্ধি ও মাতৃত্বকালীন সুবিধা

রানা প্লাজা-পরবর্তী শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি করা হয়। এরপর বেশির ভাগ কারখানায় শ্রমিকদের উৎপাদন টার্গেট বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু অনেক কারখানায় উৎপাদন টার্গেট অত্যধিক বৃদ্ধি করা হয়। এ ক্ষেত্রে প্রেষণা তৈরির জন্য উৎপাদন ইনসেনটিভের ব্যবস্থা করা হলেও শ্রমিকরা এ ধরনের ইনসেনটিভ অর্জন করতে পারেন না, কারণ ইনসেনটিভ পাওয়ার জন্য যতটুকু টার্গেট নির্ধারণ করা হয় তা শ্রমিকের সক্ষমতার থেকে অনেক বেশি এবং পূরণ করা অসম্ভব হয় এবং এর ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্রমিকদের ওভারটাইমের পরিবর্তে পারিশ্রমিক ব্যতীত অতিরিক্ত কর্মঘণ্টার মাধ্যমে টার্গেট পূরণ করতে হয়। ফলে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যহানির ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছে। অপরদিকে, অনেক কারখানায় মাতৃত্বকালীন সুবিধা পরিপূর্ণভাবে না দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে কোনো কোনো কারখানায় মাতৃত্বকালীন সময়ে ছুটি প্রদান করা হলেও টাকা প্রদান না করা, অথবা টাকা প্রদান করা হলে ছুটি কম প্রদান করার অভিযোগ পাওয়া যায়।

৮.৬ মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক অবনমন

সম্প্রতি আশুলিয়ায় অবস্থিত বিভিন্ন তৈরি পোশাক কারখানায় শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির জন্য সংগঠিত আন্দোলনে অংশগ্রহণকৃত ১ হাজার ৫০০ শ্রমিককে চাকরিচ্যুত করা হয় এবং ৭০০ শ্রমিক ও ১৪ জন ট্রেড ইউনিয়ন নেতার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। যার মধ্যে প্রায় ১২ জনকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়।[৪৪] শ্রমিকের দাবি অবদমনে সরকারের এ ধরনের

---

[৪৩] বিস্তারিত দেখুন http://www.newspapers71.com/406269/

[৪৪] https://thewire.in/104737/bangladesh-garment-workers-minimum-wage/

ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে শ্রমিক অসন্তোষ দীর্ঘ মেয়াদে ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে কার্যত মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক অবনমন হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিভিন্ন সুবিধা প্রাপ্তিতে বাধাগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। অপরদিকে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে বাধাদানের জন্য মিথ্যা অভিযোগ, মাস্তান দ্বারা হুমকি অথবা মারধরের মাধ্যমে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার অভিযোগ পাওয়া যায়। ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন প্রদান চলমান থাকলেও তা প্রত্যাশিত মাত্রায় হচ্ছে না এবং অনেক ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে মালিকপক্ষের পক্ষ অবলম্বনকারীদের সুযোগ প্রদানের অভিযোগ পাওয়া যায়। ফলে কারখানা পর্যায়ে সাধারণ কর্মীদের যৌথ দর-কষাকষির অধিকার নিশ্চিতে কাজ না করে, মালিকের পক্ষে কাজ করার ক্ষেত্রে নিয়োজিত থাকে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পরে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি করা হলেও তার প্রকৃত সুবিধা শ্রমিকরা পাচ্ছেন না। কেননা, মজুরি বৃদ্ধির পর তিন বছর অতিবাহিত হয়েছে এবং ইতিমধ্যে গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎসহ আবাসন খরচ এবং জীবনযাত্রার অন্যান্য ব্যয় কয়েক দফা বৃদ্ধি হয়েছে। ফলে বর্তমান ন্যূনতম মজুরি জীবনযাত্রার ব্যয়ের তুলনায় পুনরায় পিছিয়ে পড়েছে বলে ধারণা করার কারণ আছে।

৮.৭ কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং রপ্তানি তুলনামূলক কম প্রবৃদ্ধি হওয়া

তৈরি পোশাক খাত দেশের মোট রপ্তানির প্রায় ৮০ শতাংশ। ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে রপ্তানিকৃত তৈরি পোশাকের মোট আর্থিক পরিমাণ যথাক্রমে প্রায় ২৪, ২৫ ও ২৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। রপ্তানি প্রবৃদ্ধি গত ১০ বছরে গড়ে ১৩ শতাংশ হলেও বর্তমানে তা কমে ৪ শতাংশ হয়েছে।[৪৫] আবার রানা প্লাজা দুর্ঘটনা-পরবর্তী কারখানা সংস্কার, বিদেশি ক্রেতার চাপ, বিশ্ববাজারে পোশাকের চাহিদা কমে যাওয়া, টাকার বিপরীতে ডলারের অবমূল্যায়ন, শ্রম অসন্তোষ প্রভৃতি কারণে প্রায় ১ হাজার ২০০ কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০২১ সালের মধ্যে ৫০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে।

৮.৮ সাবকন্ট্রাক্ট ফ্যাক্টরির গাইডলাইন

তৈরি পোশাক কারখানা যেগুলো তুলনামূলক বড় বায়ারের কাজ করে, তাদের বিভিন্ন সময়ে অধিক পরিমাণে মৌসুমি কার্যাদেশ অথবা নিয়মিত কার্যাদেশ থাকে। মূলত এসব কারখানা তাদের নিজস্ব ব্যবস্থা দেখিয়ে বায়ার হতে কার্যাদেশ নিয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব ব্যবস্থায় এসব পণ্যের সময়মতো উৎপাদন সম্ভব হয় না। এ ক্ষেত্রে তারা তুলনামূলক ছোট কারখানার সাথে লাভের অংশ গ্রহণের চুক্তির মাধ্যমে পণ্যের কার্যাদেশ প্রদান করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ ধরনের কার্যাদেশ প্রদানের বিষয়টি আন্তর্জাতিক ক্রেতার প্রচলিত নীতির মাধ্যমে এবং তাদের জানিয়ে করা হয়, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ক্রেতার অগোচরে সাবকন্ট্রাক্ট

[৪৫] ২০১৬-১৭ (জুলাই-ডিসেম্বর) অর্থবছরে তৈরি পোশাক রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, আমেরিকা, কানাডা ও অপ্রথাগত দেশে যথাক্রমে ১০.১২, -৯.১১, -৭.৩ ও ৩.৪৮ শতাংশ যা সর্বমোট ৪.৩৭ শতাংশ। বিস্তারিত দেখুন-http://www.bgmea.com.bd/home/about/AboutGarmentsIndustry

কারখানায় আদেশ স্থানান্তরিত করা হয়। এ কারণে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সাবকন্ট্রাক্ট ফ্যাক্টরি হিসেবে কোনো কারখানার ধরন মালিকপক্ষ সাধারণত স্বীকার করে না। কিন্তু গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী দেখা যায় যে এ ধরনের কারখানায় কার্যক্রম এখনো চলমান রয়েছে এবং এসব কারখানার শ্রমিক নিরাপত্তা এবং কারখানা নিরাপত্তা ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছে। অপরদিকে, সাবকন্ট্রাক্ট কারখানার পরিচালনার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক গাইডলাইন নেই। আবার সরকার ও অংশীজনের রপ্তানিমুখী কারখানার কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু অভ্যন্তরীণ বাজারে সরবরাহকারী বিভিন্ন কারখানার কর্মপরিবেশ অত্যন্ত খারাপ। ভবিষ্যতে এ ধরনের কারখানায় কোনো দুর্ঘটনা সংঘটিত হলে সামগ্রিকভাবে তৈরি পোশাকশিল্পের ভাবমূর্তি হুমকির সম্মুখীন হতে পারে।

৯. উপসংহার ও সুপারিশ

তৈরি পোশাক খাতে বিভিন্ন সরকারি অংশীজনের, যেমন কলকারখানা অধিদপ্তর এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণে গৃহীত অধিকাংশ কার্যক্রম সম্পন্ন হলেও শ্রম পরিদপ্তরে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। কারখানার নিরাপত্তায় বা টেকনিকাল কমপ্লায়েন্সের ক্ষেত্রে অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স পরিদর্শিত কারখানার কিছুটা অগ্রগতি হলেও জাতীয় উদ্যোগে পরিদর্শিত কারখানার অগ্রগতি নেই বললেই চলে। অন্যদিকে বিজিএমইএ বা বিকেএমইএর সদস্য নয় এমন কারখানার টেকনিক্যাল কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ অনুপস্থিত। এ ছাড়া পোশাক খাতের শ্রমিকদের সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স বা চাকরিকালীন সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার নিশ্চিতের ক্ষেত্রে অগ্রগতিও সন্তোষজনক নয়।

সরকারের পক্ষ থেকে আইন ও বিধিমালা শ্রমিকবান্ধব বা কল্যাণমূলক করার লক্ষ্যে কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হলেও শ্রমিকের যৌথ দর-কষাকষির অধিকার নিশ্চিতে তা যথেষ্ট নয়; বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইনি প্রক্রিয়া আরও জটিল করা হয়েছে। সার্বিকভাবে এ খাতের টেকসই উন্নয়ন ও সুশাসন নিশ্চিতে সরকারকে আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে টিআইবি নিচের সুপারিশগুলো প্রস্তাব করছে।

১. তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কেন্দ্রীভূত তদারকি ও সমন্বয়ের জন্য দীর্ঘ মেয়াদে পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করতে হবে।

২. তৈরি পোশাকশিল্পের জন্য পৃথক ওয়েজ বোর্ড গঠন করতে হবে।

৩. জাতীয় উদ্যোগে পরিদর্শিত কারখানার রেমিডিয়েশন নিশ্চিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে সরকার ও দাতা সংস্থার উদ্যোগে গঠিত তহবিল থেকে দ্রুত ঋণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৪. দ্রুত পোশাকপল্লি প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন করতে হবে।

৫. পোশাক কারখানা-অধ্যুষিত এলাকায় পরিকল্পিত অগ্নিনির্বাপক স্টেশন তৈরি করতে হবে।

৬. শ্রমিকদের জন্য চাকরি-পরবর্তী অবসর ভাতা এবং সামাজিক সুরক্ষার আওতায় স্বাস্থ্য বিমার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৭. সাবকন্ট্রাক্ট ফ্যাক্টরির জন্য গাইডলাইন প্রস্তুত করতে হবে এবং অভ্যন্তরীণ বাজারে পণ্য সরবরাহকারী কারখানার কর্মপরিবেশ উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮. সব কারখানায় সেফটি কমিটি গঠন করতে হবে এবং পরিবীক্ষণের জন্য কলকারখানা অধিদপ্তরের শক্তিশালী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে– এ ক্ষেত্রে সেফটি কমিটি না থাকলে ইউডি প্রদান না করার বাধ্যবাধকতা তৈরি করা যেতে পারে।

৯. শ্রমিকদের যৌথ দর-কষাকষির অধিকার নিশ্চিতে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন-প্রক্রিয়া সহজতর করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় আইন সংশোধন করতে হবে।

১০. কারখানা বন্ধ ও কার্যাদেশ বাতিল করা হলে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

জলবায়ু অর্থায়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসন
প্রেক্ষিত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড*

গোলাম মহিউদ্দিন, মহুয়া রউফ ও মো. রাজু আহম্মেদ মাসুম

১. গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

সূচনালগ্ন থেকেই বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) বাংলাদেশ সরকারের পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের প্রধান প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভূমিকা পালন করে আসছে। পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার নানাবিধ প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশাপাশি পাউবো বাংলাদেশে জলবায়ু প্রকল্প বাস্তবায়নে অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে। বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ডের (বিসিসিটিএফ) অর্থায়নে পাউবো ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে জুলাই ২০১৭ পর্যন্ত মোট ১৪১টি প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে জড়িত ছিল। পাউবোর বাস্তবায়িত এসব জলবায়ু প্রকল্পে মোট প্রায় ১ হাজার ১৩২ কোটি টাকা অর্থায়ন করা হয়েছে, যা বিসিসিটিএফের বরাদ্দকৃত মোট অর্থায়নের ৪০ শতাংশ।

জলবায়ু অর্থায়ন বাংলাদেশের জন্য একটি নতুন এবং অপরীক্ষিত খাত হওয়ায় এ খাতে সুশাসন নিশ্চিতে প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে (টিআইবি ২০১১)। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সরকার এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় এ খাতে প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য বেশ কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়েছে। পাউবো এ পর্যন্ত প্রায় ৭০০-এর বেশি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে, যার প্রভাব বাংলাদেশের পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় গভীর এবং ব্যাপক। তবে এ কথাও সত্য যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে বাপাউবো কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতির বিষয়টি আলোচনায় এসেছে, যার অন্যতম কারণ হিসেবে প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতার বিষয়টি বিভিন্ন সময়ে চিহ্নিত হয়েছে। জলবায়ু প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রসঙ্গে সুশাসন নিশ্চিতকরণের বিষয়টি আরও গভীর এবং গুরুত্বপূর্ণ। কেননা বৈশ্বিক জলবায়ু তহবিলগুলোতে অভিগম্যতার একটি বড় শর্ত হচ্ছে সুশাসন নিশ্চিতকরণ। বৈশ্বিক জলবায়ু তহবিলে অভিগম্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে পাউবো একটি অন্যতম সম্ভাবনাময় প্রতিষ্ঠান এবং পাউবো ইতিমধ্যে জাতীয় বাস্তবায়নকারী সংস্থা (এনআইই) হিসেবে অধিভুক্তকরণের জন্য আবেদনপত্র জমা দিয়েছে।

জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন নিশ্চিতে সহায়তায় ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ২০১১ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে। স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত জলবায়ু প্রকল্প অনুসরণ, জাতীয়

*২০১৭ সালের ২৩ আগস্ট টিআইবির সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গবেষণা এবং বিভিন্ন অ্যাডভোকেসির কার্যক্রম পরিচালনা করছে টিআইবি। এ পরিপ্রেক্ষিতে জলবায়ু প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রধান প্রতিষ্ঠান হিসেবে পাউবোর প্রাতিষ্ঠানিক গুরুত্ব ও জলবায়ু অর্থায়নে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জাতীয় বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান (এনআইই) হিসেবে অধিভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনাকে বিবেচনা করে এই গবেষণাকর্মটি গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণাটিতে পাউবোর বাস্তবায়িত জলবায়ু প্রকল্পে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও এর কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে এবং উত্তরণে সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

২. গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এ গবেষণার লক্ষ্য জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক জলবায়ু তহবিল ব্যবহারে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা। এই লক্ষ্য অর্জনে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে :

- জলবায়ু অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট আইন/নীতিমালা পর্যালোচনা করা;
- প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ এবং এর কারণ চিহ্নিত করা;
- চিহ্নিত চ্যালেঞ্জ উত্তরণে সুপারিশ প্রদান করা।

৩. গবেষণার ব্যাপ্তি

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিলের অর্থায়নে বাস্তবায়িত পাউবোর ছয়টি জলবায়ু প্রকল্প ব্যবস্থাপনার সব পর্যায় (প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন) আলোচনা করা হয়েছে এ গবেষণায়। সুশাসনের চারটি নির্দেশকের আলোকে (স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, শুদ্ধাচার ও জন অংশগ্রহণ) গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ গবেষণার তথ্য পাউবো কর্তৃক বাস্তবায়িত ছয়টি প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পাউবো কর্তৃক বাস্তবায়িত জলবায়ু প্রকল্পের ক্ষেত্রে এ গবেষণা একটি সামগ্রিক ধারণা দিলেও এর ফলাফল সব প্রকল্পের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়।

৪. গবেষণাপদ্ধতি

গবেষণায় ভৌগোলিক অবস্থানভেদে জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল, কাজের ধরন, বাস্তবায়নকাল ও বাজেটের আকার বিবেচনায় ছয়টি প্রকল্প নির্বাচন করা হয়েছে। নির্বাচিত ছয়টি প্রকল্প থেকে গুণগত ও পরিমাণগত উভয় প্রকার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গুণগত তথ্য সংগ্রহে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার নেওয়া এবং দলীয় আলোচনা করা হয়েছে। পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহে একটি প্রশ্নমালার মাধ্যমে জরিপ করা হয়েছে। জরিপে অংশগ্রহণ করার জন্য নিয়মানুক্রমিক নমুনায়নের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রকল্প এলাকা থেকে মোট ৬০০ জন উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়েছে। সংগৃহীত গুণগত ও পরিমাণগত উভয় ধরনের তথ্য বিশ্লেষণে একটি বিশ্লেষণকাঠামো অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণাটি মার্চ ২০১৫-জুলাই ২০১৭ সময়কালে পরিচালনা করা হয়েছে।

৫. গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল

৫.১ আইনি সীমাবদ্ধতা

গবেষণার জন্য নির্ধারিত চারটি সূচকের সাথে সংশ্লিষ্ট আইন/ নীতিমালা/নির্দেশিকা পর্যালোচনা করে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা হয়েছে।

'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' এবং বিসিসিটিএফের প্রকল্প বাস্তবায়ন নির্দেশিকায় তথ্য বোর্ডে কোন কোন বিষয় সংযুক্ত করতে হবে এবং তথ্য বোর্ড স্থাপনের সময়সীমা ও রক্ষণাবেক্ষণের কোনো সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা নেই। বিসিসিটিএফ এবং পাউবোর কোনো আইন/ নির্দেশিকায় কার্যকর অভিযোগ ব্যবস্থা ও তৃতীয় পক্ষের স্বাধীন প্রকল্প নজরদারি ব্যবস্থার সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা নেই। সরকারি ক্রয় কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রচলিত ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিকে একটি আদর্শ ব্যবস্থা মনে করা হলেও এর মাধ্যমে শুধু দরপত্র জমা দেওয়া যায়। দরপত্র মূল্যায়ন ও নির্বাচন পূর্বতন পদ্ধতিতে হওয়ায় স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার নিশ্চিতে এ ব্যবস্থার কার্যকারিতা সীমিত। পানিসম্পদ খাতে জন অংশগ্রহণের সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা থাকলেও জলবায়ু প্রকল্পের জন্য সামগ্রিকভাবে জন অংশগ্রহণ নিশ্চিতে বিসিসিটিএফের কোনো আইন বা নির্দেশিকা নেই।

৫.২ প্রকল্পে সুশাসনের চিত্র : স্বচ্ছতা

এই গবেষণায় পাউবোর বাস্তবায়িত জলবায়ু প্রকল্পে স্বচ্ছতার চিত্র বুঝতে যে বিষয়গুলো সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে তা হলো পাউবো কর্তৃক প্রকল্প-সংক্রান্ত তথ্যের স্বপ্রণোদিত প্রকাশ এবং চাহিদাভিত্তিক তথ্য প্রকাশ ব্যবস্থা।

৫.২.১ স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে আইনি কাঠামো ও প্রবিধান

'জাতীয় পানিনীতি ২০১৩'-তে বলা হয়েছে যে পানিসম্পদ খাত সংশ্লিষ্ট যেকোনো ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান তার/তাদের প্রকল্প-সংক্রান্ত তথ্য উন্মুক্তকরণে 'জাতীয় তথ্য অধিকার আইন ২০০৯'-এর নির্দেশনা মেনে চলবে। জাতীয় তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ অনুসারে, পানিসম্পদ খাতে জলবায়ু প্রকল্পসহ যেকোনো প্রকল্পের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য নিচের প্রবিধান রয়েছে :

- তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ/দায়িত্ব প্রদান;
- প্রকল্পের বিষয়ে জনগণকে প্রারম্ভিক সভা বা অন্যান্য উপায়ে অবহিতকরণ;
- প্রকল্প এলাকায় প্রকল্প-সম্পর্কিত তথ্যসহ তথ্য বোর্ড/বিলবোর্ড প্রদান;
- বাস্তবায়নকারী সংস্থার/অফিসের ওয়েবসাইটে প্রকল্পবিষয়ক তথ্য প্রদান ও হালনাগাদকরণ এবং
- তথ্য অধিকার আইনে তথ্য চেয়ে কোনো নাগরিক আবেদন করলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদান।

৫.২.২ স্বচ্ছতাবিষয়ক চ্যালেঞ্জ ও পর্যবেক্ষণ

প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকায় পাউবোর একটি স্থানীয় কার্যালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা নেই। জরিপে অংশগ্রহণকারী প্রায় ৯২ শতাংশ উত্তরদাতা প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সম্পর্কে জানেন না।

ছয়টি প্রকল্পের কোনোটিরই প্রকল্প কার্যক্রমের শিডিউল জনগণের সামনে প্রকাশ করা হয়নি। তিনটি প্রকল্পে তথ্য বোর্ড প্রদান করা হয়নি এবং দুটি প্রকল্পে তথ্য বোর্ড দেওয়া হলেও প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হওয়ার আগেই তা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তা ছাড়া একটি প্রকল্পের পাঁচটি ভিন্ন কর্মএলাকা থাকলেও বোর্ড দেওয়া হয়েছে একটিতে। তথ্য বোর্ডে অপর্যাপ্ত তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ আরও তথ্য কোথায় পাওয়া যাবে, অভিযোগ থাকলে কোথায় জানানো যাবে এবং ঠিকাদারের বিস্তারিত বোর্ডগুলোতে নেই।

পাউবোর কেন্দ্রীয় ওয়েবসাইটে চলমান ও সম্পন্ন সাত শতাধিক প্রকল্পের একটি তালিকা দেওয়া থাকলেও জলবায়ু প্রকল্পের আলাদা কোনো তালিকা নেই। স্থানীয় পর্যায়ে দুটি স্থানীয় অফিসের কোনো ওয়েবসাইট নেই। চারটি স্থানীয় অফিসের ওয়েবসাইট থাকলেও সেখানে শুধু প্রকল্পের নাম উল্লেখ করা হয়েছে; প্রকল্প প্রস্তাবনা, অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট নথি কোনো কিছুই প্রকাশ করা হয়নি। প্রকল্পবিষয়ক তথ্য কোথায় পাওয়া যাবে জরিপে অংশগ্রহণকারী ৮৯ শতাংশ উত্তরদাতা তা জানেন না। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মোট ৮ জন জানিয়েছেন, তথ্য চেয়েও পাউবোর স্থানীয় কার্যালয় থেকে কোনো তথ্য পাননি।

৫.৩ প্রকল্পে সুশাসনের চিত্র : জবাবদিহি

পাউবোর বাস্তবায়িত জলবায়ু প্রকল্পে জবাবদিহির ব্যবস্থার চিত্র বুঝতে যে বিষয়গুলো পর্যালোচনা করা হয়েছে তা হচ্ছে– প্রকল্পে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নব্যবস্থা, নিরীক্ষা ও অভিযোগ নিরসনব্যবস্থা।

৫.৩.১ জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে আইনি কাঠামো ও প্রবিধান

'বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন-২০১০' ও 'জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন-২০১০' এবং 'জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন, সংশোধন, বাস্তবায়ন, অর্থ অবমুক্তি এবং ব্যবহার নীতিমালা ২০১২' অনুযায়ী জলবায়ু প্রকল্পের বাস্তবায়নে মূল্যায়ন, তদারকি ও নিরীক্ষার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের দায়িত্ব-সংক্রান্ত সুস্পষ্ট নির্দেশিকা প্রদান করা হয়েছে। ওই আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট অংশীজনের দায়িত্ব-সংক্রান্ত নির্দেশনা নিম্নরূপ :

সারণি ৪ : জবাবদিহি, অংশীজন ও তাদের দায়িত্ব

	অংশীজন	দায়িত্ব
১	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/স্থানীয় বাপাউবো কার্যালয়	তদারকি
২	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	তদারকি ও মূল্যায়ন
৩	বিসিসিটিএফ	তদারকি ও মূল্যায়ন
৪	স্থানীয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি	তদারকি
৫	স্থানীয় প্রশাসন	তদারকি
৬	বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	মূল্যায়ন
৭	কম্পট্রোলার এবং অডিটর জেনারেলের কার্যালয়	নিরীক্ষা

৫.৩.২ জবাবদিহিবিষয়ক চ্যালেঞ্জ ও পর্যবেক্ষণ

গবেষণাধীন ছয়টি প্রকল্পের ক্ষেত্রেই পাউবোর স্থানীয় কার্যালয়ের কর্মকর্তারা নির্বাচিত ঠিকাদারের কর্মকাণ্ড নিয়মিতভাবে তদারকি করতে সরেজমিন প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেছেন। তবে এই তদারকির প্রকল্প বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ-সংক্রান্ত কোনো প্রতিবেদন নেই। ছয়টি প্রকল্পের কোনোটিই পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় মূল্যায়ন ও তদারকি দল কর্তৃক তদারকি ও মূল্যায়ন করা হয়নি। ছয়টি প্রকল্পেই পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্স কর্তৃক অবকাঠামোগত কাজের উপকরণের মান ও সংখ্যা যাচাই করা হয়েছে, তবে দুটি প্রকল্পে উপকরণের নিম্নমানের কারণে নির্মিত অবকাঠামো প্রকল্প চলাকালীনই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যা এই মান যাচাইয়ের কার্যকারিতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। বিসিসিটিএফের প্রতিনিধি ছয়টি প্রকল্পেই শুরুতে ও শেষাংশে কার্যক্রম পরিদর্শনে গিয়েছেন, তবে সমাপ্তির পর কোনো মূল্যায়ন হয়নি। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও জনপ্রশাসন কর্তৃক চারটি প্রকল্পে পরিবীক্ষণ করা হয়েছে দাবি করলেও কোনো প্রতিবেদন নেই। গবেষণাধীন কোনো প্রকল্পেই কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেলের কার্যালয়ের নিরীক্ষা দল কর্তৃক নিরীক্ষা করা হয়নি। গবেষণাধীন কোনো প্রকল্পেই এখনো পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক মূল্যায়ন করা হয়নি। প্রকল্প-সম্পর্কিত অভিযোগ কোথায় করা যাবে তা জরিপে অংশগ্রহণকারী ৯৩ শতাংশ উত্তরদাতা জানেন না। স্থানীয় কর্মকর্তারা বলেন, কেউ অভিযোগ নিয়ে এলে তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তবে লিখিত অভিযোগের কোনো প্রমাণ তারা দেখাতে পারেননি।

৫.৪ প্রকল্পে সুশাসনের চিত্র : জন অংশগ্রহণ

পাউবো কর্তৃক বাস্তবায়িত জলবায়ু প্রকল্পসমূহে জন অংশগ্রহণের চিত্র বিশ্লেষণ করার জন্য যে বিষয়গুলো পর্যালোচনা করা হয়েছে তা হলো, প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও তদারকিতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ।

৫.৪.১ জন অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে আইনি কাঠামো ও প্রবিধান

'বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০'-এর সেকশন ৬.২ঘ অনুযায়ী, পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ পর্যায়ে জন অংশগ্রহণ নিশ্চিতের বিষয়ে নির্দেশিকা রয়েছে। এ ছাড়া জাতীয় পানি নীতির অনুসরণে 'পানিসম্পদ খাতের প্রকল্পসমূহে জন অংশগ্রহণের নীতিমালা' প্রণয়ন করা হয়েছে। এই নীতি অনুযায়ী পানিসম্পদ খাতে কর্মরত প্রতিষ্ঠানের জন্য জন অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশিকা নিম্নরূপ :

- স্থানীয় পর্যায়ে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও এর উত্তরণের উপায় নির্ণয় করতে স্থানীয় পর্যায়ে সভা;
- প্রকল্পের উপকারভোগী, প্রকল্পের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে সামাজিক মূল্যায়ন;
- নারীদের মতামত প্রদানের জন্য আহ্বান;
- প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে জন অংশগ্রহণের জন্য জনগণের সক্ষমতা এবং প্রয়োজনমাফিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা যাচাই;

- প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে পিআরএ, এফজিডি প্রভৃতি পদ্ধতি অবলম্বন করে স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং
- প্রকল্পের কার্যাবলি নিয়ে উপকারভোগীদের প্রতিক্রিয়া জানার জন্য বিস্তারিত ব্যবস্থা তৈরি করা।

৫.৪.২ জন অংশগ্রহণবিষয়ক চ্যালেঞ্জ ও পর্যবেক্ষণ

গবেষণাধীন কোনো প্রকল্পেই স্থানীয় পর্যায়ে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও এর উত্তরণের উপায় নির্ণয় করতে স্থানীয় পর্যায়ে সভা করা হয়নি। গবেষণাধীন কোনো প্রকল্পেই প্রকল্পের উপকারভোগী, প্রকল্পের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে কোনো সামাজিক মূল্যায়ন করা হয়নি এবং নারীদের মতামত গ্রহণ করা হয়নি। গবেষণাধীন কোনো প্রকল্পেই স্থানীয় ব্যক্তিদের সক্ষমতা ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা যাচাই করা হয়নি। এ ছাড়া গবেষণাধীন কোনো প্রকল্পেই প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে পিআরএ, এফজিডি প্রভৃতি পদ্ধতি অবলম্বন করে স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়নি।

৫.৫ প্রকল্পে সুশাসনের চিত্র : শুদ্ধাচার

এই গবেষণায়, বাপাউবো কর্তৃক প্রকল্প প্রণয়ন, প্রকল্প অনুমোদন লাভ, ঠিকাদার নির্বাচন এবং প্রকল্পের দুর্নীতি নিরসন-প্রক্রিয়া-সংক্রান্ত বিষয়ে শুদ্ধাচার চর্চার বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৫.৫.১ শুদ্ধাচার নিশ্চিতকরণে আইনি কাঠামো ও প্রবিধান

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২-এর নির্দেশনা অনুযায়ী, পাউবো ২০১৩ সালের ৩ সেপ্টেম্বর 'নৈতিকতা কমিটি' তৈরি করে। ১৪ সদস্যবিশিষ্ট এ কমিটির সভাপতি হিসেবে কাজ করছেন পাউবোর মহাপরিচালক। এ কমিটির দায়িত্ব বাপাউবোর মধ্যকার এবং মাঠপর্যায়ে কাজের ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা; চিহ্নিত চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের জন্য কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা; কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করা; কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও তদারকি করা এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ইউনিটের কাছে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করা। এ ছাড়া বিসিসিটিএফের নীতিমালায় প্রকল্পের প্রয়োজনীয় কোনো ক্রয় এবং ঠিকাদার নির্বাচনে জাতীয় 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬' এবং 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮' অনুসরণের নির্দেশিকা প্রদান করা হয়েছে।

৫.৫.২ শুদ্ধাচারবিষয়ক চ্যালেঞ্জ ও পর্যবেক্ষণ

জাতীয় পর্যায়ে নৈতিকতা কমিটি গঠিত হলেও মাঠপর্যায়ে এ কমিটির কোনো কার্যক্রম গবেষণাধীন প্রকল্প এলাকায় পাওয়া যায়নি। গবেষণাধীন প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি মেনে ঠিকাদার নিয়োগ হয়েছে এবং ই-টেন্ডারিং পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ। দলীয় আলোচনায় তথ্যদাতারা বলেন, ঠিকাদার নিয়োগ-প্রক্রিয়া

সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই। প্রতিটি প্রকল্পেই দেখা গেছে, সাবকন্ট্রাক্টভিত্তিক কাজ হয় এবং ঠিকাদার ও উপঠিকাদাররা রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার সূত্রে ক্ষমতাবান। গবেষণাধীন ছয়টি প্রকল্পের মধ্যে চারটি প্রকল্প অনুমোদনে বিভিন্ন পর্যায় থেকে সুপারিশ করা এবং প্রভাব খাটানো হয়েছে বলে তথ্যদাতারা জানিয়েছেন। অনুমোদন পর্যায়ে এ ধরনের প্রভাবের কারণে জলবায়ু বিপন্নতা ও বরাদ্দের মধ্যে অসামঞ্জস্য লক্ষ করা গেছে।

দুটি প্রকল্পে কাজের নিম্নমানের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এর জের ধরে স্থানীয় জনগণের সাথে ঠিকাদারের লোকজনের সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে। একটি প্রকল্পে বাঁধের নির্মাণকাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের কারণে প্রকল্প শেষ হওয়ার আগেই বাঁধের কিছু কিছু জায়গা আশঙ্কাজনকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একটি প্রকল্পের ঠিকাদার খাল খননের মাটি পাড় টেকসই করার জন্য না দিয়ে নিজের ইটভাটায় ব্যবহার করেছে। একটি প্রকল্পে রাস্তার নির্মাণকাজের সময় ঠিকাদার ১০-১৫টি গাছ কেটে গাছপ্রতি গড়ে ২৮ হাজার টাকা দরে বিক্রি করে অর্থ আত্মসাৎ করেছেন। ঠিকাদার প্রভাবশালী হওয়ায় ভয়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কেউ কিছু বলেননি। একটি প্রকল্পে ঠিকাদার স্থানীয় একটি দোকান থেকে বিদ্যুৎ ব্যবহার করলেও বিল না দিয়েই চলে গেছেন। পাউবোর স্থানীয় কার্যালয়ে এ বিষয়ে অভিযোগ করা হলেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

৬. সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহের কারণ

বিসিসিটি অর্থায়নকৃত প্রকল্প প্রথমত স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠান থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিসিসিটির প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির কাছে মূল্যায়নের জন্য প্রেরণ করা হয় এবং মূল্যায়ন কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে বিসিসিটির ট্রাস্টি বোর্ডের মাধ্যমে প্রকল্প অনুমোদন লাভ করে। এই ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত হয় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রীকে নিয়ে এবং এই ট্রাস্টি বোর্ডের প্রকল্প নির্বাচন ও অনুমোদনে সুস্পষ্টভাবে জবাবদিহির ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

প্রায়ই প্রকল্প নির্বাচন ও অনুমোদনে রাজনৈতিক প্রভাব কাজ করায় বরাদ্দকৃত অর্থ অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে চলে যায়। বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের মধ্যে বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতিমালা বিষয়ে ধারণার সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত। বিশেষত স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকল্প-সংক্রান্ত তথ্য প্রচার, জবাবদিহি ও জন অংশগ্রহণমূলক সরকারি প্রবিধানসমূহের বিষয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের স্পষ্ট ধারণার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

বিসিসিটি অর্থায়নকৃত প্রকল্পের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থায় সাতটি অংশীজন জড়িত। যদিও বাস্তবে বেশির ভাগ অংশীজনই নিষ্ক্রিয়। এমনকি এই অংশীজনদের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয়হীনতাও পরিলক্ষিত হয়েছে।

কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগের ব্যবস্থা না থাকায় অভিযোগ প্রদানে জনগণ উৎসাহিত হন না এবং এর ফলে অভিযোগের সংখ্যা কমে যায়। অন্যদিকে অভিযোগ প্রদান করা হলেও সে বিষয়ে কোনো তদন্ত ও বিচারিক প্রক্রিয়া অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। পানিসম্পদ খাতে জন অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকলেও বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাদের এ

বিষয়ে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে এবং কিছু ক্ষেত্রে বিদ্যমান নীতিমালা আমলে না নেওয়ায় প্রকল্পে বিদ্যমান আইন ও নীতির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন সম্ভবপর হয়নি।

৭. গবেষণার সার্বিক ফলাফল

পাউবো কর্তৃক বাস্তবায়িত জলবায়ু প্রকল্পে সুশাসনের ব্যাপক ঘাটতি বিদ্যমান। জলবায়ু প্রকল্পে বরাদ্দের পরিমাণ উন্নয়ন বাজেটের প্রকল্পের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় ব্যবস্থাপনার দিক থেকে গুরুত্ব কম পাচ্ছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিভিন্ন অংশীজনের যোগসাজশে অনিয়ম। অর্থায়নকারী সংস্থা এবং পাউবোর কোনো আইন/ নির্দেশিকায় কার্যকর অভিযোগের ব্যবস্থার নির্দেশনা নেই, যা জবাবদিহির ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদনে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন। তথ্যের স্বপ্রণোদিত উন্মুক্ততা ও চাহিদাভিত্তিক তথ্য প্রদান উভয় ক্ষেত্রেই ঘাটতি রয়েছে। জবাবদিহি নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিষ্ক্রিয়তা এবং সমন্বয়ে ঘাটতি বিদ্যমান। শুদ্ধাচার নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের দায়িত্ব পালনে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। যার প্রভাব ঠিকাদার নিয়োগ, ঠিকাদার কর্তৃক কাজের মান প্রভৃতির ওপর পড়েছে এবং অনিয়ম ও দুর্নীতির সহায়ক পরিবেশ হিসেবে কাজ করছে। পানিসম্পদ খাতের প্রকল্পসমূহে জন অংশগ্রহণের আইন ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা সত্ত্বেও প্রকল্পে স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়নি।

৮. সুপারিশমালা

১. তথ্য বোর্ডে কোন কোন বিষয় সম্পৃক্ত করতে হবে এবং তথ্য বোর্ড স্থাপনের সময়সীমা প্রভৃতি বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা তৈরি করতে হবে।

২. বিসিসিটিএফের আইন ও পাউবোর সংশ্লিষ্ট আইন পরিমার্জন করে অভিযোগ নিরসনের ব্যবস্থা এবং তৃতীয় পক্ষের তদারকির বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩. পাউবোর ওয়েবসাইটে প্রকল্প প্রস্তাবনা, নিরীক্ষা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং প্রকল্প এলাকায় দরপত্র, প্রকল্প নকশা, বাস্তবায়নকৃত এলাকা, বাজেট ইত্যাদি তথ্য বোর্ড ও নাগরিক সনদের মাধ্যমে উন্মুক্ত করতে হবে।

৪. চাহিদাভিত্তিক তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা কার্যকর করার মাধ্যমে প্রতিটি স্থানীয় কার্যালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তার উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

৫. প্রকল্পসমূহের তদারকি ও মূল্যায়নের সময় কারিগরি দিকের পাশাপাশি অন্যান্য উপাদানও গুরুত্ব দিতে হবে।

৬. জলবায়ু প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনের সমন্বয়ে একটি কার্যকর অভিযোগ নিরসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৭. জবাবদিহি নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে এবং অংশীজনদের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে।

৮. জলবায়ু ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা যথাযথভাবে যাচাই করে তার ভিত্তিতে প্রকল্প অনুমোদন নিশ্চিত করতে হবে।

৯. পাউবোর গঠিত নৈতিকতা কমিটিকে সক্রিয় হতে হবে এবং তাদের কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে।

১০. প্রকল্পকাজে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ করার একটি সহজ ব্যবস্থা পাউবোকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং তথ্যদাতার সুরক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

১১. জনসাধারণের অংশগ্রহণের যে বিদ্যমান নীতিমালা রয়েছে, তার যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং প্রকল্প তদারকিতে জন অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

১২. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্থানীয় জনসাধারণকে বাস্তবায়নের কাজে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে প্রকল্পে মালিকানাবোধ ও টেকসই অভিযোজন নিশ্চিত করতে হবে।

১৩. পিআইসিভিত্তিক প্রকল্প ব্যবস্থাপনা (প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট আইন/ নীতিমালা পরিমার্জন করে) বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

১৪. প্রকল্পে নির্মিত অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবহারে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধারণের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তাদের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে হবে।

জলবায়ু অর্থায়ন ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান : প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসন*

নাহিদ শারমীন, ফারহানা রহমান, গোলাম মহিউদ্দিন ও আবু সাঈদ মো. জুয়েল মিয়া

১. প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতার দিক থেকে বাংলাদেশ শীর্ষ দেশগুলোর একটি। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, লবণাক্ততা, খরা, টর্নেডো ইত্যাদি নানা দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশ ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অন্তর্ভুক্ত। জলবায়ু পবিরবর্তনজনিত ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা মোকাবিলায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ সরকার কিছু সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উদ্যোগগুলোর মধ্যে রয়েছে জাতীয় অভিযোজন কর্মসূচি ও কার্যক্রম (নাপা) ২০০৫ প্রণয়ন এবং হালনাগাদকরণ (২০০৯); বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি), ২০০৯ প্রণয়ন; বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল (বিসিসিটিএফ) ২০০৯ গঠন; জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন-২০১০ প্রণয়ন এবং বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণুতা তহবিল (বিসিসিআরএফ) ২০১০ গঠন।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো ১০৮টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। সেগুলোর মধ্যে সিটি করপোরেশন তিনটি, পৌরসভা ৯১টি এবং জেলা পরিষদ ১৪টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পসমূহের বাজেট ৩৫৩ দশমিক ৯৬ কোটি টাকা। বিসিসিএসএপিতে নির্ধারিত ছয়টি থিম বা বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে এবং বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিলের (বিসিসিটিএফ) অর্থায়নে প্রকল্পগুলো প্রণয়ন, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন হচ্ছে। উল্লেখ্য, এসব প্রকল্পের মধ্যে ইতিমধ্যেই কিছু প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বাকিগুলো চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদকে বিসিসিটিএফের আওতায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রকল্প বাস্তবায়নে সরাসরি সম্পৃক্ত করা হয়নি।

জলবায়ু অর্থায়ন ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান-সম্পর্কিত এ গবেষণাটি বিভিন্ন দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, বাংলাদেশ সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কৌশলপত্র ও গবেষণায় স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ুর ঝুঁকি মোকাবিলায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দ্বিতীয়ত, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পে জলবায়ু তহবিল ব্যবহারে অনিয়মের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

---

*২০১৭ সালের ২৩ জানুয়ারি টিআইবির সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

তৃতীয়ত, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়িত জলবায়ু তহবিল থেকে প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহে সুশাসন- সংক্রান্ত নিবিড় গবেষণার অপ্রতুলতা রয়েছে। পরিশেষে টিআইবির কার্যক্রমের অন্যতম বিষয় স্থানীয় সরকার এবং জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন এবং এর মধ্য দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই খাতে সুশাসন ত্বরান্বিত করার ধারাবাহিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এ গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

এ গবেষণার উদ্দেশ্য হলো জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা। এই উদ্দেশ্য অর্জনে এ গবেষণায় নিম্নলিখিত গবেষণা প্রশ্ন বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে :

- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়িত বিসিসিটিএফ প্রকল্পসমূহে সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে শক্তিশালী ও দুর্বল দিক কী কী?
- সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকল্প বাস্তবায়ন শক্তিশালী বা দুর্বল হওয়ার কারণ এবং প্রভাব কী কী?

ওপরের উদ্দেশ্য সামনে রেখে এ গবেষণায় বিসিসিটিএফের অর্থায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়িত ছয়টি প্রকল্পকে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পগুলোর তিনটি পর্যায় অর্থাৎ প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নকে গবেষণার আওতা হিসেবে নেওয়া হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি করপোরেশন এ গবেষণার আওতাভুক্ত। একাডেমিক গবেষণা ও নিবন্ধে অনুসৃত সুশাসনের আটটি সূচকের (যৌক্তিকতা, ন্যায্য বন্টন, সংগতি, জন অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা, কার্যসম্পাদন দক্ষতা, জবাবদিহি ও শুদ্ধাচার) আলোকে এ গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে। উল্লেখ্য, এ গবেষণার তথ্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়িত ছয়টি প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিসিসিটিএফ অর্থায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়িত সব প্রকল্পের ক্ষেত্রে এ গবেষণার ফলাফল সমানভাবে প্রযোজ্য নয়।

৩. গবেষণাপদ্ধতি

এটি মূলত একটি গুণগত গবেষণা। তবে এই গবেষণায় প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য গুণগত পদ্ধতির পাশাপাশি অংশগ্রহণমূলক পরিসংখ্যান ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণার জন্য মোট ছয়টি প্রকল্প বেছে নেওয়া হয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থানভেদে জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল, বিসিসিএসএপিতে নির্ধারিত থিম বা বিষয়বস্তু, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ধরন, বাস্তবায়নকাল ও বাজেটের আকার বিবেচনায় রেখে প্রকল্পগুলো নির্বাচন করা হয়েছে। পৌরসভার মাধ্যমে বাস্তবায়িত ৯১টি প্রকল্প থেকে চারটি, জেলা পরিষদের মাধ্যমে বাস্তবায়িত ১৪টি প্রকল্পের মধ্যে একটি এবং সিটি করপোরেশনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত তিনটি প্রকল্পের মধ্যে একটি নির্বাচন করা হয়েছে।

এ গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, ফোকাস দল আলোচনা (এফজিডি), কমিউনিটি স্কোর কার্ড, সামাজিক

মানচিত্র এবং পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালক, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সচিব, জনপ্রতিনিধি, প্রকৌশলী, কর্মকর্তা, ঠিকাদার, মিস্ত্রি এবং প্রকল্পের উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি স্থানীয় জনগণের সাথে করা হয়েছে। এ ছাড়া জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন ও স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্যের সত্যতা যাচাই করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগে খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপনের মাধ্যমে তাদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। পরোক্ষ তথ্যের বিভিন্ন উৎসের মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি, নীতিমালা, নির্দেশিকা, বিশেষ করে বিসিসিএসএপি ২০০৯; জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন-২০১০; প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ নির্দেশিকা-২০১২; সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত বিধিমালা-২০০৮ পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া সরকারি পরিপত্র, প্রকল্প প্রস্তাবনা, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, বিসিসিটির বার্ষিক প্রতিবেদন, প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধ ও ওয়েবসাইট ব্যবহার করা হয়েছে।

তথ্য বিশ্লেষণে একটি তাত্ত্বিক কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে তৈরি একটি বিশ্লেষণ কাঠামো অনুসরণ করা হয়েছে। ২০১৬ সালের মার্চ থেকে শুরু করে ২০১৬-এর নভেম্বর পর্যন্ত এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়। গবেষণায় বিবেচ্য সময় হলো ২০০৯-১০ থেকে শুরু করে ২০১৫-১৬ অর্থবছর।

৪. প্রকল্পগুলোয় সুশাসনের চিত্র

৪.১ প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় শক্তিশালী ও দুর্বল দিক

গবেষণার জন্য নির্বাচিত ছয়টি প্রকল্পের মধ্যে দুটি প্রকল্পে জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলায় অগতানুগতিক বা ভিন্নধর্মী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ঘূর্ণিঝড় ও লবণাক্ততাপ্রবণ এলাকায় পরিবারভিত্তিক দুর্যোগ সহনশীল ঘর নির্মাণ এবং স্বল্প দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বাস্তবায়িত প্রকল্পটি বাকি প্রকল্পগুলোর তুলনায় ভিন্নধর্মী বলে প্রতীয়মান হয়েছে। কারণ বাকি প্রকল্পগুলো গতানুগতিক অবকাঠামো নির্মাণ-সম্পর্কিত।

অন্যদিকে গবেষণার জন্য নির্বাচিত ছয়টি প্রকল্পে প্রণয়ন পর্যায়ে প্রাপ্ত দুর্বল দিকগুলো হলো :

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব নিরূপণ না করে প্রকল্প প্রণয়ন : গবেষণায় দেখা যায়, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃত চাহিদা যাচাই না করেই প্রস্তাবনা তৈরি করে অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানে পেশ করে। আরও দেখা গেছে যে প্রস্তাবনায় উল্লিখিত চাহিদা ও বিপদাপন্নতা এবং প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল মূল্যায়ন না করেই অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকল্প কর্মসূচি এবং বাজেট কমানোর তাগিদ দেয় এবং সংশোধিত প্রকল্প অনুমোদন করে। এ ক্ষেত্রে অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান দীর্ঘমেয়াদি টেকসই সমাধান এবং জলবায়ুসহিষ্ণু মডেল তৈরিকে অগ্রাধিকার না দিয়ে সীমিত সম্পদ দিয়ে বেশি এলাকা অন্তর্ভুক্ত করাকে প্রাধান্য দেয় বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

প্রকল্প প্রণয়নে জন অংশগ্রহণ নিশ্চিত না করা : গবেষণায় দেখা যায়, প্রকল্প প্রণয়নে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা এবং জনগণের চাহিদা নিরূপণ করা হয় না। ফলে ছয়টি প্রকল্পের কোনোটিতেই প্রকল্প প্রণয়নকালে জন অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়নি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরিতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সচিব, মেয়র (জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে প্রশাসক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা) ও প্রকৌশলীর ভূমিকা লক্ষ করা গেছে। এ ক্ষেত্রে কাউন্সিলরদের অংশগ্রহণও নিশ্চিত করা হয়নি।

প্রস্তাবনায় উল্লিখিত জলবায়ু ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা বাস্তব সমস্যার সাথে সংগতিপূর্ণ না হওয়া : গবেষণার আওতাধীন বেশির ভাগ প্রকল্পে জলাবদ্ধতাকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। চারটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে জলাবদ্ধতা সৃষ্টির জন্য জলাভূমি ভরাট মূল কারণ হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নদীর নাব্যতা-সংকটও জলাবদ্ধতা সৃষ্টির জন্য দায়ী।

ব্যক্তিগত বা দলীয় রাজনৈতিক পরিচয় ব্যবহার করে প্রকল্প অনুমোদন প্রাপ্তি : কোনো কোনো ক্ষেত্রে ট্রাস্টি বোর্ড বা কারিগরি কমিটির সদস্যদের সঙ্গে ব্যক্তিগত এবং দলীয় রাজনৈতিক সংযোগের মাধ্যমে প্রকল্প অনুমোদন নিশ্চিত করার বিষয়টি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া গেছে।

বিসিসিটি তহবিলকে অতিরিক্ত অর্থের উৎস হিসেবে ব্যবহার : স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন বাজেট সীমিত হওয়ায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক বিসিসিটি তহবিলকে অতিরিক্ত অর্থের উৎস হিসেবে ব্যবহার করে।

গতানুগতিক অবকাঠামো নির্মাণের জন্য অনুমোদন : স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত কাজ অবকাঠামো নির্মাণ। জলবায়ু তহবিলের আওতায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো জলবায়ু ঝুঁকি হ্রাসকে গুরুত্ব না দিয়ে বরং গতানুগতিক কাজের জন্যই প্রকল্প প্রণয়ন করে বলে এ গবেষণায় উঠে এসেছে। বিসিসিটিএফ অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিসিসিএসএপি, ২০০৯ এ ছয়টি থিম বা বিষয়বস্তুর উল্লেখ রয়েছে : (১) খাদ্যনিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য; (২) সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা; (৩) অবকাঠামো উন্নয়ন; (৪) গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা; (৫) প্রশমন ও সীমিত কার্বন নিঃসরণ এবং (৬) প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি। গবেষণায় বিবেচ্য প্রকল্পগুলোর মধ্যে অধিকাংশই অবকাঠামো নির্মাণ-সম্পর্কিত। এ ছাড়া বিসিসিটিএফের অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের মধ্যে ৪২ ভাগই অবকাঠামো নির্মাণ-সম্পর্কিত।

সম্ভাব্যতা যাচাই না করেই প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়ন : একটি প্রকল্পে দুর্যোগ সহনশীল ঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে দুর্যোগকালে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখার জন্য ঘরের ওপরের অংশে শক্ত জায়গা বা তাকের প্রয়োজন হলেও তা ঘরের নকশায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এ ছাড়া অপর একটি প্রকল্পে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্ল্যান্টের জন্য বসতবাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহের পরিকল্পনা ছিল। প্রস্তাবনা

অনুযায়ী আবর্জনা সংগ্রহের জন্য বাড়িগুলো থেকে নির্দিষ্ট হারে অর্থ আদায়ের পরিকল্পনা ছিল কিন্তু স্থানীয় জনগণ তাতে আগ্রহী হননি। এ ছাড়া এলাকায় কী কী বর্জ্য উৎপন্ন হয়, তা নিয়ে কোনো পর্যালোচনা করা হয়নি। ফলে বর্জ্য প্ল্যান্টে জৈব সার তৈরির পরিকল্পনা থাকলেও তা শুরু করা সম্ভব হয়নি।

৪.২ প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে শক্তিশালী ও দুর্বল দিক

বাস্তবায়ন পর্যায়ে নির্বাচিত প্রকল্পগুলোর কিছু শক্তিশালী দিক তুলে ধরা হলো :

দুটি প্রকল্পে বাস্তবায়ন এলাকায় তথ্যের উন্মুক্ততা : নির্বাচিত ছয়টি প্রকল্পের মধ্যে দুটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে বাস্তবায়নকৃত এলাকায় প্রকল্প-সম্পর্কিত তথ্য, যেমন বাজেট, বাস্তবায়নকৃত স্কিমের নাম উন্মুক্ত স্থানে বিলবোর্ডের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়েছে।

তিনটি প্রকল্পের বাস্তবায়ন প্রকল্প প্রস্তাবনার সাথে সংগতিপূর্ণ : ছয়টির মধ্যে তিনটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্প প্রস্তাবনার সাথে বাস্তবায়নের মিল লক্ষ করা গেছে।

বাস্তবায়ন পর্যায়ে নির্বাচিত প্রকল্পগুলোর দুর্বল দিক হলো

প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে তথ্যের উন্মুক্ততা না থাকা : অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকল্প-সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রকাশ করা হয়নি। ছয়টি প্রকল্পের মধ্যে দুটিতে তথ্য বোর্ডের মাধ্যমে প্রকল্প-সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রকাশ করা হলেও একটিতে বাস্তবায়ন শেষ হওয়ার পর বোর্ড স্থাপন করা হয়েছিল। এ ছাড়া বিসিসিটি, স্থানীয় সরকার বিভাগ, সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে প্রকল্প-সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ নথি বা তথ্য নেই। বিসিসিটি ওয়েবসাইটে বার্ষিক প্রতিবেদন, প্রাসঙ্গিক আইন, বিধি, নীতিমালা, নির্দেশিকা থাকলেও প্রকল্প-সংক্রান্ত প্রস্তাবনা, সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন, পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন, অগ্রগতি প্রতিবেদন, মূল্যায়ন প্রতিবেদন, নিরীক্ষা প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।

প্রকল্প প্রস্তাবনার সাথে বাস্তবায়নের অসংগতি : একটি প্রকল্পে চারটি স্কিম বাস্তবায়নের কথা উল্লেখ করলেও বাস্তবে তিনটি স্কিম বাস্তবায়নের প্রমাণ মিলেছে। অপর একটি প্রকল্পে ভূমিধসপ্রবণ এলাকায় ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য সুরক্ষা প্রাচীর তৈরির কথা বলা হলেও মূলত পৌরসভা রক্ষার জন্য প্রাচীর তৈরি করা হয়েছে। অপর একটি প্রকল্পে বাস্তবায়নকারী সংস্থা পরিবর্তন করে অন্য একটি সংস্থার মাধ্যমে নদী খনন যন্ত্র ক্রয় করা হয়েছে। এ ছাড়া অপর একটি প্রকল্পে জমির মালিকের সাথে আলোচনা না করে নকশা প্রণয়ন করায় বিরোধ তৈরি হয় এবং ড্রেন নির্মাণকাজের পুরোপুরি বাস্তবায়ন না করেই প্রকল্পের সমাপ্তি ঘটেছে।

দ্বৈততা পরিহার না করা : জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন-২০১০ অনুসারে জলবায়ু প্রকল্পের সাথে অন্য প্রকল্পের দ্বৈততা পরিহারের নির্দেশ থাকলেও কিছু ক্ষেত্রে জলবায়ু প্রকল্পের মাধ্যমে অন্য প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, একটি প্রকল্পে জলবায়ু তহবিলের অর্থে অন্য প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ অর্থাৎ পৌরসভার একটি অসমাপ্ত প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে।

দরপত্র প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার ঘাটতি : বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নির্বাচিত ঠিকাদার পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে বলতে পারেননি। তারা নোটিশ এবং মৌখিকভাবে দরপত্র সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করলেও তারা পত্রিকা বা বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি দেখাতে সক্ষম হননি। এ ছাড়া কোনো প্রকল্পেই ই-টেন্ডার অনুসরণ করা হয়নি।

দরপত্র প্রক্রিয়ায় স্বজনপ্রীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার : বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সচিব, মেয়র ও প্রকৌশলী কর্তৃক তাদের পরিচিত এমনকি আত্মীয়, বন্ধু এবং রাজনৈতিক বিবেচনায় ঠিকাদার হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে দলীয় রাজনৈতিক বিবেচনা প্রাধান্য পেয়েছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে। অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি নিয়মবহির্ভূত অর্থের বিনিময়েও ঠিকাদার নির্বাচন করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

অধিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা উপেক্ষা করে তুলনামূলক কম ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা নির্বাচন : অনেক ক্ষেত্রেই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ও জনগোষ্ঠীকে উপেক্ষা করা হয়েছে। একটি প্রকল্পে ভূমিধসপ্রবণ এলাকায় ঝুঁকি হ্রাস না করে পৌরসভা রক্ষার জন্য প্রাচীর তৈরি করা হয়েছে। আরেকটি প্রকল্পে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর পরিবর্তে কম ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার পরিবারের জন্য দুর্যোগ সহনশীল ঘর নির্মাণ করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষ উপকারভোগী নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ : সরাসরি প্রকল্পের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে এমন একটি প্রকল্পে দরিদ্র ও যোগ্য উপকারভোগী বাদ দিয়ে স্বজনপ্রীতি ও নিয়মবহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে তুলনামূলক সচ্ছল উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে এমন উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়েছে, যাদের অনেকের পাকা বাড়ি থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। আবার লক্ষিত উপকারভোগীর বাইরেও দুর্যোগ সহনশীল ঘর প্রদানের নামে নিয়মবহির্ভূত অর্থ নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

নির্বাচিত প্রত্যক্ষ উপকারভোগীদের ওপর ব্যয়ের বোঝা অর্পণ : ঘূর্ণিঝড় ও লবণাক্ততাপ্রবণ এলাকায় বাস্তবায়িত প্রকল্পটিতে প্রত্যক্ষ উপকারভোগীরা ১০ হাজার থেকে ৮০ হাজার টাকা ব্যয় করতে বাধ্য হয়েছেন। তাদের মিস্ত্রিদের আপ্যায়ন, রড-সিমেন্ট ক্রয়ের জন্য আংশিক খরচ এমনকি নির্মাণসামগ্রী পরিবহনের খরচও বহন করতে হয়েছে; যদিও প্রকল্প প্রস্তাবনায় এ ধরনের ব্যয় বহনের বিধান বা সুযোগ ছিল না।

দলীয় রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব অন্য বিভাগে হস্তান্তর : একটি প্রকল্পে নদী খনন যন্ত্র ক্রয়ের জন্য তহবিল বরাদ্দের পরও নবনির্বাচিত মেয়র বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমর্থিত হওয়ায় প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করে অন্য প্রতিষ্ঠানকে বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রদান করার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

কর ও মূসক ফাঁকি দেওয়ার জন্য নামসর্বস্ব ঠিকাদার নির্বাচন : পার্বত্য চট্টগ্রাম বিধি-১৯০০ অনুযায়ী আদিবাসীরা করের আওতামুক্ত হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি প্রকল্পে কর ও মূসক ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে কাগজে-কলমে আদিবাসী ঠিকাদার নির্বাচন করা হয়েছে কিন্তু বাস্তবে বাঙালি ঠিকাদার কর্তৃক কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

বিরোধপূর্ণ জমিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন : একটি প্রকল্পে জেলা পরিষদের অনুমতি না নিয়ে পরিষদের জমিতে পৌরসভা কর্তৃক বিদ্যালয় কাম বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। পরিষদ কর্তৃক আপত্তি উত্থাপিত হওয়ায় বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা উৎকণ্ঠা নিয়ে তাদের কাজ পরিচালনা করছেন।

৪.৩ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পর্যায়ে শক্তিশালী ও দুর্বল দিক

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পর্যায়ে যেসব শক্তিশালী দিক গবেষণায় উঠে এসেছে সেগুলো নিম্নরূপ :

সব প্রকল্পের প্রাথমিক কার্যক্রম বিসিসিটি কর্তৃক পরিদর্শন : নির্দেশিকা অনুসারে বরাদ্দকৃত অর্থের প্রথম কিস্তি অনুমোদনের আগে বিসিসিটি কর্তৃক প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন করার নিয়ম। গবেষণায় দেখা গেছে যে বিসিসিটি প্রাথমিক পরিদর্শনের কাজটি প্রতিটি প্রকল্পেই সম্পন্ন করেছে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন : নির্দেশিকা অনুসারে প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন না করলে চূড়ান্ত কিস্তি পরিশোধ করার বিধান নেই। ফলে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে সব প্রকল্প পরিদর্শন করে বলে তথ্য পাওয়া গেছে।

বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক প্রকল্প মূল্যায়ন : তথ্য সংগ্রহকালে ছয়টি প্রকল্পের মধ্যে তিনটি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক চূড়ান্ত মূল্যায়ন করা হয়েছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে।

প্রকল্পগুলোর পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন পর্যায়ের দুর্বল দিক নিম্নরূপ

বিসিসিটি কর্তৃক গুণগত পরিবীক্ষণের ঘাটতি : প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রাথমিক পর্যায়ে বিসিসিটি প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করলেও পরবর্তী সময়ে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত পরিমাণগত তথ্যের ওপর নির্ভর করে বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করে।

পরিবীক্ষণের সময় স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত না করা : প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার কোনো উদাহরণ দেখা যায়নি।

অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা না থাকা : প্রকল্পের গুণগত মান সম্পর্কে অভিযোগ জানানোর কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা দেখা যায়নি। দুটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে তথ্য বোর্ড স্থাপন করা হলেও সেগুলোতে অভিযোগ জানানোর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির ঠিকানা বা ফোন নম্বর উল্লেখ ছিল না। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থানীয় ব্যক্তিরা নিজেরাই জনপ্রতিনিধিদের তাদের এলাকায় পেয়ে অভিযোগ জানিয়েছেন বলে তথ্য পাওয়া গেছে।

তদারকির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর ছাড়া অন্য কাউন্সিলরদের সম্পৃক্ত না করা : কোনো প্রকল্পেই সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর ছাড়া অন্য কাউন্সিলরদের প্রকল্প বাস্তবায়ন ও তদারকিতে সম্পৃক্ত করা হয়নি।

বাস্তবায়নকালে স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক পরিবীক্ষণের ঘাটতি : প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় স্থানীয় সরকার বিভাগ ও স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক প্রকল্প পরিবীক্ষণে ঘাটতি লক্ষ করা গেছে।

বেশির ভাগ বাস্তবায়নকৃত প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক মূল্যায়নে ঘাটতি : গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বাস্তবায়নকৃত তিনটি প্রকল্পের মধ্যে দুটি প্রকল্পই বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক মূল্যায়ন করা হয়নি।

ছয়টি প্রকল্পের মধ্যে কমিউনিটি পর্যায়ে বাস্তবায়িত পাঁচটি প্রকল্পের উপকারভোগীদের অভিমতের ভিত্তিতে বর্তমান গবেষণার আওতায় প্রকল্পগুলোর অংশগ্রহণমূলক মূল্যায়ন করা হয়েছে। তাদের অভিমত অনুযায়ী কোনো প্রকল্পেই সুশাসনের শক্তিশালী উদাহরণ লক্ষ করা যায়নি। তাদের মূল্যায়ন অনুযায়ী দুটি প্রকল্পে মোটামুটি এবং তিনটিতে সুশাসনের দুর্বল চিত্র ফুটে উঠেছে।

৫. সুশাসনের ঘাটতির কারণ

৫.১ আইন, নীতিমালা ও নির্দেশিকায় দুর্বলতা

বিসিসিএসএপি-২০০৯ ও জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন-২০১০-এ স্বচ্ছতা, জন অংশগ্রহণ ও ন্যায্য বণ্টন নিশ্চিত করার বাধ্যবাধকতার অনুপস্থিতি রয়েছে। এ ছাড়া প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নির্দেশিকা-২০১২-তে প্রকল্পের যৌক্তিকতা যাচাই সম্পর্কে উল্লেখ থাকলেও প্রস্তাবনায় উল্লিখিত যৌক্তিকতা কিসের ভিত্তিতে যাচাই করা হবে, তার পদ্ধতি সম্পর্কে যথাযথভাবে উল্লেখ নেই এবং প্রকল্প প্রস্তাবনা কেন এবং কিসের ভিত্তিতে সংশোধন করা হবে, বিশেষ করে বাজেট ও প্রকল্প কার্যক্রম কমানো হবে, তার সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা নেই।

৫.২ স্থানীয় জলবায়ু বিপদাপন্নতা ও বরাদ্দে অসামঞ্জস্য

প্রকল্প অনুমোদনে ট্রাস্টি বোর্ড ও কারিগরি কমিটির প্রভাবশালী সদস্যদের প্রভাব রয়েছে। ফলে জলবায়ু ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা যথাযথভাবে যাচাই না করেই কিছু এলাকায় বেশি বাজেটের প্রকল্প

অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি বা বিপদাপন্নতা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় লক্ষ করা না গেলেও কিছু এলাকায় প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া বিপদাপন্নতার ধরন ও বরাদ্দেও অসামঞ্জস্য রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, খরাপ্রবণ এলাকায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প এবং দুর্যোগবিহীন এলাকায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে।

৫.৩ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা ও সমন্বয়ের ঘাটতি

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জলবায়ুবিষয়ক কারিগরি জ্ঞান ও সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেই এবং স্থানীয় সরকার বিভাগে জলবায়ু প্রকল্প তদারকিতে জনবলের ঘাটতি রয়েছে। বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কিংবা স্বাধীন কোনো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জলবায়ু প্রকল্প মূল্যায়নের কথা থাকলেও সে ক্ষেত্রে উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে। জনবলসংকট ও অধিদপ্তর পরিবর্তন হওয়ার কারণে মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক জলবায়ু প্রকল্প নিরীক্ষায় অগ্রাধিকার দেওয়া হয় না। এ ছাড়া বিসিসিটির জলবায়ু সহনশীল ব্যবস্থা তৈরিবিষয়ক জ্ঞান ও কারিগরি দক্ষতা এবং জনবলের ঘাটতি রয়েছে। ফলে কার্যকর সুসমন্বয় ও জবাবদিহি নিশ্চিত করায় ঘাটতি লক্ষণীয়।

৫.৪ প্রকল্প পর্যালোচনা এবং অনুমোদন প্রক্রিয়ায় দুর্বলতা

প্রকল্প এলাকার বাস্তব অবস্থা ও প্রয়োজনীয়তা পর্যালোচনা না করে বিসিসিটি কর্তৃক প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অর্থের সীমাবদ্ধতাকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করে কর্মসূচি ও বাজেট কমানোর নির্দেশনা দেওয়া হয়। অন্যদিকে বিদ্যমান তহবিল দিয়ে বেশি এলাকা অন্তর্ভুক্ত করার প্রবণতাও লক্ষ করা যায়।

৫.৬ বিসিসিটির কাজের পরিধি নির্ধারণে দুর্বলতা

বিদ্যমান ব্যবস্থায় বিসিসিটি কর্তৃক বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির চেয়ে জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ফলে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়টি বিসিসিটির কাজের পরিধিতে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে না।

৬. সুশাসনের ঘাটতির প্রভাব

৬.১ প্রকল্পের ফলাফল কার্যকর না হওয়া

গবেষণায় দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুশাসনের ঘাটতির কারণে প্রকল্পের ফলাফল কার্যকর না হওয়ায় স্থানীয় জনগণ অসন্তুষ্ট। উদাহরণস্বরূপ, একটি প্রকল্পে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্ল্যান্ট ব্যবহৃত না হওয়ায় এবং বর্জ্য ট্রান্সফার স্টেশন ভিন্ন কাজে ব্যবহারের ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হচ্ছে না। আরেকটি প্রকল্পে জমির মালিকের আপত্তির কারণে ড্রেন নির্মাণ অসমাপ্ত থেকে যাওয়ায় তা মানুষের কোনো উপকারে আসছে না। অন্য একটি প্রকল্পে দুর্যোগ সহনশীল ঘর নির্মাণের পাশাপাশি বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির পানি ধরে রেখে শুষ্ক মৌসুমে ব্যবহারের জন্য পরিবারভিত্তিক জলাধার নির্মাণ করলেও তা কেবল দুই সপ্তাহের জন্য প্রয়োজনীয় পানি সংরক্ষণে সক্ষম। ফলে তা

পরিবারগুলোর প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হচ্ছে। এ ছাড়া আরেকটি প্রকল্পে বিদ্যালয় কাম আশ্রয়কেন্দ্র বিরোধপূর্ণ জায়গায় নির্মাণ করায় শিক্ষকদের মধ্যে বিদ্যালয়টির ভবিষ্যৎ নিয়ে উৎকণ্ঠা তৈরি হয়েছে। ফলে স্থানীয় জনগণ জলবায়ু তহবিলের প্রত্যাশিত মাত্রায় সুফল থেকে বঞ্চিত।

৬.২ দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল নিয়ে শঙ্কা

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জলাবদ্ধতার মূল কারণ নদীর নাব্যতা হ্রাস, প্রাকৃতিক জলাধার ভরাট ও অপরিকল্পিত শহরায়ণ হলেও সেগুলোর সমাধানে উদ্যোগ লক্ষ করা যায়নি। ফলে পানিনিষ্কাশনের ব্যবস্থা তৈরি করে জলাবদ্ধতা সমস্যার পূর্ণাঙ্গ ও দীর্ঘমেয়াদি সমাধান সম্ভব হচ্ছে না।

৬.৩ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মাথায় রেখে নিজস্ব প্রকল্প বাস্তবায়নের সক্ষমতা তৈরির বিষয়টি নিয়ে সংশয়

প্রকল্প বাস্তবায়নে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি বিবেচনায় না নিয়ে গতানুগতিক অবকাঠামো নির্মাণ অব্যাহত রয়েছে। আবার প্রতিষ্ঠানের সব কাউন্সিলরকে বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত না করায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় সক্ষমতা তৈরি পর্যাপ্তভাবে হচ্ছে না।

৭. উপসংহার

বর্তমান গবেষণায় জলবায়ু অর্থায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত প্রকল্পগুলোর মধ্যে নির্বাচিত ছয়টি প্রকল্পে সুশাসনের ঘাটতির বিষয়টি উঠে এসেছে। সুশাসনের সূচকগুলোর মধ্যে জন অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা, ন্যায্য বণ্টন ও কার্যসম্পাদন দক্ষতার ক্ষেত্রে দুর্বলতা বেশি মাত্রায় লক্ষণীয়। এ ছাড়া সাধারণভাবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে জলবায়ু তহবিল বরাদ্দে দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবের দৃষ্টান্ত রয়েছে। জলবায়ু বিপদাপন্নতা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে জলবায়ু তহবিল বরাদ্দের মধ্যে অসমাঞ্জস্য রয়েছে। অর্থের সীমাবদ্ধতার কারণে জলবায়ু প্রকল্পের বাজেট কমানোর যুক্তি দেখানো হয়। পাশাপাশি বিদ্যমান তহবিল দিয়ে বেশি এলাকা অন্তর্ভুক্ত করার প্রবণতার কারণে প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলোতে বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়ার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ফলে জলবায়ু পরিবর্তন বিবেচনায় গুণগত ও টেকসই সমাধান গুরুত্ব পাচ্ছে না। এ ছাড়া বর্তমান গবেষণার অধীন প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায়, বেশির ভাগ প্রকল্পই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জলবায়ু তহবিল ব্যবহার করে নিয়মিত অবকাঠামোগত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছে এবং জলবায়ু ঝুঁকি বিবেচনা না করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। নীতিমালা, আইনি দুর্বলতা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও সমন্বয়ের ঘাটতি, স্থানীয় জলবায়ু বিপদাপন্নতা এবং তহবিল বরাদ্দের মধ্যে অসামঞ্জস্য, রাজনৈতিক প্রভাব, সুদূরপ্রসারী ও সুসংগঠিত পরিকল্পনার অভাবে প্রকল্পগুলো কাঙ্ক্ষিত ফলাফল তৈরিতে সক্ষম হচ্ছে না।

৮. সুপারিশ

বিসিসিটি অর্থায়নে স্থানীয় সরকার কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসনের ঘাটতি বিবেচনায় টিআইবির পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত সুপারিশ পেশ করা হলো–

বিসিসিটি ট্রাস্টি বোর্ড পুনর্গঠন : জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষজ্ঞ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, রাজনৈতিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব নেই এমন ব্যক্তিদের নিয়ে ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করতে হবে- পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

বিসিসিটি তহবিল বৃদ্ধি : জলবায়ু ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা বিবেচনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি সমাধান নিশ্চিত করার জন্য বিসিসিটি তহবিল বাড়াতে হবে– অর্থ মন্ত্রণালয়

স্থানীয় জলবায়ু ঝুঁকি যথাযথভাবে যাচাই করে প্রকল্প অনুমোদন : জলবায়ু ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা যথাযথভাবে যাচাই করে তার ভিত্তিতে প্রকল্প অনুমোদন বাধ্যতামূলক করতে হবে– পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি : জলবায়ু ঝুঁকি হ্রাসের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং এর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনকে তাদের নিয়মিত কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পাশাপাশি ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদকে জলবায়ু প্রকল্প বাস্তবায়নে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে– স্থানীয় সরকার বিভাগ, বিসিসিটি

বিসিসিটির ভূমিকা পরিমার্জন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি : শুধু তহবিল ব্যবস্থাপনা নয়; বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তদারকিতে বিসিসিটির ভূমিকা স্পষ্ট করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী জনবল বৃদ্ধি করতে হবে– পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

নীতিমালা, আইন ও নির্দেশিকা পরিমার্জন : চাহিদা নিরূপণ, সম্ভাব্যতা যাচাই, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কার্যকর সম্পৃক্ততা তৈরি, বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা, ন্যায্য বণ্টন এবং কার্যকর জবাবদিহির ব্যবস্থা অবশ্যপালনীয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে– পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয়

তথ্যের উন্মুক্ততা নিশ্চিতকরণ : ওয়েবসাইটে প্রকল্প প্রস্তাবনা, নিরীক্ষা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন উন্মুক্ত করার সাথে সাথে প্রকল্প এলাকায় দরপত্র, প্রকল্প নকশা, বাস্তবায়নকৃত এলাকা, বাজেট, অভিযোগ দায়ের ব্যবস্থা-সম্পর্কিত তথ্য বিলবোর্ড ও নাগরিক সনদের মাধ্যমে উন্মুক্ত করতে হবে– স্থানীয় সরকার বিভাগ, বিসিসিটি, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান

কার্যকর জবাবদিহি ও তদারকি নিশ্চিত করার জন্য সমন্বয় : জবাবদিহির মানদণ্ড, পরিবীক্ষণ ও নিরীক্ষা প্রক্রিয়া সুনির্দিষ্ট করে সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততা ও সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং নিরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কারিগরি সক্ষমতা ও প্রয়োজনীয় জনবল বাড়াতে হবে। পাশাপাশি তদারকিতে নাগরিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে বিসিসিটি, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু : দুর্যোগ মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়*

মু. জাকির হোসেন খান, নিহার রঞ্জন রায়, মো. নেওয়াজুল মওলা ও নাহিদ শারমীন

১. প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবে বিভিন্ন দেশে ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাসসহ নানা ধরনের দুর্যোগের ঝুঁকির মাত্রা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে ২০১৫ সালে ৮৩টি দেশ এ-সংক্রান্ত আইনগত প্রবিধান প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশেও দুর্যোগের ঝুঁকি প্রতিনিয়ত বাড়ছে এবং ঝড়, বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রায় প্রতিবছর প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। ২০১৩ সালে প্রকাশিত ক্লাইমেট ভালনারেবল মনিটর অনুসারে, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ফলে ২০৩০ সালনাগাদ বাংলাদেশে প্রতিবছর অতিরিক্ত ৬ লাখ মানুষ ঝুঁকিতে এবং ১২৫ কোটি ডলারের অতিরিক্ত অর্থনৈতিক ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশে পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপ ২০১৫-এর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ২০০৯-২০১৪ সময়কালে ঘূর্ণিঝড় ও টর্নেডোতে বাংলাদেশের মোট খানার ২৫ দশমিক ৫১ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে (বিবিএস, ২০১৫)।

বাংলাদেশে গত ২৫ বছরে ঘূর্ণিঝড় সংঘটনের হারের ক্রমবৃদ্ধি লক্ষণীয়। ১৬ বছরে (১৯৯১-২০০৬) মাত্র ৬টি ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানলেও গত এক দশকে (২০০৭-২০১৬) সিডর (২০০৭), আইলা (২০০৯), মহাসেন (২০১৩), কোমেন (২০১৫) ও রোয়ানুর (২০১৬) মতো ৫টি ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হয়। ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশে এই ঘূর্ণিঝড়গুলোর আঘাত জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তবতারই প্রতিফলন। বাংলাদেশে ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় ২ দশমিক ৫ লাখ মানুষ নিহত হওয়ার পর পর্যায়ক্রমে সরকারি বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে মৃতের হার ব্যাপকভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে এবং ১৯৯১ সালে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে হাজার হাজার মানুষ নিহত হওয়ার পর ব্যাপকভাবে কমিউনিটিভিত্তিক ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড় ও টর্নেডোর ফলে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা, বিশেষ করে নিহত হওয়ার মাত্রা ব্যাপকভাবে কমিয়ে নিয়ে আসতে পেরেছে। সর্বশেষ ২০১৬ সালের ২১ মে ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু উপকূলীয় ১৫টি জেলায় আঘাতের কারণে ২৭ জন নিহত এবং ঘরবাড়িসহ জমির ফসল ও অন্যান্য সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এই ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বরগুনা, লক্ষ্মীপুর ও ভোলায় ক্ষতির পরিমাণ বেশি হয়, বিশেষ করে জমির ফসল, গরু-ছাগল, অন্যান্য প্রাণী, মৎস্য ও অন্যান্য সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। যদিও দুর্যোগ মোকাবিলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে সমন্বিত, লক্ষ্যভিত্তিক ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল দুর্যোগবিষয়ক

*২০১৭ সালের ১ ফেব্রুয়ারি টিআইবির সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

স্থায়ী আদেশাবলি-২০১০ প্রণয়ন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ প্রণয়ন এবং এর আওতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ প্রণয়ন; সমগ্র দেশের দুর্যোগের ঝুঁকির মানচিত্র তৈরি এবং দুর্যোগ-পরবর্তী অবস্থা থেকে দ্রুত উত্তরণের জন্য জাতীয় কন্টিনজেন্সি পরিকল্পনা প্রণয়ন। বাংলাদেশের দুর্যোগ মোকাবিলা ও ব্যবস্থাপনা মডেল বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত ও অনুসৃত হওয়ায় তার ধারাবাহিকতা রক্ষায় সুশাসন পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান।

বৈশ্বিকভাবে ২০১৫ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা-১১ (গ)তে ২০২০-এর মধ্যে সমন্বিত দুর্যোগ মোকাবিলায় কার্যকর নীতি এবং পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে সব পর্যায়ে সামগ্রিক দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার পাশাপাশি 'সেনডাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন'-এ ২০১৫-২০৩০ সময়কালের মধ্যে দুর্যোগপ্রবণ দেশগুলোতে দুর্যোগের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সুশাসন ও কার্যকর সাড়া প্রদানে দুর্যোগ-পূর্ববর্তী প্রস্তুতি শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ ছাড়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ এবং বাংলাদেশের দুর্যোগবিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি-২০১০তে ঘূর্ণিঝড়-পূর্ববর্তী প্রস্তুতি এবং জরুরি সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেওয়া সত্ত্বেও গণমাধ্যমে ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু মোকাবিলায় সুশাসনের ঘাটতি-সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছে। ইতিপূর্বে ঘূর্ণিঝড় সিডর (২০০৭) ও আইলা (২০০৯) মোকাবিলায় গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের ওপর টিআইবি পরিচালিত গবেষণায় (২০০৭ ও ২০১০) সুশাসনগত বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ পরিলক্ষিত হয়। দুর্যোগ মোকাবিলায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের স্বীকৃত অর্জনকে এগিয়ে নিয়ে উচ্চতর পর্যায়ে বহুমুখী উৎকর্ষ নিশ্চিত করা ও সুশাসনের মৌলিক উপাদান বাংলাদেশের দুর্যোগ মোকাবিলার মূলধারায় টেকসই করার উদ্দেশ্যে সরকারসহ সব অংশীজনের সাথে সহায়ক ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে টিআইবি বড় ধরনের দুর্যোগ-পরবর্তী ত্রাণ কর্মকাণ্ডে সুশাসনের চ্যালেঞ্জবিষয়ক গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় টিআইবি 'ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু : দুর্যোগ মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক এই গবেষণা পরিচালনা করেছে।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও তার কারণ, ফলাফল ও প্রভাব চিহ্নিত করা এবং গবেষণায় প্রাপ্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যথাযথ সুপারিশ প্রদান করা। এ গবেষণায় স্থানীয় পর্যায়ে ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ-সংক্রান্ত কার্যক্রম, ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে সরকারিভাবে জরুরি সাড়া প্রদান, ত্রাণ কার্যক্রম, জরুরি পুনর্বাসন কার্যক্রম, বেসরকারিভাবে উপকারভোগী নির্বাচন ও ত্রাণ কার্যক্রম-সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উল্লিখিত পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে সুশাসনের চারটি নির্দেশক : যথা–স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, অংশগ্রহণ ও শুদ্ধাচারের ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ঘূর্ণিঝড়-পূর্ববতী সময়ে সতর্কবার্তা, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে স্থানান্তর, প্রয়োজনীয় ত্রাণ, অর্থ বরাদ্দ ও শুকনো খাবার মজুত এবং অন্যান্য সহায়তা নিশ্চিত করার বিষয়টি এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী সময়ে ত্রাণ বিতরণ,

ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ যাচাই, পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের চাহিদা নিরূপণকে এ গবেষণার আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এ গবেষণায় ২০১৬ সালের মে থেকে জুন মাস পর্যন্ত রোয়ানু-সংক্রান্ত তথ্য বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে এবং তথ্য সংগ্রহের মেয়াদকাল ছিল মে ২০১৬ থেকে জানুয়ারি ২০১৭। এটি একটি গুণগত গবেষণা বিধায় উপস্থাপিত তথ্য ও গবেষণার ফলাফল সাধারণীকরণ করা যাবে না এবং গবেষণার ফলাফল সব ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। তবে এ ফলাফল রোয়ানুর মতো দুর্যোগ মোকাবিলায় বিদ্যমান সুশাসনের ঘাটতির একটি দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

৩. গবেষণাপদ্ধতি

এটি মূলত গুণগত গবেষণা, তবে অংশগ্রহণমূলক পরিসংখ্যান ব্যবহৃত হয়েছে। গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উৎস হিসেবে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা ও কমিউনিটি স্কোর কার্ডের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ তথ্য এবং বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন, আইন, নীতিমালা, আদেশাবলি, ওয়েবসাইট, সংবাদমাধ্যম পর্যালোচনার মাধ্যমে পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়েছে। মুখ্য তথ্যদাতা হিসেবে– কর্মকর্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, প্রতিনিধি, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি), ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্য, ত্রাণ বিতরণকারী এনজিওর কর্মকর্তা, স্থানীয় নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, গণমাধ্যমের কর্মী এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সাথে ফোকাস দলীয় আলোচনা এবং কমিউনিটি স্কোরকার্ডের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

এ গবেষণায় ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ১৫টি জেলার মধ্য থেকে মৃতের সংখ্যা, বেশি ক্ষতির শিকার পরিবার, বাড়ির সংখ্যা এবং জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা বিবেচনায় নিয়ে পাঁচটি জেলা : যথা– কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, লক্ষ্মীপুর, ভোলা ও বরগুনা তথ্য সংগ্রহের জন্য বাছাই করা হয়েছে। নির্বাচিত প্রতিটি জেলা থেকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত একটি এবং তুলনামূলকভাবে কম ক্ষতিগ্রস্ত একটি উপজেলা বাছাই করে প্রতিটি উপজেলা থেকে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত একটি করে ইউনিয়ন তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। চূড়ান্তভাবে পাঁচটি জেলায় অবস্থিত মোট ১০টি উপজেলা থেকে ১০টি ইউনিয়নের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার খসড়া প্রতিবেদনের ওপর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।

৪. দুর্যোগবিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি-২০১০

দুর্যোগবিষয়ক আদেশাবলি-২০১০ অনুসারে, প্রশিক্ষিত প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী এবং জনসাধারণ দুর্যোগের সময় নিম্নলিখিত কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

৪.১ দুর্যোগ-পূর্ববর্তী উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ

- ঝুঁকি যাচাই, নিয়মিত দুর্যোগ-সংক্রান্ত মহড়ার আয়োজন, বিপদাপন্ন বা ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী শনাক্তকরণ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানকে দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষম করে তোলা।
- সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচার, জরুরি আশ্রয়কেন্দ্র পরিদর্শন এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবকদের সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ, আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

৪.২ দুর্যোগকালীন ও পরবর্তী উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ

- দুর্যোগ-সংক্রান্ত যথাসময়ে সঠিক তথ্য প্রেরণ, জরুরি উদ্ধারকাজ পরিচালনা, নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।
- ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের চাহিদা ও অগ্রাধিকার নির্ণয়, সরকারি ও বেসরকারি ত্রাণ কার্যক্রমে সমন্বয় এবং সামাজিক ন্যায্যতা নিশ্চিত করা।

৫. ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু মোকাবিলায় ইতিবাচক উদ্যোগ

৫.১ ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু-পূর্ববর্তী কার্যক্রম

ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু-পূর্ববর্তী কার্যক্রমে কিছু ইতিবাচক উদ্যোগ ছিল। রোয়ানুর আগেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও সতর্কবার্তা প্রচারের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর থেকে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের ই-মেইলের মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। অন্য উদ্যোগগুলো হলো : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে ঘূর্ণিঝড়ের অবস্থান-সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদকরণ, স্থানীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম না থাকা সত্ত্বেও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে দুর্যোগের বার্তা প্রদানে স্বেচ্ছাসেবীদের উদ্যোগ গ্রহণ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার আয়োজন করা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর থেকে জরুরি ত্রাণসহায়তা হিসেবে সম্ভাব্য আক্রান্ত জেলাগুলোতে ৫ কোটি টাকার শুকনো খাবার, ৮০ লাখ ৫২ হাজার টাকা নগদ বরাদ্দ, স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক শুকনো খাবার সংগ্রহ ও স্থানীয়ভাবে মজুতকরণ ইত্যাদি। বেসরকারিভাবে নির্মিত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ এবং কোনো কোনো এলাকায় ঝুঁকিপূর্ণ মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী বা বেসরকারি সংস্থা তৎপর ছিল।

৫.২ ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী কার্যক্রম

ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু-পরবর্তী কার্যক্রমেও কিছু ইতিবাচক উদ্যোগ ছিল। সরকারি পদক্ষেপগুলোর মধ্যে ছিল–

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক জরুরি ত্রাণসহায়তা হিসেবে ৫ হাজার ৬৮২ মেট্রিক টন চাল ও ১ কোটি ৮০ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। এর পাশাপাশি ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী

কার্যক্রমে অন্যান্য ইতিবাচক উদ্যোগের মধ্যে সরকারি কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন; দুর্যোগকালে নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ; জরুরি উদ্ধারকাজ পরিচালনার জন্য ১২টি পিকআপ ভ্যান, ১২টি উদ্ধারকারী নৌকা, ৬টি মোবাইল অ্যাম্বুলেন্স, ৪টি উত্তাল সমুদ্রে অনুসন্ধান উপযোগী উদ্ধারকারী নৌকা ক্রয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য যানবাহন ব্যবহার করে উদ্ধারকাজ পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান এবং নির্দিষ্ট ফরমে খানাভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বিস্তারিতভাবে সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছিল। বেসরকারি পদক্ষেপের মধ্যে ছিল খানাভিত্তিক যথাযথ তথ্যের ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের তালিকা প্রণয়ন।

৬. ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

৬.১ ঘূর্ণিঝড়-পূর্ববর্তী পর্যায় জরুরি সাড়াদানে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

৬.১.১ দুর্যোগের ঝুঁকি যথাযথভাবে চিহ্নিত করা এবং পদক্ষেপ গ্রহণে ঘাটতি

ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর আগে গবেষণার আওতাভুক্ত ১০টি ইউনিয়নে কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ বেড়িবাঁধ, পোল্ডার, আশ্রয়কেন্দ্র চিহ্নিত করায় ঘাটতি ছিল। তা ছাড়া ৮টি ইউনিয়নে চিহ্নিত ঝুঁকিপূর্ণ বেড়িবাঁধ, পোল্ডার, আশ্রয়কেন্দ্র সংস্কারের পদক্ষেপ গ্রহণে ঘাটতি ছিল এবং ঘূর্ণিঝড়ের আগে ১০টি ইউনিয়নের কোনো কোনো এলাকার জনগণকে ঝুঁকি-সংক্রান্ত তথ্য জানানোর ক্ষেত্রে ঘাটতি ছিল। এমনকি ১০টি উপজেলাতেই ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস মোকাবিলায় নিয়মিত প্রস্তুতি মহড়ার আয়োজন করা হয়নি। গবেষণায় দেখা যায়, ৬টি ইউনিয়নের কোনো কোনো ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণে অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর সময় সে আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর ব্যবহারের উপযোগী ছিল না। একজন মুখ্য তথ্যদাতা জানান, বিভিন্ন সরকারের সময় নির্মিত অধিকাংশ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে তৈরি। ফলে সহজে এসব আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এসব আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণে গড়ে মোট বরাদ্দের ৭০ শতাংশ অর্থ ব্যয় হয়, বাকি অর্থ বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে যায়। তা ছাড়া এসব আশ্রয়কেন্দ্র যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবেও দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়।

৬.১.২ ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কবার্তা প্রচারের ক্ষেত্রে ঘাটতি

রোয়ানু আঘাত হানার আগে সতর্কবার্তা প্রচারের ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সাথে আবহাওয়া অধিদপ্তরের সমন্বয়ের ঘাটতি ছিল। কিছু কিছু ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় হালনাগাদ সতর্ক সংকেত প্রচার করা হয়নি। তা ছাড়া ১০টি ইউনিয়নেই সতর্কবার্তা প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় ওয়ারলেস, মাইক ও যানবাহনের ঘাটতি ছিল। গবেষণায় দেখা যায়, ১০টি উপজেলার কোনো কোনো এলাকায় সতর্কবার্তা প্রচারের ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি ছিল এবং ১০টি ইউনিয়নের দুর্গম এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ের আগে যথাযথ সময়ে সতর্কবার্তা পৌঁছায়নি। ফলে এসব এলাকার জনগণ দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে পারেনি। একটি দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা জানান, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এলাকার সবাইকে সতর্কবার্তা জানানোর জন্য চৌকিদারকে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তা না করে এলাকার কিছু মানুষকে মুখে মুখে বলে গেছেন। কোনো মাইক দিয়ে প্রচার না করায় এলাকার অধিকাংশ মানুষ সতর্কবার্তার বিষয়ে জানতে পারেননি।

৬.১.৩ *ঝুঁকিগ্রস্ত জনগণের সচেতনতার ঘাটতি*

গবেষণার আওতাভুক্ত এলাকার জনগণ দুর্যোগের সতর্কবার্তাকে গুরুত্ব না দিয়ে নিজস্ব বিবেচনার ওপর নির্ভর করেছেন। ফলে এ গবেষণায় দেখা যায়, ১০টি ইউনিয়নেই সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এবং ২টি উপজেলায় মৃত্যুর সংখ্যা তুলনামূলক বেশি।

৬.১.৪ *প্রয়োজনীয় এবং অধিক ধারণক্ষমতাসম্পন্ন আশ্রয়কেন্দ্রের অপ্রতুলতা*

উপকূলীয় এলাকায় বসবাসকারীদের জন্য ৫ হাজার ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের প্রয়োজন হলেও বর্তমানে সব মিলিয়ে আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে ৩ হাজার ৭৫১টি।

৬.১.৫ *আশ্রয়কেন্দ্রের অভিগম্যতায় চ্যালেঞ্জ*

ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে আশ্রয়কেন্দ্রে সরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে ৬টি ইউনিয়নের কোনো কোনো এলাকায় সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের উদ্যোগের ঘাটতি ছিল। তা ছাড়া রোয়ানুর আগে ৬টি ইউনিয়নের কোনো কোনো ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে পৌঁছাতে নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের প্রায় দুই থেকে তিন কিলোমিটার কাঁচা ও ভাঙা রাস্তা অতিক্রম করতে হয়েছে। প্রভাবশালীদের অনৈতিক প্রভাবে একটি ইউনিয়নে একটি আশ্রয়কেন্দ্র উপযুক্ত স্থানে নির্মাণ না করায় রোয়ানুর সময় ঝুঁকির মধ্যে থাকা মানুষের জন্য তা উপকারে আসেনি।

৬.১.৬ *ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর সময় আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণে অব্যবস্থাপনা ও দুর্গত মানুষের দুর্ভোগ*

গবেষণায় দেখা যায়, ১০টি ইউনিয়নেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহৃত আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল ও লোকবল নেই, তবে যেসব আশ্রয়কেন্দ্র বেসরকারি সংস্থা নির্মাণ এবং পরিচালনা করেছে, সেসব আশ্রয়কেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়মিতভাবে করা হয়ে থাকে। এমনকি ১০টি ইউনিয়নে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত একাংশের রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ব্যবহারের অনুপযোগী ছিল। কোনো কোনো আশ্রয়কেন্দ্র প্রভাবশালীরা ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করলেও তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি এবং একটি ইউনিয়নের ৩টি আশ্রয়কেন্দ্র তালাবদ্ধ অবস্থায় থাকায় মানুষের আশ্রয় নিতে পারেনি। শুধু তা-ই নয়, ৭টি ইউনিয়নের কোনো কোনো আশ্রয়কেন্দ্রে নারীদের থাকার জন্য পৃথক ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা ছিল এবং সরকারিভাবে বরাদ্দ থাকলেও ৬টি ইউনিয়নের কোনো কোনো আশ্রয়কেন্দ্রে শুকনো খাবার ও পানীয় জলের ঘাটতি ছিল।

৬.১.৭ *ঘূর্ণিঝড়-পূর্ব প্রস্তুতি সম্পর্কে নাগরিকদের প্রদত্ত স্কোর*

ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকদের মতে, 'সব জনগণকে সাইক্লোন শেল্টারে নেওয়ার' ক্ষেত্রে সরকার পদক্ষেপ নেয়নি (চিত্র ১)। এ ছাড়া আরো লক্ষ করা যায়, ৬টির (চিত্র ১) মধ্যে ৪টি নির্দেশকের স্কোর-পূর্ব প্রস্তুতির কার্যক্রমে দুর্বল সুশাসনকে প্রতীয়মান করে।

চিত্র ১ : ঘূর্ণিঝড়-পূর্ব প্রস্তুতি সম্পর্কে নাগরিকদের প্রদত্ত সার্বিক স্কোর

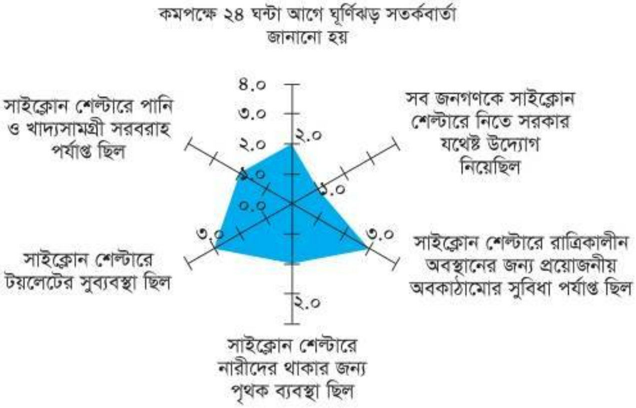

মোটেও একমত না = ১; একমত না = ২; একমত = ৩; পুরোপুরি একমত = ৪

৬.১.৮ সুশাসনের নির্দেশকের ভিত্তিতে ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী জরুরি সাড়াদানে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

সুশাসনের নির্দেশকের ভিত্তিতে গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ করে নিচে সারণির মাধ্যমে দেখানো হলো :

সারণি ১ : সুশাসনের নির্দেশকের ভিত্তিতে ঘূর্ণিঝড়-পূর্ববর্তী প্রস্তুতিতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ

<table>
<tr><th>পদক্ষেপ</th><th>স্বচ্ছতা</th><th>জবাবদিহিতা</th><th>অংশগ্রহণ</th><th>শুদ্ধাচার</th></tr>
<tr><td>ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ</td><td rowspan="4">• ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি-সংক্রান্ত তথ্যের ঘাটতি
• দুর্গম এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কবার্তা প্রচারে ঘাটতি
• আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ-সংক্রান্ত তথ্যের ঘাটতি</td><td rowspan="4">• সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দুর্যোগের ঝুঁকি যথাযথভাবে চিহ্নিত না করা
• ঘূর্ণিঝড় শুরুর আগে আশ্রয়কেন্দ্রে দুর্গত মানুষকে সরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে উদ্যোগের ঘাটতি
• আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত একাংশ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ব্যবহারের অনুপযোগী</td><td rowspan="4">• সচেতনতার অংশ হিসেবে নিয়মিত প্রস্তুতি মহড়ার আয়োজন না করা
• আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ না থাকা</td><td rowspan="4">• আশ্রয়কেন্দ্র প্রভাবশালীদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা
• প্রভাবশালীদের অনৈতিক প্রভাবে আশ্রয়কেন্দ্র যথাস্থানে নির্মাণ না করা</td></tr>
<tr><td>সর্তকবার্তা প্রচার</td></tr>
<tr><td>আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ</td></tr>
<tr><td>সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়</td></tr>
</table>

৬.২ ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী জরুরি সাড়া প্রদানে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

৬.২.১ *ত্রাণ বরাদ্দে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ন্যায্যতা নিশ্চিতে ঘাটতি*

সার্বিকভাবে এলাকাভেদে দুর্যোগের শিকার পরিবারপ্রতি বরাদ্দ দেওয়ার ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য পাওয়া যায়নি। যেমন চট্টগ্রামে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারপ্রতি ৪০১ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ভোলায় এর ছয় গুণ বেশি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। ভোলায় বেশি বরাদ্দের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনার অভিযোগ পাওয়া যায়।

৬.২.২ *দরিদ্র পরিবারের ক্ষতিগ্রস্ত ঘর নির্মাণের জন্য বরাদ্দে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ন্যায্যতা নিশ্চিতে ঘাটতি*

চট্টগ্রামের সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ২০ হাজার ঘর নির্মাণের জন্য ১ হাজার ২০০ বান্ডিল (গড়ে ০.০৬ বান্ডিল) ঢেউটিন বরাদ্দের বিপরীতে ভোলায় ১ হাজার ৫০০ সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত ঘর নির্মাণের জন্য ১ হাজার বান্ডিল (গড়ে ০.৭ বান্ডিল) ঢেউটিন বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। এ ক্ষেত্রেও ভোলায় রাজনৈতিক বিবেচনায় বেশি বরাদ্দের অভিযোগ পাওয়া যায়।

৬.২.৩ *জরুরি ত্রাণের চাহিদা ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে যথার্থতা এবং স্বচ্ছতায় ঘাটতি*

গবেষণার আওতাভুক্ত ক্ষতিগ্রস্ত ৩টি ইউনিয়নের দুর্গম এলাকায় জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন না করেই জরুরি ত্রাণের চাহিদা নিরূপণ করা হয়েছে। তা ছাড়া ১০টি ইউনিয়নে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়ে ঘাটতি ছিল। এমনকি ঘূর্ণিঝড়ের পরে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি থানায় গিয়ে তথ্য সংগ্রহ না করে অনুমানের ভিত্তিতে ১০টি ইউনিয়নের কোনো কোনো এলাকায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে। একটি দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা জানান, গ্রাম পুলিশ এসে দোকানে বসে কয়েকজন লোকের সাথে কথা বলে তালিকা করেছেন এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন।

৬.২.৪ *ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে রাজনৈতিক বিবেচনা*

গবেষণায় চিহ্নিত হয় যে ৬টি ইউনিয়নের কোনো কোনো ওয়ার্ডে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে নির্বাচনে সমর্থন প্রদানকারী বা অনুসারীদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে, এমনকি ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের নিকটাত্মীয় বা অনুসারীদের দিয়ে তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। সাতটি ইউনিয়নের কোনো কোনো ওয়ার্ডে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের উপকারভোগী হিসেবে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না করে সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধিদের সমর্থন প্রদানকারী বা অনুসারী, যারা প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত নন, তাদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক কোনো কোনো ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়, বিশেষ করে ৩টি ইউনিয়নের দুর্গম এলাকা পরিদর্শন না করে মূলত ধারণার ভিত্তিতে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করা হয়েছে।

৬.২.৫ *ত্রাণ বিতরণে সমন্বয়হীনতা, অস্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার চর্চায় ঘাটতি*

গবেষণায় ১০টি উপজেলায় ত্রাণ বিতরণে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। সার্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র বা দুস্থ পরিবারপ্রতি গড়ে মোট ১৬৪ কেজি চাল ও ৫২৩ টাকা বরাদ্দ করা হলেও প্রকৃতপক্ষে কী পরিমাণ বিতরণ করা হয়েছে, তা নিশ্চিত করা হয়নি। এমনকি ১০টি ইউনিয়নের কোনো কোনো ওয়ার্ডে ত্রাণের পরিমাণ, উপকারভোগী নির্বাচন-প্রক্রিয়া ও বিতরণ-প্রক্রিয়া সম্পর্কে উপকারভোগীদের জানানো হয়নি। দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারী তথ্যদাতারা জানান, 'ত্রাণ কীভাবে আসে বা কারা এই ত্রাণ ভোগ করে থাকে, তারা এ সম্পর্কে কেউ কিছু জানেনা। সব চেয়ারম্যান, মেম্বর আর সরকারি অফিসাররা জানেন।' এ ছাড়া ৫টি ইউনিয়নের কোনো কোনো ওয়ার্ডে রাজনৈতিক স্বার্থ বিবেচনায় ত্রাণ বিতরণ করার অভিযোগ পাওয়া যায়; ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যরা যে ওয়ার্ডে কম ভোট পেয়েছেন, সেখানে ত্রাণ বরাদ্দ দেওয়া হয়নি। একজন মুখ্য তথ্যদাতা জানান, 'উপকারভোগী নির্বাচন ও ত্রাণ বিতরণের ক্ষেত্রে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের প্রভাব সব সময়ই কাজ করে, যা ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু-পরবর্তী সময়েও হয়েছে। তাদের পছন্দের লোকদের মাঝেই সরকারিভাবে ত্রাণ বিতরণের জন্য তারা প্রভাব বিস্তার করেন।'

গবেষণায় দেখা যায়, ৪টি ইউনিয়নের কোনো কোনো গ্রামে ত্রাণ বিতরণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পরিবর্তে চেয়ারম্যান ও মেম্বারের নিকটাত্মীয়, অনুসারীদের প্রাধান্য দেওয়া হয়। ইউনিয়ন পরিষদের একজন সদস্য নিজস্ব ওয়ার্ডে তার অনুগত ও ভোটের সময় সমর্থনকারী তিন পরিবারকে (যারা প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত নন) ৬০ কেজি করে চাল বরাদ্দ দিয়েছেন। ৫টি ইউনিয়নেই ত্রাণের চাল বিতরণের সময় মাপে কম দেওয়ার অভিযোগ এবং ৮টি ইউনিয়নে সরকারিভাবে ঢেউটিন বিতরণ দেখানো হলেও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে ঢেউটিন বিতরণ করা হয়নি বলে গবেষণায় পাওয়া যায়।

৬.২.৬ *ত্রাণ বিতরণ-সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের ও নিরসনব্যবস্থার অনুপস্থিতি*

গবেষণা পরিচালিত ১০টি ইউনিয়নেই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ত্রাণ বিতরণ-সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের ও নিরসনব্যবস্থা অনুপস্থিত ছিল। মুখ্য তথ্যদাতাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ত্রাণ বিতরণ-সংক্রান্ত অভিযোগ থাকলে তা সংশ্লিষ্ট এলাকার চেয়ারম্যান, তথ্য কর্মকর্তা ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কাছে অভিযোগ করতে পারেন। তবে এর পাশাপাশি মুখ্য তথ্যদাতা হিসেবে একাধিক জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তারা উল্লেখ করেছেন, অভিযোগ নিরসনব্যবস্থায় সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

৬.২.৭ *ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী জরুরি সাড়াদান সম্পর্কে নাগরিকদের প্রদত্ত স্কোর*

কমিউনিটি স্কোরকার্ড বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী জরুরি সাড়াদান কার্যক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকরা সন্তুষ্ট নন (চিত্র ২)। সবগুলো নির্দেশকের স্কোর ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী জরুরি সাড়াদান কার্যক্রমে দুর্বল সুশাসনকে প্রতীয়মান করে।

চিত্র ২ : ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী জরুরি সাড়াদান সম্পর্কে নাগরিকদের প্রদত্ত সার্বিক স্কোর

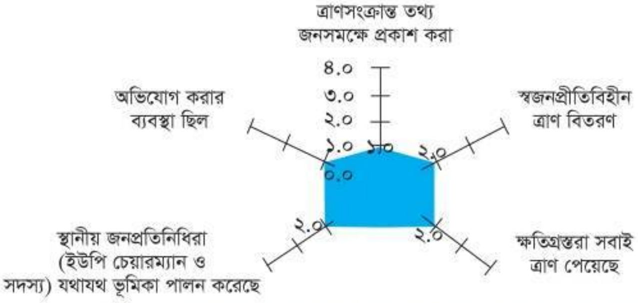

মোটেও একমত না = ১; একমত না = ২; একমত = ৩; পুরোপুরি একমত = ৪

৬.৩ সুশাসনের নির্দেশকের ভিত্তিতে ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী জরুরি সাড়াদানে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

সুশাসনের নির্দেশকের ভিত্তিতে গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ করে নিচে সারণির মাধ্যমে দেখানো হলো :

সারণি ২ : সুশাসনের নির্দেশকের ভিত্তিতে ঘূর্ণিঝড়-পূর্ববর্তী প্রস্তুতিতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

পদক্ষেপ	স্বচ্ছতা	জবাবদিহিতা	অংশগ্রহণ	শুদ্ধাচার
• ত্রাণের চাহিদা নিরূপণ • উপকারভোগী নির্বাচন • ত্রাণ বরাদ্দ ও বিতরণ	• উপকারভোগী নির্বাচন ও ত্রাণের চাহিদা নিরূপণ প্রক্রিয়া-সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ না করা • ত্রাণ বরাদ্দ ও বিতরণ-সংক্রান্ত তথ্য না জানানো	• উপকারভোগী নির্বাচন ও ত্রাণ বিতরণে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়হীনতা • ত্রাণ বরাদ্দ ও বিতরণ-সংক্রান্ত অভিযোগ জানানো ও নিরসনব্যবস্থার ঘাটতি	• উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ না থাকা • ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারণে জন অংশগ্রহণের ঘাটতি	• স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের ইচ্ছামাফিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ • প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকাভুক্তি • ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম ও দুর্নীতি • ত্রাণ বিতরণে ক্ষতিগ্রস্তের প্রয়োজনের তুলনায় রাজনৈতিক সমর্থককে বেশি গুরুত্ব প্রদান

সারণি ৩ : সুশাসনের ঘাটতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাব

কারণ	ফলাফল	প্রভাব
• সতর্কসংকেত প্রচারে সমন্বয়হীনতা • আবহাওয়া অধিদপ্তর প্রদত্ত সতর্কবার্তায় অস্পষ্টতা • সতর্কসংকেত প্রচারে তারতম্য • আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণে প্রয়োজনীয় সম্পদের জোগানে ঘাটতি • জবাবদিহি এবং যথাযথ তদারকির ঘাটতি • আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, উপকারভোগী নির্বাচন, ত্রাণ বরাদ্দ ও বিতরণে রাজনৈতিক প্রভাব • প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ত্রাণ বিতরণ সংক্রান্ত কার্যকর অভিযোগ দায়ের ও নিরসন ব্যবস্থার ঘাটতি	• দুর্গম এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কসংকেত না পৌছানো • স্থানীয় পর্যায়ে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতিতে ঘাটতি এবং অধিক ক্ষয়ক্ষতি • কোনো কোনো আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহারের উপযোগী না থাকা • ত্রাণসংক্রান্ত তথ্যের উন্মুক্ততা না থাকা • কোনো কোনো আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, উপকারভোগী নির্বাচনে ক্ষমতার অপব্যবহার, স্বজনপ্রীতি • কোনো এলাকায় ত্রাণ বরাদ্দ এবং বিতরণে ন্যায্যতা ও শুদ্ধাচার নিশ্চিত না করায় ত্রাণ বিতরণে কালক্ষেপণ এবং ক্ষয়ক্ষতির ত্রুটিপূর্ণ তালিকা তৈরি	• ঘূর্ণিঝড়জনিত ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি বৃদ্ধি • উপকূলীয় এলাকায় উপদ্রুত জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতা বৃদ্ধি

৭. উপসংহার

সার্বিকভাবে, ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় পূর্বপ্রস্তুতি নেওয়ার ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপের ফলে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। তবে এই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আরো কমানো সম্ভব হতো যদি গবেষণায় প্রাপ্ত সুশাসনের চ্যালেঞ্জগুলো না থাকত। গবেষণায় প্রাপ্ত সুশাসনের চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর আগে সম্ভাব্য ঝুঁকির বিষয়ে আগাম সমীক্ষা ও যথাযথ পূর্বপ্রস্তুতিতে ঘাটতি, ঘূর্ণিঝড়ের আগে সতর্কবার্তা প্রচারে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের মধ্যে সমন্বয়হীনতা ও কিছু কিছু ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় হালনাগাদ সতর্কসংকেত প্রচার না করা, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার বাসিন্দাদের আশ্রয়কেন্দ্রে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগে ঘাটতি এবং যানবাহন না থাকা অন্যতম। এ ছাড়া আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ বা ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি, প্রয়োজনের তুলনায় আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা কম এবং কোনো কোনো ইউনিয়নে উপযুক্ত স্থানে নির্মাণ না করা, কোনো কোনো ইউনিয়নে আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণে রাজনৈতিক প্রভাব, অনিয়ম-দুর্নীতি এবং রক্ষণাবেক্ষণে ঘাটতি, আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণে প্রয়োজনীয় সম্পদের জোগান না থাকার তথ্য পাওয়া গেছে। রোয়ানুর পর কোনো কোনো এলাকায় বাড়িঘর সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এবং উপার্জনের সুযোগ না থাকায় উপকূলীয় এলাকা থেকে অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের ঝুঁকিও পরিলক্ষিত হয়েছে।

৮. সুপারিশ

ঘূর্ণিঝড়-পূর্ববর্তী পদক্ষেপ-সংক্রান্ত

১. ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ের ঝুঁকি চিহ্নিত করে তা মোকাবিলা-সংক্রান্ত তথ্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে অবহিত করতে হবে।

২. সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ও দুর্গম এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কসংকেত প্রচারের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ব্যবস্থা নিশ্চিতের পাশাপাশি কমিউনিটি রেডিও ও মোবাইল ফোনের সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হবে।

৩. সঠিক সতর্কবার্তা প্রচারের ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সাথে আবহাওয়া অধিদপ্তরের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধির পাশাপাশি ইলেকট্রনিকসহ সব গণমাধ্যমে হালনাগাদ সতর্কসংকেত প্রচারে জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।

৪. উপকূলীয় এলাকার বাসিন্দাদের ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলার ক্ষেত্রে সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তিন মাস পরপর প্রশিক্ষণ ও মহড়ার আয়োজন করতে হবে।

৫. ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার জন্য উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সমন্বয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৬. উপকূলীয় এলাকার আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর অবস্থা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় তহবিল বরাদ্দ এবং কর্মী নিয়োগ করতে হবে।

৭. ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় উপযুক্ত স্থানে আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে এবং তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে কমিউনিটিভিত্তিক আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি পুনর্গঠন করতে হবে।

৮. দুর্গম এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয়গ্রহণকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় শুকনো খাবার এবং সুপেয় ও নিরাপদ পানির সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

৯. ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত বেড়িবাঁধ, অরক্ষিত পোল্ডার চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তার নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী পদক্ষেপ-সংক্রান্ত

১০. সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতির চাহিদা নিরূপণ, ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা তৈরির জন্য বিশেষ ওয়ার্ড সভার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

১১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের উদ্যোগে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি বেসরকারি ত্রাণ বরাদ্দ ও বিতরণে সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করতে হবে।

১২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের উদ্যোগে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে উপকারভোগী নির্বাচন এবং ত্রাণ বিতরণ-সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের ও নিরসনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৩. সরকারি-বেসরকারি ত্রাণ বরাদ্দ ও বিতরণ-সংক্রান্ত তথ্য উপকারভোগীদের জানানোর জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে গণশুনানির আয়োজন করতে হবে।

১৪. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ও ঘূর্ণিঝড়-পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিভিন্ন কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতিতে সম্পৃক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থার পাশাপাশি উদাহরণযোগ্য অবদানের জন্য ইতিবাচক প্রণোদনা দিতে হবে।

সার্বিক

১৫. 'দুর্যোগবিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি-২০১০' অনুসারে ঘূর্ণিঝড়ের আগে ও পরবর্তী ঝুঁকি কমানো ও দুর্যোগ মোকাবিলার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনের প্রতি যেসব নির্দেশনা আছে তা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে।

বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) বাংলাদেশে অবস্থানজনিত সমস্যা : সুশাসনের চ্যালেঞ্জবিষয়ক সমীক্ষা*

গোলাম মহিউদ্দিন, জাফর সাদেক চৌধুরী, মো. রাজু আহম্মেদ মাসুম ও মো. জসিম উদ্দিন

১. গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

বাংলাদেশের বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) অনুপ্রবেশ একটি ঐতিহাসিক ও চলমান সংকট। এ-সংকট শুধু বাংলাদেশ-মিয়ানমার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে না, বর্তমানে এ-সংকট জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বহির্বিশ্বের অনেক দেশের সরকার ও মানুষের উদ্বেগের বিষয় হিসেবে আলোচিত হচ্ছে। জাতিসংঘ ইতিমধ্যে রোহিঙ্গাদের বিশ্বের সবচেয়ে 'নিগৃহীত জনগোষ্ঠী' হিসেবে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের পরিচালিত এই সাম্প্রতিক নৃশংসতাকে 'জাতিগত নিধন' হিসেবে চিহ্নিত করে। বাংলাদেশসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের তীব্র নিন্দার মধ্যেও এ নিধন চলমান রয়েছে এবং প্রতিদিনই বাংলাদেশে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৭৮ সালের প্রথম দিকে অপরেশান নাগমিনের (ড্রাগন কিং) মাধ্যমে মিয়ানমার সরকার রাখাইন ও কাচিন রাজ্যে রোহিঙ্গা নাগরিকদের ওপর দমন-পীড়ন শুরু করে। এ দমন-পীড়নের প্রতিক্রিয়ায় প্রায় দুই লাখ মিয়ানমারের নাগরিক বাস্তুচ্যুত হয়ে বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলায় আশ্রয় নেয়। সেই সময়ে আন্তর্জাতিক মহলের চাপে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার আলোচনার মাধ্যমে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের নিজ বাসভূমিতে ফেরত নেওয়ার ব্যাপারে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৭৮ সালের আগস্ট মাস থেকে ১৯৭৯ সালনাগাদ ১ লাখ ৮০ হাজার রোহিঙ্গাকে মিয়ানমারে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। বাকি ২০ হাজারের মধ্যে ১০ হাজার বিভিন্ন সময়ে মারা যায় এবং ১০ হাজারের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

পরবর্তী সময়ে ১৯৯১ সালে নিপীড়নের শিকার হয়ে পুনরায় প্রায় আড়াই লাখ আশ্রয়প্রার্থী বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে এবং পরিস্থিতি বিবেচনায় তখন বাংলাদেশ সরকার সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক পক্ষগুলোকে সঙ্গে নিয়ে রোহিঙ্গা-সংকট নিরসনে কাঠামোগত কিছু সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি হাতে নেয় এবং শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশন (RRRC) গঠন করে। এই কমিশনের সাহায্যে জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনের মধ্যস্থতায় ২ লাখ ৩০ হাজার শরণার্থীকে মিয়ানমারে প্রত্যাবাসন করা সম্ভব হয়। ২০১২ সালের জুন থেকে অক্টোবরের মধ্যে নতুন করে সহিংসতার পরিপ্রেক্ষিতে ১ লাখ ২০ হাজার এবং একই সহিংসতার ধারাবাহিকতায় ২০১৪

---

*২০১৭ সালের ১ নভেম্বর টিআইবির সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

সালনাগাদ আরো ৮৭ হাজার নতুন আশ্রয়প্রার্থী বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে। ২০১৬ সালে মিয়ানমার সামরিক বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত অভিযানের সময় নতুন করে পালিয়ে আসে আরো ৯০ হাজার এবং ২০১৭ সালে এর সঙ্গে যুক্ত হয় ৭৪ হাজার আশ্রয়প্রার্থী। সর্বশেষ চলতি বছরের আগস্ট মাসে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে বড় ধরনের সামরিক অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় ৫ লাখ ৩৬ হাজার রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ করে, যা স্মরণকালের ভয়াবহতম অনুপ্রবেশ।

আগে থেকে বাংলাদেশে অবস্থানরত চার লক্ষাধিক রোহিঙ্গার সাথে নতুন করে যুক্ত হওয়া পাঁচ লক্ষাধিক আশ্রয়প্রার্থীর ঢল বাংলাদেশের সীমান্তে মানবিক বিপর্যয় এবং জরুরি পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। শুধু মানবিক দিক বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকার রোহিঙ্গাদের সাময়িক আশ্রয়দানের সিদ্ধান্ত নেয়। সরকার ও বাংলাদেশের জনগণের তাৎক্ষণিক অকাতরে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে মানবিক বিপর্যয়ের প্রাথমিক ধাপ অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত সরকারের বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী সংস্থা সমন্বিতভাবে জরুরি ভিত্তিতে বিভিন্ন সেবা প্রদান শুরু করে। পরিস্থিতি মোকাবিলার গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীকে যুক্ত করেছে। বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি জাতিসংঘ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা মানবিক সহায়তায় এগিয়ে এসেছে এবং আশ্রয়প্রার্থীদের মানবিক সহায়তায় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক অনুপ্রবেশটি সংখ্যাগত দিক থেকে বৃহৎ হওয়ায় এবং স্বল্প সময়ে হঠাৎ করে ঘটে যাওয়ার ফলে আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও এই সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় বহুবিধ চ্যালেঞ্জ দেখা দেয়। বিশেষত নানা জরুরি বিষয়ে চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে জোগানে অপ্রতুলতা দেখা দেয়। এ ছাড়া বাংলাদেশ সরকারসহ অন্যান্য অংশীজন এই সংকটে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে ত্রাণ জোগান এবং ব্যবস্থাপনায় মনোনিবেশ করায় বর্তমান জরুরি পরিস্থিতিতে নানাবিধ অপরাধ, নির্যাতন, অনিয়ম ও দুর্নীতির ঝুঁকির সম্ভাবনাসহ দীর্ঘমেয়াদে এই সংকটের কারণে বেশ কিছু ভবিষ্যৎ ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে, যা বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত রাষ্ট্রের পক্ষে সমাধান করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) বর্তমান সংকট ব্যবস্থাপনায় সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা এবং সংকট মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ এবং চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের করণীয়-সংক্রান্ত সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে এ সমীক্ষাটি গ্রহণ করেছে।

২. সমীক্ষার উদ্দেশ্য

এ সমীক্ষার উদ্দেশ্য বাংলাদেশে অবস্থানরত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) ত্রাণ ও আশ্রয় ব্যবস্থাপনার ওপর একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে :

- বাংলাদেশে অবস্থানরত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) ত্রাণ ও আশ্রয় ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কার্যক্রম ও সমন্বয় ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা;
- রোহিঙ্গা নাগরিকদের জন্য গৃহীত নানাবিধ উদ্যোগ, ত্রাণ ব্যবস্থাপনার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা ও
- বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ এবং এর উত্তরণে সুপারিশ প্রদান করা।

৩. সমীক্ষার পরিধি

গবেষণাটিতে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত আশ্রয়প্রার্থী মিয়ানমারের নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) বাংলাদেশের সীমান্তে প্রবেশ থেকে শুরু করে অস্থায়ী ক্যাম্প/শিবিরে পৌছানোর পদ্ধতি, মৌলিক চাহিদাসহ অন্যান্য সহয়তায় গৃহীত নানাবিধ উদ্যোগ, রেজিস্ট্রেশন-প্রক্রিয়া, ত্রাণ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশগত বিপর্যয়ের শঙ্কা, সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের দায়িত্ব ও সমন্বয়, নানাবিধ অপরাধ ও দুর্নীতির ঝুঁকির বিষয় পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৪. তথ্যের উৎস, ধরন ও তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

এটি একটি গুণগত গবেষণা। তবে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কিছু পরিমাণগত তথ্যও উপস্থাপিত হয়েছে। গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদনে ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণাটিতে বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে তথ্য সংগ্রহের সীমা নির্ধারণে 'তথ্য সম্পৃক্তি'র (Data Saturation) বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে। গবেষণায় মাঠ পর্যবেক্ষণ এবং মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি মানবিক সহায়তায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কার্যক্রম-সংক্রান্ত বিভিন্ন নথি, নিবন্ধ, ওয়েবসাইট এবং গণমাধ্যমের প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের জন্য রোহিঙ্গা আশ্রয়প্রার্থীদের ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সংস্থা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মুখপাত্র, ওই এলাকায় কর্মরত সাংবাদিক ও আশ্রয়প্রার্থী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর নাগরিকদের প্রতিনিধি মুখ্য তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণায় সংগৃহীত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা নিশ্চিত করা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে গুণগত গবেষণার পদ্ধতি অনুসরণ করে একাধিক সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা নিশ্চিত করা হয়। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা অর্জনের জন্য একই ব্যক্তির একাধিকবার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। আশ্রয়শিবিরের প্রকারভেদে সব ধরনের শিবির (নিবন্ধিত, মেকশিফ্‌ট ও বিচ্ছিন্ন অবস্থান গ্রহণ) পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশ থেকে শুরু করে আশ্রয়প্রার্থীদের অস্থায়ী শিবিরে আগমন প্রক্রিয়া বোঝার জন্য স্থল ও জল উভয় ধরনের সীমান্ত নির্বাচন করা হয়েছে। সমীক্ষাটিতে চার সদস্যের একটি গবেষণা দল কাজ করেছে এবং রোহিঙ্গাদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার ক্ষেত্রে ভাষার প্রতিবন্ধকতা এড়ানোর জন্য রোহিঙ্গাদের ভাষা বোঝেন এমন দুজন তথ্য সংগ্রহকারী সার্বক্ষণিকভাবে তথ্য সংগ্রহে গবেষকদের সাথে কাজ করেছেন। এ সমীক্ষাটি সেপ্টেম্বর ২০১৭ থেকে অক্টোবর ২০১৭ সময়কালে পরিচালিত হয়েছে।

৫. সমীক্ষার ফলাফল

৫.১ অংশীজনদের দায়িত্ব ও সমন্বয়

সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বেসরকারি সংস্থা আশ্রয়প্রার্থী মিয়ানমারের নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) মানবিক বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য জরুরি ব্যবস্থা নিয়েছে এবং তা

এখনো অব্যাহত আছে। সরকারি অংশীজনদের মধ্যে রয়েছে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, পুলিশ বাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, বন বিভাগ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, পল্লী বিদ্যুৎ, সমাজসেবা অধিদপ্তর, শরণার্থী, ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয়, স্বাস্থ্য বিভাগ, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, খাদ্য অধিদপ্তর, ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর। এ ছাড়া জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থাসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে ইন্টার সেক্টর কো-অর্ডিনেশন গ্রুপ।

৫.২ সীমানা পারাপার এবং ক্যাম্পে আগমন

জল ও স্থল উভয় পথেই বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত আশ্রয়প্রার্থী মিয়ানমারের নাগরিকরা (রোহিঙ্গা) সীমানা অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করছে। টেকনাফের শাহপরীর দ্বীপ, শামলাপুর, হ্নীলা, হোয়াইক্ষং কানজরপাড়া, লেদা, উংচিপ্রাং, উখিয়ার আঞ্জুমানপাড়া, জামতলী, নাইক্ষ্যংছড়ির ঘুমধুন ইউনিয়নের তমব্রু সীমান্ত মূলত এই অনুপ্রবেশে ব্যবহৃত হচ্ছে। জলপথে সীমানা পাড়ি দেওয়ার জন্য মিয়ানমারের নাগরিকদের ৫ হাজার থেকে ১৫ হাজার টাকা নৌকার মাঝিকে প্রদান করতে হয়, নগদ টাকা না থাকলে নারীরা তাদের ব্যবহৃত স্বর্ণালঙ্কারের বিনিময়ে নদীপথ পাড়ি দেয়। বাংলাদেশে প্রবেশের পর তারা মূলত নিকটবর্তী সীমান্ত থেকে হেঁটে এবং দূরবর্তী সীমান্ত থেকে স্থানীয় যানবাহন ব্যবহার করে কয়েক ধাপে ক্যাম্পগুলোতে পৌঁছাচ্ছে। পরিবহন ঠিক করার জন্য স্থানীয় জনসাধারণ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সহযোগিতা করে থাকে। এই যাত্রাপথে তারা তাদের সাথে নিয়ে আসা মিয়ানমারের মুদ্রা বিনিময় করে বাংলাদেশি মুদ্রা সংগ্রহ করে থাকে। মুদ্রা সংগ্রহ করার সময় তারা মুদ্রার প্রকৃত মূল্য পায় না। মুদ্রা বিনিময়ের কোনো আইনি স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান স্থানীয় এলাকায় না থাকায় তারা মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় কাজে নিয়োজিত একটি অবৈধ চক্রের কাছ থেকে বাংলাদেশি মুদ্রা সংগ্রহ করে। এ ক্ষেত্রে তারা ১ লাখ বার্মিজ মুদ্রার বিপরীতে ২ হাজার থেকে ৪ হাজার ৫০০ টাকা সংগ্রহ করতে পারে। অথচ আন্তর্জাতিক দর অনুযায়ী এর মান ৬ হাজার টাকা হওয়ার কথা। কোন ক্যাম্পে যাবে তা তারা মূলত নির্ধারণ করে থাকে তাদের আত্মীয়স্বজন বা পরিচিত লোকজন কোন ক্যাম্পে উঠেছে তার ওপর।

৫.৩ আশ্রয়স্থল

আশ্রয়স্থল বরাদ্দের কোনো আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি নেই, তবে সম্প্রতি সেনাবাহিনী নতুনভাবে আসা ব্যক্তিরা কোথায় আশ্রয়স্থল নির্মাণ করবে তা নির্ধারণ করে দিচ্ছে। যে যে ক্যাম্পে আসে, সে ক্যাম্পের সন্নিহিত কোনো পাহাড়ে পাহাড় কেটে রোহিঙ্গারা আবাসন তৈরি করে। ১২-১৮ বর্গফুট আয়তনের আশ্রয় শিবির/ঝুপড়ি তৈরিতে মূলত বাঁশ ও পলিথিন কভার ব্যবহার করা হচ্ছে, যেখানে গড়ে ৫-৬ জনের পরিবার বাস করে। অস্থায়ী ক্যাম্পগুলো মূলত বন বিভাগের জমিতে তৈরি হয়েছে। তবে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমিতেও কেউ আশ্রয় পেয়েছে। সেনাবাহিনী জড়িত হওয়ার আগে স্থানীয় লোকজন রোহিঙ্গাদের কাছ থেকে জায়গার ভাড়া হিসেবে ৩ হাজার থেকে ৫ হাজার টাকা আদায় করেছে। এর সাথে স্থানীয় জনপ্রতিনিধির যোগসাজশ রয়েছে। ঝুপড়ি তৈরির সরঞ্জাম কেউ কেউ ত্রাণ হিসেবে পেয়েছে, কেউ কেউ স্থানীয় বাজার থেকে গড়ে ২ হাজার টাকায় ক্রয় করেছে।

৫.৪ ত্রাণ ব্যবস্থাপনা

রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের প্রথম দিকে ত্রাণ ব্যবস্থাপনা ছিল বিচ্ছিন্ন এবং অপরিকল্পিত। অনেক ক্ষেত্রেই আগে থেকে বসবাসরত রোহিঙ্গারা ত্রাণ গ্রহণের সুযোগ নিয়েছে। কেননা কে নতুন কে পুরাতন, তা চিহ্নিত করা সম্ভব ছিল না। অনেক ক্ষেত্রেই নারী ও বয়োবৃদ্ধরা ত্রাণ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। অনেক ত্রাণদাতা গাড়ি থেকে ভিড়ের মধ্যে ত্রাণের প্যাকেট ছুড়ে মেরেছে। দূর থেকে রান্না করা খাবার নিয়ে আসার কারণে খাবার পচে যেত। পরবর্তী সময়ে জেলা প্রশাসনের সমন্বয়ে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু হলে ত্রাণ বিতরণে বিদ্যমান বিশৃঙ্খলা কমে আসে। এর পাশাপাশি ইন্টার সেক্টর কো-অর্ডিনেশন গ্রুপও কাজ করছিল পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ ত্রাণ ব্যবস্থাপনায় জড়িত হওয়ার পর সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনাটি একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোতে আসে। বর্তমানে জেলা প্রশাসন এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ সমন্বয়ের মাধ্যমে ত্রাণ গ্রহণ ও বিতরণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়ারহাউস এবং উখিয়া ডিগ্রি কলেজ মাঠে নির্মিত অস্থায়ী ওয়ারহাউসে ত্রাণ সংরক্ষণ করা হয়। ত্রাণের উৎসগুলো হচ্ছে ব্যক্তিগত উদ্যোগ, সরকারি উদ্যোগ, বিদেশি সংস্থা, জাতিসংঘের অঙ্গীভূত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, দেশি-বিদেশি আন্তর্জাতিক সংস্থা, বিভিন্ন দেশের সরকারের কাছ থেকে পাওয়া সহায়তা ইত্যাদি। বর্তমানে উখিয়া ও টেকনাফের ২৪টি বিতরণকেন্দ্রের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর সহায়তায় ত্রাণ বিতরণ করা হচ্ছে। ত্রাণ বিতরণের আগে রোহিঙ্গা কমিউনিটির লিডারদের (মাঝি) সহায়তায় ত্রাণ বিতরণের তারিখসংবলিত টোকেন বিতরণ করা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মাঝিদের বিরুদ্ধে ত্রাণের টোকেন বিক্রয়, ত্রাণ আত্মসাৎ, অন্য রোহিঙ্গাদের কাছ থেকে টাকা আদায়সহ নানাবিধ অপরাধ ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। এসব অপরাধ ও দুর্নীতির ক্ষেত্রে মাঝিদের সাথে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ততার বিষয়টিও বারবার উঠে এসেছে। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে খানাভিত্তিক একটি রিলিফ কার্ড বিতরণ করা হচ্ছে। এর বিতরণ কাজ সম্পন্ন হলে সমগ্র ত্রাণ বিতরণ প্রক্রিয়ায় পরিপূর্ণ শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

৫.৫ খাদ্য

২০১৭ সালের ২৫ আগস্টের পর নতুনভাবে আসা প্রায় ৫ লক্ষাধিক আশ্রয়প্রার্থীর জন্য জরুরি খাদ্য সহায়তা প্রয়োজন ছিল। এ ছাড়া দেড় লক্ষাধিক ৫ বছরের কম বয়সী শিশু এবং ৫৫ হাজারের অধিক গর্ভবতী নারীর জন্য প্রয়োজন ছিল পুষ্টির সহায়তা। ১৫ অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত পাওয়া তথ্যানুযায়ী, এ পর্যন্ত ৫ লাখ ৩৬ হাজার আশ্রয়প্রার্থীর খাদ্য সরবরাহ সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে ৩ লাখ ৬২ হাজার ৮৯৫ জন পূর্ণ দিনের খাবার সরবরাহের আওতায় আছে এবং বাকিদের শুধু পর্যাপ্ত চাল বিতরণ করা হয়েছে। এ ছাড়া ১২ হাজার ৬৬২ জন গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী নারী এবং ৪৯ হাজার ৩০৬ জন পাঁচ বছরের নিচের শিশুকে সম্পূরক খাদ্য প্রদান করা হয়েছে। ইন্টার সেক্টর কো-অর্ডিনেশন গ্রুপের (আইএসসিজি) পক্ষ থেকে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি) জরুরি খাদ্য সরবরাহে নেতৃত্ব দেয়, এর পাশাপাশি এসিএফ, সেড, রেডক্রস, পালস বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশি ও আন্তর্জাতিক সংস্থা জরুরি খাদ্য সহায়তা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

৫.৬ বস্ত্র

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব ধরনের পোশাক ছাড়া অন্য কিছু পরতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। ফলে প্রথমদিকে দানকৃত শার্ট, প্যান্ট ও শাড়ি ইত্যাদি পোশাক, বিশেষ করে ব্যবহৃত পুরোনো পোশাক রোহিঙ্গারা ব্যবহার করেনি। অনেকগুলোই উখিয়া টেকনাফ সড়কের বিভিন্ন স্থানে ফেলে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে তাদের নিজস্ব ধরনের পোশাক তথা থামি, লুঙ্গি সরবরাহ করা হয়। সরকারি ওয়ারহাউসে লুঙ্গি, থামি, গামছা, শিশুদের পোশাক স্বল্প পরিমাণে সংরক্ষিত আছে।

৫.৭ পানি সরবরাহ ও পয়োনিষ্কাশন

নতুন আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গা আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য প্রতিদিন ৫৮ মিলিয়ন লিটারের অধিক নিরাপদ পানি প্রয়োজন। সে তুলনায় জোগানের ঘাটতি রয়েছে। জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সংস্থার উদ্যোগে রোহিঙ্গা আবাসনগুলোতে নলকূপ এবং স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপনের স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত ব্যবস্থা হিসেবে সেনাবাহিনী, জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তর, এসিএফ ভ্রাম্যমাণ ওয়াটার রিজার্ভারের মাধ্যমে পানি বিতরণ করছে। যেসব ক্যাম্পে নিরাপদ পানি অধিক দুষ্প্রাপ্য, সেখানে সেনাবাহিনী ৩৭ ওয়াটার ট্রেইলার এবং দুটি ব্রাউজারের মাধ্যমে পৌঁছে দিচ্ছে। পাশাপাশি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে জীবাণুমুক্ত করার জন্য ২ হাজার কেজি ব্লিচিং পাউডার ছিটানো হয়েছে। ২৯ অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত পাওয়া তথ্যানুযায়ী, এ পর্যন্ত ৪ হাজার ৩৭০টি নলকূপ ও ২৪ হাজার ৭৭৩টি স্যানিটারি টয়লেট স্থাপন করা হয়েছে। তবে পর্যাপ্ত তদারকি না থাকায় বিভিন্ন জায়গায় বসানো নলকূপ নষ্ট হয়ে অকেজো পড়ে থাকতে দেখা গেছে। অস্থায়ীভাবে নির্মিত এসব স্যানিটারি ল্যাট্রিন ২-৩ রিং বিশিষ্ট হওয়ায় খুব দ্রুত ভরাট হয়ে যাবে কিন্তু এখন পর্যন্ত বর্জ্য অপসারণের কোনো ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা হয়নি। ফলে অল্প সময়েই এসব ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে যাবে। গভীরতা কম হওয়ায় নলকূপগুলোও শুষ্ক মৌসুমে অকেজো হয়ে যাবে।

৫.৮ স্বাস্থ্যসেবা

স্বাস্থ্য বিভাগের সমন্বয়ে ক্যাম্প পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা এবং ক্রিটিক্যাল পরিস্থিতির জন্য উখিয়া-টেকনাফের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স জেলা সদর হাসপাতাল কক্সবাজার এবং চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রোহিঙ্গাদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। সিভিল সার্জনের অফিসের সমন্বয়ে মাঠপর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। বিভিন্ন বেসরকারি ও বিদেশি সংস্থা মাঠপর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে। সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে ক্যাম্পগুলোতে। সরকারি উদ্যোগে প্রশিক্ষিত ধাত্রীরা খানা পর্যায়ে প্রসূতি সেবা নিশ্চিত করছে। অপুষ্টিতে ভোগা গর্ভবতী, দুগ্ধবতী নারী এবং শিশুদের জন্য বেশ কিছু উদ্যোগ রয়েছে, বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় তাদের জন্য মানসিক স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থাও রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিভিন্ন ভ্যাকসিন সরবরাহ করছে। হাম-রুবেলা, পোলিও ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে। ১৫ অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত পাওয়া তথ্যানুযায়ী, ২৫ আগস্ট ২০১৭ থেকে এ পর্যন্ত ২ লাখ ৭১ হাজার ৭২৯ জনকে নানাবিধ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে, ৯ মাস থেকে ১৫ মাস বয়সী ১ লাখ ৩৫ হাজার ৫১৯ শিশুকে হাম ও রুবেলা ভ্যাকসিন এবং শূন্য থেকে ৫ বছর বয়সী ৭২

হাজার ৩৩৪ শিশুকে পোলিও ভ্যাকসিন ও ভিটামিন'এ ক্যাপসুল প্রদান করা হয়েছে। ১০ অক্টোবর কলেরা ভ্যাকসিন ক্যাম্প চালু করা হয়েছে, ৭৬ হাজার ৯৩১ জন নারী 'সেক্সুয়াল অ্যান্ড রিপ্রোডাক্টিভ' স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেছে, ৮৪ হাজার ৬৪৩ জন মানসিক এবং মনস্তাত্ত্বিক সেবা গ্রহণ করেছে।

৫.৯ প্রতিবন্ধী, অনাথ ও শিশুদের জন্য গৃহীত বিশেষ ব্যবস্থা

অনাথ রোহিঙ্গা শিশুদের আলাদা ক্যাম্পে রাখার পরিকল্পনা করেছে সরকার। ২০ অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত সমাজসেবা অধিদপ্তর চারটি প্রকারভেদে মোট ১৮ হাজার ৪৪৯ জন অনাথ শিশুকে চিহ্নিত ও তালিকাভুক্ত করেছে। এর মধ্যে রয়েছে– যারা বাবা-মা উভয়কে হারিয়েছে, যারা শুধু বাবা হারিয়েছে, যারা শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী এবং হারিয়ে যাওয়া শিশু। তালিকাভুক্তির কাজটি এখনো চলমান। তালিকা শেষে সরকার শিশুপল্লি স্থাপনের উদ্যোগ নেবে। প্রতিবন্ধীদের জন্য সংবেদনশীল কোনো ব্যবস্থাপনা বা স্থাপনা এখনো পর্যন্ত করা হয়নি। শিশুদের বিনোদনের জন্য ইউনিসেফ ও সহযোগী বেসরকারি সংস্থার সহায়তায় বিভিন্ন স্থানে কিছুসংখ্যক শিশুবান্ধব কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে, তবে তা মোট শিশুর সংখ্যার তুলনায় খুবই অপ্রতুল।

৫.১০ নিরাপত্তা

সারা দেশে রোহিঙ্গাদের ছড়িয়ে পড়া রোধ করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা দেশের বেশ কয়েকটি জেলা থেকে রোহিঙ্গাদের আটক করেছেন। ৮ অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ৬৯০ জন রোহিঙ্গাকে সারা দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আটক করে ক্যাম্প এলাকায় ফেরত পাঠানো হয়েছে এবং ক্যাম্প এলাকা থেকে অন্য জেলায় যাওয়ার সময় প্রায় ২৫ হাজার জনকে আটক করা হয়েছে। সারা দেশে রোহিঙ্গার বিস্তার আটকাতে পুলিশ কক্সবাজার জেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়কে ১১টি চেক পয়েন্ট স্থাপন করেছে। সার্বিক নিরাপত্তা বজায় রাখতে কক্সবাজারের ১ হাজার ৬০০ সদস্যবিশিষ্ট পুলিশ বাহিনীর পাশাপাশি চট্টগ্রাম রেঞ্জ থেকে অতিরিক্ত ৬৬৭ জন পুলিশ সদস্য কাজ করছেন। পুলিশের পাশাপাশি আর্মড ফোর্সেস ডিভিশনের সদস্য এবং বিজিবির সদস্যরাও বিভিন্ন পয়েন্টে আলাদা আলাদা চেকপোস্ট স্থাপন করেছেন। পুলিশ, আর্মড ফোর্সেস ডিভিশন এবং বিজিবির আলাদা আলাদা চেকপোস্ট অতিক্রম করে রোহিঙ্গাদের অন্যত্র সরে যাওয়া বর্তমানে অনেকটাই কঠিন। ক্যাম্পের ভেতরে অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিরাপদ রাখার জন্য ক্যাম্পেও নৈশ টহলের ব্যবস্থা রয়েছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় সব ধর্মের প্রতিনিধিদের নিয়ে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম করছে পুলিশ। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় ফোনকলের জন্য বিভিন্ন ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্রে ১০টি টেলিটকের বুথ বসানো হয়েছে। এখান থেকে রোহিঙ্গা নাগরিকরা গুরুত্বপূর্ণ টেলিযোগাযোগ বিনা খরচে করতে পারে।

৫.১১ বায়োমেট্রিক নিবন্ধন

রোহিঙ্গা নাগরিকদের নির্ভুলভাবে শনাক্ত করার লক্ষ্যে সরকার সব রোহিঙ্গা নাগরিকের বায়োমেট্রিক রেজিস্ট্রেশনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পাসপোর্ট অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে এ

নিবন্ধনের কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে। বায়োমেট্রিক কাজের জন্য পাসপোর্ট অধিদপ্তরকে সহায়তা করছে বিজিবি। তারা অপারেটরের কাজ করছে। মাঠপর্যায়ে বিভিন্ন সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবীরা রোহিঙ্গাদের বায়োমেট্রিক নিবন্ধনের জন্য উদ্বুদ্ধ করছে। ইউএনএইচসিআর তাদের অবকাঠামো ব্যবহার করার সুযোগ দিচ্ছে। ফায়ার সার্ভিস বিদ্যুৎ সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখার জন্য জেনারেটর সাপোর্ট দিচ্ছে। এ পর্যন্ত মোট সাতটি রেজিস্ট্রেশন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। যেকোনো রোহিঙ্গা নাগরিক রেজিস্ট্রেশন কেন্দ্রে এলেই তাদের প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করে খুব দ্রুত নিবন্ধন কাজ সম্পন্ন হয়। নিবন্ধন কেন্দ্রে আলাদা আলাদা লোকজন আসা রোহিঙ্গাদের আঙুলের ছাপ-ছবি নিচ্ছে, তারপর তা প্রিন্টিংয়ে চলে যায়, প্রিন্টিংয়ের পর লেমিনেটিং করে রোহিঙ্গাদের কাছে হস্তান্তর করা হচ্ছে। পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে ৫-১০ মিনিট সময় লাগে। ২৮ অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত ৩ লাখ ১৩ হাজার রোহিঙ্গার নিবন্ধন-প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

৬. সামগ্রিক ব্যবস্থার ইতিবাচক দিক

বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সংকট মোকাবিলায় সমগ্র ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের আন্তরিক উদ্যোগ রয়েছে। বিভিন্ন সরকারি সংস্থা ও বাহিনীগুলো নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষত পুরো ব্যবস্থাপনা সমন্বয়ের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক ও তার কার্যালয়ের ভূমিকা প্রশংসনীয়। পুরো বিষয়টির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন অনুযায়ী অতিরিক্ত জনবল মোতায়েন করেছে। ত্রাণ বিতরণ, জরুরি স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, পানীয় জলের ব্যবস্থাপনা ও পয়োনিষ্কাশন সুবিধা প্রদানের কাজে নিয়োজিত সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আন্তরিকভাবে কাজ করছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা ও আইএসসিজি এই জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছে। বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে নিয়মিত সমন্বয়ের উদ্যোগ রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দপ্তর থেকে সরাসরি মাঠ পরিদর্শন করা হচ্ছে। এনজিওবিষয়ক ব্যুরো থেকেও মাঠ পরিদর্শন করা হচ্ছে। সব অংশীজনের কার্যক্রমে রোহিঙ্গা আশ্রয়প্রার্থীদের প্রতি সংবেদনশীলতা লক্ষ করা গেছে। রাষ্ট্রীয় ত্রাণসহ বেসরকারি সংস্থার ত্রাণের পূর্ণ তথ্যাবলি জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে উন্মুক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন ওয়ারহাউসে সংরক্ষিত ত্রাণের বিস্তারিত বিবরণ জেলা প্রশাসনের কাছে রয়েছে। ইন্টার সেক্টর কো-অর্ডিনেশন গ্রুপ নির্দিষ্ট বিরতিতে 'সিচুয়েশন রিপোর্ট' এবং অন্যান্য তথ্যাবলি প্রকাশ ও উন্মুক্ত করছে। স্থানীয় অধিবাসীদের ও সমগ্র দেশ থেকে স্বপ্রণোদিত হয়ে আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য আন্তরিকভাবে বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। শিশুদের বিনোদনের জন্য ইউনিসেফ এবং সহযোগী সংস্থাগুলো বিভিন্ন স্থানে কিছু শিশুকেন্দ্র তৈরি করেছে এবং স্থাপিত কেন্দ্রগুলোর মান সন্তোষজনক, তবে অপর্যাপ্ত।

৭. চ্যালেঞ্জ

৭.১ সীমানা অতিক্রম, মুদ্রা বিনিময়, অবস্থান ও আশ্রয় নির্মাণ

সীমান্ত অতিক্রম পথগুলো নিয়ন্ত্রণে কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি এবং সেখানে মাদক ও আগ্নেয়াস্ত্র পাচার রোধে নিরাপত্তা তল্লাশি এবং কোনো ধরনের জরুরি সেবার ব্যবস্থা নেই। যাত্রাপথে আহত ব্যক্তিদের ক্যাম্পে পৌঁছানোর পর জরুরি চিকিৎসা নিতে হয়েছে।

সীমান্ত অতিক্রম থেকে আশ্রয়স্থলে পৌঁছানো এবং আশ্রয়শিবির তৈরি পর্যন্ত রোহিঙ্গারা বিভিন্ন অসাধু চক্রের হাতে ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে প্রতারণা ও চাঁদাবাজির শিকার হয়। নৌকায় সীমান্ত পার হওয়ার ক্ষেত্রে মিয়ানমারের নৌকার মাঝিদের জনপ্রতি গড়ে ৫ হাজার থেকে ১৫ হাজার টাকা অথবা সোনার গয়না দিতে হয় (প্রকৃত ভাড়া ২০০-২৫০ টাকা)। মুদ্রা বিনিময়ের ক্ষেত্রে প্রতি এক লাখ কিয়াটে ৬ হাজার টাকা প্রদানের কথা থাকলেও দালালদের কাছ থেকে তারা পাচ্ছে ২ হাজার থেকে ৪ হাজার ৫০০ টাকা। বাংলাদেশি মুদ্রার মান জানা না থাকায় স্থানীয় যানবাহন ব্যবহারে অতিরিক্ত ভাড়া প্রদান করতে হয়েছে। সবশেষে আশ্রয়ঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রতিটি পরিবারকে গড়ে ২ হাজার থেকে ৫ হাজার টাকা দিতে হয়েছে একটি অসাধু চক্রকে। উল্লেখ্য, প্রতিটি ধাপের প্রতারণার সাথেই স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

বৈদেশিক সহায়তা থেকে প্রদত্ত তাঁবুগুলো মূলত শীতপ্রধান দেশের উপযোগী হওয়ায় রোহিঙ্গারা সেগুলোতে থাকতে পারছে না। তারা তাদের বাঁশ ও পলিথিনের ঝুপড়ি ঘরেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। আশ্রয় ঘরগুলো দুর্যোগসহনশীল (ঘূর্ণিঝড়, অতিবৃষ্টি, ভূমিধস) নয় এবং ঘন সন্নিবেশিত হওয়ায় দুর্ঘটনায় আগুন লাগলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

৭.২ ত্রাণ ব্যবস্থাপনা ও জীবন ধারণে সহায়তা (খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, পানি ও পয়োনিষ্কাশন)

রোহিঙ্গাদের কোনো পূর্ণাঙ্গ তালিকা না থাকায় ত্রাণ বিতরণসহ অন্যান্য সহায়তার ক্ষেত্রে সমতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'মাঝি'দের ত্রাণের টোকেন বিক্রয়, ত্রাণ আত্মসাৎ, রোহিঙ্গাদের কাছ থেকে টাকা আদায়সহ নানাবিধ অপরাধ ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে এবং মাঝিদের সাথে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ততার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

শীত ও বর্ষা মৌসুমে উপযুক্ত পোশাকের (বিশেষত শিশু ও গর্ভবতী নারীদের ক্ষেত্রে) অপর্যাপ্ততা একটি সম্ভাব্য স্বাস্থ্যঝুঁকি। নিরাপদ খাওয়ার পানি ও পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার এখনো ব্যাপক অপ্রতুলতা রয়েছে। এ-সংক্রান্ত যেসব স্থাপনা তৈরি করা হয়েছে তার তদারকি ব্যবস্থায় ঘাটতি রয়েছে। স্থাপিত নলকূপগুলোর ৩০ শতাংশ দ্রুত প্রতিস্থাপন/মেরামত করা প্রয়োজন। উপযুক্ত পয়োনিষ্কাশনব্যবস্থার অভাব বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাবের ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে। তা ছাড়া প্রদত্ত অস্থায়ী টয়লেটগুলোর ৩৬ শতাংশ নিকট ভবিষ্যতে ভরাট হয়ে যাবে। চাহিদার তুলনায় স্বাস্থ্যসেবা যথেষ্ট অপ্রতুল এবং তার ওপর যোগ হয়েছে বিভিন্ন পানিবাহিত ও সংক্রামক রোগের ঝুঁকি।

রোহিঙ্গা নারী রোগীদের প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার জন্য পুরুষ ডাক্তারদের কাছ থেকে চিকিৎসা নিতে সংকোচ বোধ করে, কিন্তু পর্যাপ্ত নারী চিকিৎসকের ঘাটতি রয়েছে। তা ছাড়া রোহিঙ্গাদের মধ্যে এইডসে আক্রান্ত রোগী পাওয়া গেছে, যা বাংলাদেশের জন্য একটি নতুন চ্যালেঞ্জ।

আইএসসিজি কর্তৃক সামগ্রিক কাজের হালনাগাদ তথ্য নির্দিষ্ট বিরতিতে 'সিচুয়েশন রিপোর্ট' হিসেবে প্রকাশ করা হলেও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক কার্যক্রমের বিস্তারিত তথ্য (পানি ও পয়োনিষ্কাশন ব্যতীত) উন্মুক্ত নেই। এ ছাড়া প্রতিনিয়ত সরকারি ও বৈদেশিক গুরুত্বপূর্ণ অতিথিদের প্রটোকল প্রদানে জেলা প্রশাসন ব্যস্ত থাকার কারণে ত্রাণ ব্যবস্থাপনার সার্বিক তদারকিতে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সময়ের ঘাটতি রয়েছে।

৭.৩ নিরাপত্তা, অভিযোগ নিরসন ও নিবন্ধন

রাস্তা থেকে ক্যাম্পের ভেতরে পৌছানোর জন্য সংযোগ সড়ক নির্মাণের কাজ শেষ না হওয়ায় ক্যাম্পের ভেতরের নিরাপত্তা (বিশেষ করে রাতে) ব্যবস্থায় অপ্রতুলতা রয়ে গেছে। সামগ্রিকভাবে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ নিরসনব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি এবং রোহিঙ্গাদের নিজেদের মধ্যে এবং রোহিঙ্গাদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের (হত্যা, ধর্ষণ প্রভৃতি ব্যতীত) নিরসনের আইনি প্রক্রিয়া এখনো নির্ধারণ করা হয়নি। রোহিঙ্গাদের একাংশের (বিশেষত মাঝিদের) কাছে মোবাইল সেট ও রবি সিম দেখা গেছে, যা আইনত অবৈধ।

বায়োমেট্রিক নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় লোকবলের ও নিবন্ধন কেন্দ্রের সংখ্যার অপর্যাপ্ততা রয়েছে। রোহিঙ্গাদের মাঝে এই নিবন্ধনের ধারণা পরিষ্কার নয়, বরং কিছু ক্ষেত্রে ভুল ও নেতিবাচক ধারণা লক্ষ করা গেছে এবং কার্যরত কোনো কোনো বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক নিবন্ধনে নিরুৎসাহিত করার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

৭.৪ পরিবেশগত প্রভাব ও বিপর্যয়

আশ্রয়ঘরগুলো তৈরির সময় পাহাড় কাটা ও বনভূমির উজাড় এ অঞ্চলের জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি এবং পরিবেশগত বিপর্যয়ের ঝুঁকি তৈরি করেছে। তা ছাড়া বন্য হাতির গমনপথে আশ্রয়ঘর তৈরি করায় একটি বাড়তি ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। জ্বালানি কাঠ স্থানীয় গাছপালা থেকে সংগ্রহ করার দরুন বনায়নের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এখনো পর্যন্ত পরিবেশ অধিদপ্তরের এ বিষয়ে কোনো কর্মসূচি নেই।

৮. চলমান ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব

৮.১ ত্রাণ ও জীবনধারণে সহায়তা (খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, পানি ও পয়োনিষ্কাশন)

আন্তর্জাতিক সহায়তায় ত্রাণ সরবরাহ এবং এর পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করা সম্ভব না হলে দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের পক্ষে এই বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবন ধারণের সহায়তা প্রদান অনিশ্চিত হবে। দ্রুত পূর্ণাঙ্গ তালিকা সম্পন্ন করে ত্রাণ বিতরণে সমতা নিশ্চিত না করলে আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেবে এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনাটি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে, যা সহিংসতায় পরিণত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

৮.২ নিরাপত্তা

পর্যাপ্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা নিশ্চিত না করা হলে ক্যাম্পগুলোতে নানাবিধ অপরাধ ও সহিংসতা বৃদ্ধি পাবে (বিশেষত নারী ও শিশুদের প্রতি)। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মহল কর্তৃক নানাবিধ অপরাধে (যেমন মাদক, চোরাচালান, হত্যা, লুটপাট ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড) রোহিঙ্গাদের জড়িত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

রোহিঙ্গা সংকটটি পুরো পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে স্থিতিশীলতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে আসতে পারে। তা ছাড়া এই সংকটের সুযোগ নিয়ে অত্র এলাকার বিভিন্ন

জঙ্গি সংগঠনের সাথে রোহিঙ্গাদের যোগসাজশ প্রতিষ্ঠার ঝুঁকি রয়েছে। রোহিঙ্গারা বাংলাদেশের অন্যান্য জেলায় ছড়িয়ে গেলে তা বহুমুখী সামাজিক, অর্থনৈতিক ও জাতীয় নিরাপত্তা-সংক্রান্ত দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকির কারণ হবে। রোহিঙ্গাদের মধ্যে সাংগঠনিক ক্ষমতাকাঠামো তৈরি হচ্ছে, যা শুরু থেকে নিয়ন্ত্রণ করা না হলে একটি জটিল ও দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা হিসেবে পরিণত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। অবাধ সীমান্ত অতিক্রমের সুযোগ ব্যবহার করে মাদক চোরাচালান ও মানব পাচারসহ বিভিন্ন ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৮.৩ পরিবেশ

রোহিঙ্গাদের অবস্থানরত অঞ্চলে ধ্বংস হওয়া পাহাড় কাটা, বনভূমির উজাড় ও অপ্রতুল পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থাজনিত কারণে ব্যাপক পরিবেশগত বিপর্যয় ঘটেছে, যা অত্র অঞ্চলের জীববৈচিত্র্যের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৮.৪ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রায় প্রভাব

রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ও স্থান গ্রহণ স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। যেমন দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক উর্ধ্বগতি, কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাস, যোগাযোগ ব্যয় বৃদ্ধি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ নানাবিধ সেবার স্থবিরতা, মান ও অভিগম্যতার অবনতি। তা ছাড়া উখিয়া ও টেকনাফে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের সংখ্যা স্থানীয় বাংলাদেশিদের তুলনায় দ্বিগুণেরও অধিক (স্থানীয় বাংলাদেশি জনসংখ্যা ৪ লাখ ৭৫ হাজার ও রোহিঙ্গা জনসংখ্যা প্রায় ১০ লাখ)। দীর্ঘমেয়াদে এই পরিস্থিতি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা ও উন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলার আশঙ্কা রয়েছে।

৮.৫ জাতীয় উন্নয়নে প্রভাব

রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনার বিষয়টি সরকার ও উন্নয়ন সংস্থাগুলোর জন্য বাড়তি চাপ হিসেবে আসায় বাংলাদেশের অন্যান্য বিপন্ন এলাকা ও জনগণের (হাওর ও উত্তরাঞ্চলের বন্যাদুর্গত) পুনর্বাসন ও উন্নয়ন প্রচেষ্টা ব্যাহত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। রোহিঙ্গাদের ব্যবস্থাপনা ব্যয় (জাতীয়) সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতি ও উন্নয়নে বিরূপ প্রভাব ফেলার ঝুঁকি রয়েছে। এ ছাড়া রোহিঙ্গাদের অবস্থানরত অঞ্চলে পর্যটনশিল্প ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

৯. সুপারিশ

মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী কর্তৃক সম্প্রতি সে দেশের রাখাইন রাজ্যের অধিবাসী রোহিঙ্গা জাতিগোষ্ঠীর ওপর পরিচালিত জাতিগত নিধনমূলক অভিযানের ফলে সৃষ্ট ব্যাপক মানবিক সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকার, এ দেশের সাধারণ মানুষ, জাতিসংঘ এবং মানবিক সংগঠনগুলোর নেওয়া ত্বরিত ও সমন্বিত উদ্যোগ এই জরুরি পরিস্থিতিতে সামগ্রিকভাবে প্রশংসনীয়। স্বল্পতম সময়ে এত বিপুলসংখ্যক আশ্রয়প্রার্থীর চাপ এবং তাদের জন্য প্রয়োজনীয় মানবিক সহায়তা নিশ্চিত করা বাংলাদেশসহ সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সহযোগীদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় টিআইবি নিম্নলিখিত সুপারিশ প্রদান করছে :

বাংলাদেশ সরকারের জন্য

১. উদ্ভূত রোহিঙ্গা সমস্যাটি যাতে একটি সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ায় আবদ্ধ না হয়ে পড়ে, সে লক্ষ্যে অবিলম্বে প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে বহুমুখী কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করতে হবে।

২. রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক ব্যয় প্রাক্কলন করে তা নির্বাহে আন্তর্জাতিক সহায়তা নিশ্চিতকরণে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ওই প্রাক্কলনে সংশ্লিষ্ট খাতে বিশেষজ্ঞদের সম্পৃক্ত করে সার্বিক প্রশাসনিক, আইন প্রয়োগ ও সেবা খাতের ওপর সব ধরনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বিবেচনায় নিতে হবে।

আন্তর্জাতিক সংস্থা, রাষ্ট্র ও দাতা সংস্থার জন্য

৩. রোহিঙ্গা সমস্যাটি একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। বাংলাদেশ মানবিক কারণে রোহিঙ্গাদের সাময়িক আশ্রয় প্রদান করলেও এর সমাধানে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে (প্রতিবেশী ভারত ও চীনসহ মিয়ানমারের সাথে বিশেষ কূটনৈতিক, ব্যবসা, বিনিয়োগ, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা সম্পর্ক রয়েছে এমন সব দেশ ও জাতিসংঘসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাকে) এগিয়ে আসতে হবে এবং রোহিঙ্গাদের দ্রুত প্রত্যাবর্তন নিশ্চিতে মিয়ানমারের ওপর সমন্বিত কূটনৈতিক প্রভাব, বিশেষ করে অবরোধ আরোপসহ সুনির্দিষ্ট চাপ প্রয়োগ করতে হবে।

৪. যতক্ষণ পর্যন্ত মিয়ানমারের নাগরিকদের প্রত্যাবর্তন সম্ভব না হয় তত দিন পর্যন্ত তাদের ত্রাণ ও অন্যান্য সহায়তা কার্যক্রমের ব্যয় যৌথ অংশীদারত্বের ভিত্তিতে নির্বাহ করতে হবে।

ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য

৫. পর্যাপ্ত লোকবল সরবরাহের মাধ্যমে যত দ্রুত সম্ভব সব রোহিঙ্গার বায়োমেট্রিক নিবন্ধন সম্পন্নকরণ এবং প্রয়োজনে এ বিষয়ে উৎসাহ প্রদানের জন্য ত্রাণপ্রাপ্তির সঙ্গে এই নিবন্ধনের বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে হবে।

৬. সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ চাহিদা ও ঝুঁকি বিশ্লেষণমূলক সমীক্ষা পরিচালনা এবং সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ততা ও সমতা নিশ্চিত করতে হবে।

৭. প্রতিবন্ধী ও অনাথ শিশুদের তালিকা দ্রুত সম্পন্নকরণ এবং তাদের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষায়িত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮. রোহিঙ্গা গর্ভবতী নারী ও সদ্য প্রসূতি মা ও নবজাতক শিশুর জন্য বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে। রোহিঙ্গা পরিবারদের জন্মনিয়ন্ত্রণে উদ্বুদ্ধ করে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

৯. সীমান্ত অতিক্রম, মুদ্রা বিনিময়, অবস্থান গ্রহণসহ বিভিন্ন বিষয়ে যারা রোহিঙ্গাদের কাছ থেকে অনৈতিক সুবিধা গ্রহণ করেছে, তাদের যথাযথভাবে চিহ্নিত করে আইনি প্রক্রিয়ায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১০. পুরো প্রক্রিয়ায় সার্বিকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর তদারকি কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে এবং নির্দিষ্ট বিরতিতে প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ করতে হবে।

১১. রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত সব সরকারি ও বেসরকারি বিস্তারিত তথ্য প্রকাশের জন্য একটি সমন্বিত ওয়েবসাইট তৈরি এবং নির্দিষ্ট সময়ের বিরতিতে তা হালনাগাদ করতে হবে।

১২. সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সমন্বয়ে একটি কার্যকর অভিযোগ নিরসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১৩. পরিবেশ, বনায়ন ও জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি রোধ ও তার পুনরুদ্ধারে সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনের সমন্বয়ে অনতিবিলম্বে একটি পরিকল্পনা ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১৪. রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে সীমান্তে প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করা এবং এই অনুপ্রবেশের সুযোগে মাদক ও অন্যান্য দ্রব্যাদি চোরাচালানের ঝুঁকি প্রতিরোধক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১৫. ত্রাণের টোকেন বিতরণে সংঘটিত অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৬. ক্যাম্প এলাকার নিরাপত্তাব্যবস্থা (বিশেষ করে রাতে) জোরদার করতে হবে।

গবেষক পরিচিতি

অমিত সরকার

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধবিদ্যা ও পুলিশবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং একই বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগ থেকে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তিতে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার বিষয়ের মধ্যে রয়েছে জাতীয় শুদ্ধাচারব্যবস্থা (জাতীয় সংসদ, বিচার বিভাগ), মানব পাচার, সাইবার ও বহুজাতিক অপরাধ ইত্যাদি।

আতিয়া আফরিন

প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগে কর্মরত। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের সদস্য হিসেবে বিভাগীয় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজের সাথে যুক্ত। তিনি মূলত ঢাকায় তরুণ সম্পৃক্তকরণ, দুর্নীতিবিরোধী প্রচারণামূলক কার্যক্রম, নেটওয়ার্কিং ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত।

আবু সাঈদ মো. জুয়েল মিয়া

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রায়োগিক কাজের মাধ্যমে তিনি উন্নয়ন গবেষক ও মূল্যায়নকারী হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলেছেন। ১৩ বছরের বেশি সময় তিনি উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয় (যেমন সরকারি সেবা ও প্রতিষ্ঠানে সুশাসন, নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার, নারী ও যুবদের কার্যকর নাগরিক হিসেবে তৈরি, সামাজিক জবাবদিহি, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন, এনজিও খাতে সুশাসন, কমিউনিটি পর্যায়ে আইনগত সহায়তা, পানি-স্যানিটেশন-স্বাস্থ্যবিধি, টেকসই চিংড়ি চাষ ইত্যাদি) নিয়ে গবেষণা, মূল্যায়ন, জ্ঞান ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে কাজ করেছেন। টিআইবিতে যোগদানের আগে তিনি অ্যাকশনএইড, ব্রিটিশ কাউন্সিল, এনজিও ফোরাম ফর পাবলিক হেলথ ও বাংলাদেশ সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজের মতো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাজ করেছেন।

খালেদা আক্তার

প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগে কর্মরত ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের সদস্য হিসেবে তিনি পার্টনারশিপ কার্যক্রম, দুর্নীতিবিরোধী প্রচারাভিযান পরিচালনা, প্রকাশনা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। এ ছাড়া তিনি আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের পক্ষ থেকে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজের সাথেও যুক্ত ছিলেন।

গোলাম মহিউদ্দিন

টিআইবির জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন ইউনিটে প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ভূগোল ও পরিবেশ' বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তিনি ইতিমধ্যে জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসনবিষয়ক বিভিন্ন গবেষণা, বিশেষত প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে (স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড) প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসন-সংক্রান্ত গবেষণা সম্পন্ন করেছেন। এ ছাড়া বাংলাদেশে অবস্থানরত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) ব্যবস্থাপনায় সুশাসন-সংক্রান্ত বিষয়েও তিনি গবেষণা করেছেন। তিনি অভিযোজন অর্থায়নে সুশাসনের মানদণ্ড নির্ণায়ক এবং অভিবাসন খাতে সুশাসনবিষয়ক গবেষণায়ও জড়িত ছিলেন।

জাফর সাদেক চৌধুরী

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তিনি স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সেবার ওপর সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড পরিচালনা করেছেন। পাশাপাশি জাতীয় খানা জরিপ, বেইজলাইন জরিপসহ বিভিন্ন গবেষণায় সহায়কের ভূমিকা পালন করেন।

জুলিয়েট রোজেটি

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বরিশাল সরকারি ব্রজমোহন কলেজের অর্থনীতি বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয় হচ্ছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠান (সংসদ), তথ্য অধিকার এবং সরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও খাত (বন্দর ও কাস্টম হাউস)।

দিপু রায়

প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাত ও এসব খাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, জাতীয় সততাব্যবস্থা-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান, টেলিযোগাযোগ খাত এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া টিআইবির জাতীয় খানা জরিপসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জরিপের সাথেও তিনি জড়িত।

নাজমুল হুদা মিনা

অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। নাজমুল হুদা তৈরি পোশাক খাত ও ভূমি ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত গবেষণার সাথে জড়িত।

নাহিদ শারমীন

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং বেলজিয়ামের অ্যান্টর্প বিশ্ববিদ্যালয়ে 'গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' বিষয়ে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয় হচ্ছে স্থানীয় সরকার খাত ও প্রতিষ্ঠান এবং স্বাস্থ্য খাত ও প্রতিষ্ঠান।

নীহার রঞ্জন রায়

ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। নীহার রঞ্জনের গবেষণার প্রধান বিষয় ভূমি খাত (ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রম)। এ ছাড়া তিনি সমবায় খাত (সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনা) এবং পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস নিয়েও গবেষণা করেছেন।

ফাতেমা আফরোজ

ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সিভিল সার্ভিস কলেজ থেকে গভর্নেন্স অ্যান্ড পাবলিক পলিসি বিষয়ে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয় হচ্ছে সুশাসন, দুর্নীতি, জাতীয় সংসদ, সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, জেন্ডার ইত্যাদি।

ফারহানা রহমান

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয় হচ্ছে স্থানীয় সরকার খাত ও প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়া তিনি প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জাতীয় বাজেট পর্যালোচনা, ২০০৪ সালের বন্যা পরিস্থিতি পর্যালোচনা বিষয়ে গবেষণা করেছেন। এ ছাড়া টিআইবির জাতীয় খানা জরিপের সাথে তিনি বিশেষভাবে জড়িত।

মনজুর ই খোদা

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সমাজবিজ্ঞান' বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং বেলজিয়ামের অ্যান্টর্প বিশ্ববিদ্যালয়ে 'গ্লোবালাইজেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' বিষয়ে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়ের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের স্থল ও সমুদ্রবন্দর এবং কাস্টম হাউস ব্যবস্থাপনা, বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, প্রাথমিক শিক্ষা খাত ও প্রতিষ্ঠান এবং অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসন। এ ছাড়া টিআইবির জাতীয় খানা জরিপসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জরিপের সাথেও তিনি জড়িত।

মহুয়া রউফ

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং বেলজিয়ামের অ্যান্টর্প বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' বিষয়ে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয় জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন। তিনি কানাডার কার্লটন ইউনিভার্সিটি থেকে 'প্রোগ্রাম ইভালুয়েশন' বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং নিকারাগুয়ার ইউনিভার্সিটি অব সেন্ট্রাল আমেরিকা থেকে 'ভ্যালু চেইন' বিষয়ে ইন্টার্ন সম্পন্ন করেন।

মু. জাকির হোসেন খান

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়ন সুশাসন ইউনিটে সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয় হচ্ছে জলবায়ু অভিযোজন ও অর্থায়ন, পানিসম্পদ খাত, পরিবেশ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানিবিষয়ক সুশাসন ও নীতি বিশ্লেষণ। তার বিভিন্ন গবেষণা প্রবন্ধ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, জার্নাল অব ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিকস, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত দ্য এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত এনভায়রেনমেন্টাল ভ্যালুয়েশন ইন সাউথ এশিয়া, ওয়াটার ইন্টিগ্রিটি গ্লোবাল আউটলুক ২০১৭-সহ বিভিন্ন প্রকাশনায় ছাপা হয়েছে। এ ছাড়া দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে তিনি নিয়মিত প্রবন্ধ লেখেন।

ড. মো. আশিকুর রহমান

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা বিভাগে ২০০৬ সাল থেকে ফ্যাকাল্টি সদস্য হিসেবে কর্মরত। তিনি একই বিভাগ থেকে স্নাতক ও কমনওয়েলথ স্কলারশিপের অধীনে ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা ইফনিট থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তিনি মালয়েশিয়ার হেরিয়ট ওয়াট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিল্ট এনভায়রনমেন্ট স্কুল থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয় হচ্ছে নগর সুশাসন, দরিদ্রদের জন্য আবাসন, দরিদ্রবান্ধব পলিসি ও পরিকল্পনা এবং সামাজিক উন্নয়ন।

মো. ওয়াহিদ আলম

সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং লি কান ইউ স্কুল অব পাবলিক পলিসি, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুর থেকে মাস্টার্স ইন পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে ভূমি খাতের ব্যবস্থাপনা এবং জাতীয় পর্যায়ের সেবা খাত উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া টিআইবির জাতীয় খানা জরিপসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জরিপের সাথেও তিনি জড়িত।

মো. নেওয়াজুল মওলা

টিআইবির জলবায়ু অর্থায়ন সুশাসন ইউনিটে ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা হিসেবে কর্মরত। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ হওয়ার পর থেকে নেওয়াজুল মওলা এশিয়া ফাউন্ডেশন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় ও আইসিডিডিআরবিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষণায় কাজ করেন। তার গবেষণার বিষয় হচ্ছে জলবায়ু অভিযোজন ও অর্থায়ন, জীবিকায়ন, পরিবেশের সাথে অভিযোজন, জলবায়ু পরিবর্তনের স্বাস্থ্যঝুঁকি এবং পরিবেশ পরিবর্তনজনিত অভিবাসন।

মো. মোস্তফা কামাল

ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। টিআইবিতে কাজ করার আগে তিনি আইসিডিডিআরবিতে স্বাস্থ্য খাতের একাধিক গবেষণাকর্মে সহায়তা করেছেন।

মো. রাজু আহম্মেদ মাসুম

টিআইবির জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক-গবেষণা পদে কর্মরত। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। গবেষক হিসেবে তার বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়ন এবং সুশাসন, বলপূর্বক সংঘটিত অভিবাসন, মানবাধিকার ও শ্রমসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গবেষণায় অভিজ্ঞতা রয়েছে। এ ছাড়া শ্রম অধিকার, শিশু সুরক্ষা, খাদ্যনিরাপত্তা, নগরসংকট, অভিবাসন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সামাজিক ও

সুশাসনভিত্তিক গবেষণার সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন। এর পাশাপাশি তিনি 'জরুরি মানবিক সহায়তা' বিষয়ে অক্সফার্ম জিবি, স্টার্ট নেটওয়ার্ক ও ডিএফআইডির শিক্ষনবিশ ফেলোশিপ সম্পন্ন করেন।

মো. রেযাউল করিম

প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে জাতীয় সততাব্যবস্থা-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান (সরকারি কর্ম কমিশন, নির্বাহী বিভাগ), গণপরিবহন খাত ও প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় নিরাপত্তা উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে তিনি ভিয়েনাভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি-করাপশন একাডেমিতে মাস্টার অব আর্টস ইন অ্যান্টি-করাপশন স্টাডিজ বিষয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়নরত।

মো. শহিদুল ইসলাম

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং একই বিভাগ থেকে 'মিলিটারি রুল অ্যান্ড দ্য ক্রাইসিস অব গুড গভর্নেন্স : আ স্টাডি অব এরশাদ রেজিম' বিষয়ে এমফিল ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমানে জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমিতে 'উন্নয়ন পরিকল্পনার' ওপর পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা করছেন। তার গবেষণার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে সুশাসন, উন্নয়ন, গণতন্ত্র, জাতীয় শুদ্ধাচারব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। টিআইবি ছাড়াও তিনি ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগে কাজ করেছেন।

মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন

টিআইবির সিভিক এনগেজমেন্ট বিভাগে এরিয়া ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তিনি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার ও ভূমি বিষয়ে বেইজলাইন জরিপ এবং বদরখালী সমিতি ও লবণশিল্পের ওপর পরিচালিত ডায়াগনস্টিক স্টাডিতে সহায়কের ভূমিকা পালন করেন। এ ছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের ভিজিডি মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

মোহাম্মদ শাহনূর রহমান

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। পরবর্তীতে তিনি গভর্নেন্স অ্যান্ড পাবলিক পলিসি বিষয়ে সিভিল সার্ভিস কলেজ, ঢাকা থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। এ ছাড়া তিনি নরওয়ে সরকারের আর্থিক সহায়তায় সাউথ সাউথ এশিয়া এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের আওতায় দুর্নীতি ও সুশাসন বিষয়ে এক বছরমেয়াদি ফ্রেডসকর্পসেট ফেলোশিপ সম্পন্ন

করেন। তিনি স্বাস্থ্য খাত ও প্রতিষ্ঠান, ওষুধ ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ খাদ্য, পাসপোর্ট সেবা ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা সম্পন্ন করেছেন। এ ছাড়া টিআইবির জাতীয় খানা জরিপসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জরিপের সাথেও তিনি জড়িত।

মোরশেদা আক্তার

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয় হচ্ছে সংসদ এবং সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও খাত।

শাহজাদা এম আকরাম

সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে গণতান্ত্রিক কাঠামো, প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়া, জাতীয় সততাব্যবস্থা ও এ-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার খাত ও প্রতিষ্ঠান এবং শ্রম অভিবাসন।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নাগরিকদের সচেতন ও সোচ্চার করার জন্য কাজ করছে। এর অংশ হিসেবে সুশাসনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সরকারি-বেসরকারি সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি, মাত্রা ও ব্যাপকতা নিরূপণের জন্য গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। টিআইবির অধিপরামর্শ কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনের অংশগ্রহণ ও সহায়তায় দেশে আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক, নীতি ও কৌশলকাঠামোতে প্রয়োজনীয় ও যুগোপযোগী সংস্কারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসন-সহায়ক অবকাঠামো সুদৃঢ়তর করা।

টিআইবি পরিচালিত ও প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ নিয়ে 'বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা : উত্তরণের উপায়' শীর্ষক সাতটি সংকলন ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় এই সিরিজের অষ্টম সংকলন ২০১৮ সালের অমর একুশে গ্রন্থমেলা উপলক্ষে প্রকাশিত হলো।

9 789843 438782